সম্পাদকের বৈঠক

সাগরময় ঘোষ

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা-১২ ।

প্রথম সংস্করণ :
আষাঢ় : ১৩৬৯

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
জিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১, মোহন বাগান লেন
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং প্রাঃ লিঃ

ব্লক মুদ্রণ
নিউ প্রাইমা প্রিণ্টিং

বাঁধাই
তৈফুর আলী মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

দাম : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

লেখকের নিবেদন

এই গ্রন্থের লেখাগুলি 'জলসা' পত্রিকায় ১৩৬৫-র কার্তিক থেকে ১৩৬৮-র বৈশাখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। কোন ইতিহাস, কোন তথ্য বা কোন তত্ত্ব প্রকাশের বাসনা নিয়ে এ-লেখা নয়, যে-কাহিনী যখন যেমন মনে এসেছে লিখে গিয়েছি। এ-লেখার পিছনে কোন প্রস্তুতি ছিল না, তাই সন তারিখ কণ্টকিত ইতিহাসের ধারা রক্ষার কোন প্রয়াস এতে নেই। যে-ভাবে পত্রিকায় লেখাগুলি পর পর প্রকাশিত হয়েছে সেই পারম্পর্যই গ্রন্থে রক্ষিত হল।

'সম্পাদকের বৈঠকে' লেখার পিছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। আমি তা পাঠকদের কাছে আগেই কবুল করতে চাই কৈফিয়তের দাবি থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

একদিন আড্ডায় বসে গল্পগুজব করছি, এমন সময় ক্ষিতীশ সরকার এসে বললেন—'একটা মাসিক পত্রিকা বার করছি, আপনার সাহায্য চাই।'

নতুন পত্রিকা প্রকাশের শুভ সংবাদে আমার উৎসাহ কারও চেয়ে কম নয়। ক্ষিতীশবাবু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর প্রয়োজনে আমি যদি কোন কাজে লাগতে পারি সেটা তো আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। পরামর্শ আর উপদেশের মামুলী কথায় না গিয়ে বললাম—'লেখক যোগাড় করে দেবার কথা বলছেন তো?'

'না। সে-কাজ আমি নিজেই করব।'

উত্তর শুনে আমি একেবারে হাঁ হয়ে গেছি। এবারে সত্যিই গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলাম তাহলে কোন কাজে লাগতে পারি।

আমাকে চিন্তান্বিত দেখে ক্ষিতীশবাবু বললেন—'আমার পত্রিকায় আপনার লেখা চাই এবং প্রতিমাসে নিয়মিত লেখা চাই।'

চমকে উঠলাম। আমার লেখা, তদুপরি প্রতিমাসে! ক্ষিতীশবাবু বোধ হয় আমাকে নিয়ে পরিহাস করছেন। আমি লেখক নই, কস্মিনকালে লেখার অভ্যাসও আমার নেই। লেখকদের লেখা খুঁজে বেড়ানোই আমার নেশা ও পেশা, নিজের লেখার কথা কোনদিন চিন্তাই করি নি। ক্ষিতীশ-

বাবু ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—'সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই আপনি লিখুন। সে-লেখাই আমি আপনার কাছ থেকে চাই।'

কী কুক্ষণেই ক্ষিতীশবাবুর কথায় রাজী হয়েছিলাম। দীর্ঘ বাইশ বছর 'দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত। সেই সুবাদে লেখকদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা বহুকালের, প্রবীণ ও তরুণ লেখকদের স্নেহ প্রীতি ও ভালবাসা পেয়ে আমি ধন্য।

সাহিত্যিকদের জীবনের অনেক কাহিনীর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত, অনেক কাহিনী আড্ডায় বন্ধুদের মুখে শোনা। সে-কাহিনী যে আমাকে লিখতে হবে তা ঘুণাক্ষরেও আমার মনে কোনদিন স্থান পায় নি। লেখা আদায়ের জন্য যে-অস্ত্র আমি এতকাল অন্যের উপর প্রয়োগ করে এসেছি, সেই অস্ত্রই যে ব্যুমেরাং হয়ে আমার উপরেই এমন মর্মান্তিকরূপে ফিরে আসবে তা কি কখনও ভেবেছিলাম? নাছোড়বান্দা ক্ষিতীশবাবুর নিত্য কড়া তাগাদার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে-সব কাহিনী একের পর এক লিখে গিয়েছি, তিনি তা চোখকানবুজে জলসায় মাসের পর মাস ছেপে আমাকে লেখক বানিয়ে দিলেন।

ত্রিবেণীর প্রকাশক ও আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী কানাই দা হঠাৎ এসে বললেন—'জলসা পত্রিকায় তোমার যে-সব লেখা বেরোচ্ছে আমি তা বই করে ছাপব। এই নাও কণ্ট্রাক্ট ফর্ম, সই কর।'

কানাইদার হুকুম চিরকালই আমার শিরোধার্য। পরের লেখা নিয়ে যার কারবার তাকে নিজের লেখার ফাঁসে এই প্রথম গলা দিতে হল। সংকোচ ও শঙ্কার সঙ্গে কম্পিত হস্তে স্বাক্ষর করে দিলাম। তিনি আমাকে গ্রন্থকার বানালেন।

সুতরাং সম্পাদকের বৈঠকের চুটকি গাল-গল্প লিখে যদি কোন অপরাধ করে থাকি তার সম্পূর্ণ দায় ও দায়িত্ব জলসা-সম্পাদক ও ত্রিবেণী-প্রকাশকের। লেখক ও গ্রন্থকার হতে পেরেছি, সেইটুকুই আমার লাভ।

দেশ পত্রিকার সম্পাদক, আমার শুভানুধ্যায়ী,

শ্রীঅশোককুমার সরকার-এর

করকমলে

এই লেখকের :

অষ্টাদশী	(সংকলন)
পরম রমণীয়	”
শতবর্ষের শতগল্প (দুই খণ্ডে)	”
অনেক দিনের অনেক কথা	”
দণ্ডকারণ্যের বাঘ	(কিশোরদের উপন্যাস)

॥ ১ ॥

আজ বাইশ বছর ধরে একাদিক্রমে একটি সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্রিকার সঙ্গে আমি যুক্ত আছি। মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে এ-সময়টাকে একটা যুগ বলেও ধরা যায়। বর্তমান বিজ্ঞান-শাসিত পৃথিবীতে স্থান এবং কালের সংকীর্ণতা ঘটলেও ঘড়ির কাঁটা যেমন অনাদিকাল থেকে অধুনা পর্যন্ত সেই একই নিয়মে ঘুরে চলেছে, যুগের আঙ্কিক হিসেবটার বেলাতেও তাই। এখনও যখন বারো মাসে বছর গোনা হয়, সাত দিনে সপ্তাহ হিসেব করা হয়, এবং ষাট মিনিটে ঘণ্টা নির্ধারিত হবার নিয়ম আছে—যুগের বেলাতেই বা সেই পুরনো আইনটা চলবে না কেন?

শুনেছি যুগ নাকি আবার বদলায়ও, যুগের অদল-বদল আদিযুগ থেকেই হয়তো চালু আছে। যদি সত্যিই তার অদল-বদল হয় তো তা এত মন্দগতিতে যে, তার নিরিখ সমসাময়িক ব্যারোমিটারে ধরবার মত কোনও সূক্ষ্ম যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নি। এ বদল ধরা একদিন হয়তো পড়বে তুলনামূলক ইতিহাসের কেতাবে—তাও বহুযুগ পরে। সুতরাং আমি এখানে আমার যে অভিজ্ঞতার কাহিনী আপনাদের বলব তা যুগ-বদলের কাহিনী তো নয়ই, যুগের ইতিহাসও নয়। এগুলো নিছক কাহিনী হিসেবে উপাদেয় বলেই বলব। আর তার কোনও তাত্ত্বিক মূল্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টাও যেন কেউ না করেন। তত্ত্ব এক জিনিস আর কাহিনী আর এক জিনিস। তত্ত্ব নিয়ে বচসার অবকাশ থাকে। পণ্ডিতেরা তত্ত্ব নিয়ে বৃহদাকার গ্রন্থ রচনাও করে থাকেন। সে তত্ত্বের টীকাকার ব্যাখ্যাকার যাঁরা, তত্ত্ব-কণ্টকে তাঁদেরও রাত্রের ঘুম আর দিবসের বিশ্রাম বিঘ্নিত হয় বলে শুনেছি। আমি নিষ্কণ্টক না হলেও নিরুপদ্রব শান্তির পক্ষপাতী। তার উপর নানা মতাবলম্বী লেখক-লেখিকাদের নিয়ে আমার কাজ চালাতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি যা লিখব পাঠক-বর্গ তা নিছক কাহিনী বলে ধরে নিলেই আমি খুশী হব। তা সত্যিই হোক আর অসত্যিই হোক।

বিদ্যাসাগর মশাই বর্ণপরিচয়ে লিখে গেছেন—"সদা সত্য কথা কহিবে।" আদালতে সাক্ষীকে সাক্ষী দেবার আগে "সত্য বই মিথ্যা বলিব না" বলে শপথ নেবার রীতি আজও প্রচলিত আছে। স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের প্রতীক ত্রিসিংহ মূর্তির সঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকে—"সত্যমেব জয়তে।" চারিদিকে এত সত্যের ছড়াছড়ির মধ্যে আমি অসত্য কাল্পনিক কাহিনী শোনাব এত দুঃসাহস আমার নেই। তবুও বলে রাখা ভাল আমি একটু কমবেশী ভেজালেরই ভক্ত।

কিছু খাদ না থাকলে সোনা যেমন উজ্জ্বল হয় না, কিছু ভেজাল না থাকলে আমাদের আজকের সমাজ-জীবনে লোকে দু-পয়সা করে খেতে পারত না। খাঁটি তেল-ঘির স্বাদ আজকের দিনে আমরা ভুলেই গেছি। আমি তাই এই যুগকে বলতে চাই ভেজালের যুগ। সুতরাং আমার এই কাহিনীর মধ্যে কিছু ভেজাল যদি থেকে থাকে তো আমি নাচার।

দিনলিপি রাখার অভ্যাস আমার কোন কালেই ছিল না। স্মৃতি ও শ্রুতির উপর নির্ভর করেই এ কাহিনী রচিত। স্মৃতির পটে কিছু ঘটনা ধরা ছিল, অনেক হারিয়ে গেছে। সেই হারিয়ে যাওয়া ফাঁকগুলি ভরাবার জন্য কিছু ভেজালের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এ কাহিনীর পাঠকদের কাছে তাই আমার অনুরোধ, হাঁসের মত নীর থেকে ক্ষীরটুকু শুধু বেছে নেবেন, তাহলেই সত্যাসত্যের দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে। যাই হোক—

আমি যে গল্প বলতে যাচ্ছি তা নিছক গল্পই, বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল চরিত্রকে নিয়ে। একজন জলধরদা, সম্পাদক জলধর সেন। অপরজন শরৎচন্দ্র। সে গল্প এখন থাক, গল্পের ভূমিকাটি বলে নিই। বর্মণ স্ট্রীটে 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরটি ছিল একেবারে নিরিবিলি জায়গায়, নিত্য শনিবার সমবয়সী সাহিত্যিক বন্ধুরা সমবেত হতেন। জোড়া দেওয়া টেবিলের উপর খবরের কাগজ পেতে সের খানেক মুড়ি ঢেলে নারকল-বাতাসা-ছোলা-চিনাবাদাম সহযোগে আড্ডা বসত, সঙ্গে চলত পত্রিকা দপ্তরের নিত্য অনুপান চা ও সিগারেট।

কথায় কথায় ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধরদার প্রসঙ্গ উঠতেই আমার ছাত্র-জীবনে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বৃত্তান্ত বললাম।

আমি তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। সেখানেই পরিচয় হয়েছিল হায়দ্রাবাদবাসী এক শিল্পীর সঙ্গে, নাম সুকুমার দেউস্কর। বিখ্যাত শিল্পী

শশী হেস-এর তিনি বংশধর। ইটালীতে কিছুকাল থেকে, সে-দেশের তেল রঙে প্রোট্রেট আঁকার যাবতীয় পদ্ধতিতে তিনি তখন সিদ্ধহস্ত।

রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলা সাহিত্যে মধ্যগগনের সূর্য, শরৎচন্দ্র নৈশগগনের একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি।

শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী উৎসব ঘটা করে করবার উদ্যোগ চলছে। শিল্পী বন্ধু সুকুমারদা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভক্ত পাঠক, এই উপলক্ষে তিনি কাঠের উপর তেলরঙ দিয়ে শরৎচন্দ্রের একটি জবরদস্ত পোর্ট্রেট এঁকে আমায় বললেন—'এই সময়ে কলকাতার কোনো পত্রিকায় ছবিটা ছেপে দাও।'

মনে পড়ল 'ভারতবর্ষের' কথা। শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক, তা-ছাড়া সম্পাদক জলধর সেনের তিনি খুবই প্রিয়পাত্র। ছবিখানি হাতে করে সটান চলে এলাম কলকাতায়, একেবারে ভারতবর্ষের অফিসে।

এর আগে জলধরদাকে দূর থেকে শুধু চোখে দেখেছি, সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। একবার 'রবিবাসরের' সভ্যদের রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেছিলেন। সেই সময়ে বহু সাহিত্যিক সমাগম হয়েছিল, জলধরদাও এসেছিলেন।

ভারতবর্ষ অফিসে এসে সসঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে জলধরদার কামরায় ঢুকলাম। প্রশান্ত মূর্তি জলধরদা অর্ধনিমীলিত চোখে ইশারায় সামনের চেয়ারটিতে বসতে বলেই জিজ্ঞাসা করলেন—'অভিপ্রায় ?'

—'শরৎবাবুর একটা রঙীন পোর্ট্রেট এনেছি, একবার যদি দেখেন।' খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে ছবিটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

ছবিটি হাতে নেওয়া মাত্রই জলধরদার চোখ-মুখের সেই প্রশান্ত ভাব নিমেষে একটা বিরক্তিমাখা অপ্রসন্নতায় ভরে উঠল। দুহাতে ছবির দুটো ধার ধরে একবার চোখের কাছে নিয়ে আসেন, আবার দুই হাত সটান সামনের দিকে প্রসারিত করে দূরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন। ভাবের অভিব্যক্তির আর কোন পরিবর্তন নেই। তার পরেই ছবিটাকে উল্টো করে ধরে ভ্রূকুঞ্চিত তন্ময়তায় কি যেন একটা খুঁজে বার করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁর দুই হাতের কবজিগত ছবিটা ততক্ষণে আমার উৎকণ্ঠিত মনে পরিণত হয়েছে—মুঠোর নিষ্পেষণে কণ্ঠাগতপ্রায়।

অবশেষে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব মুখে এনে ছবিটা টেবিলের উপর ধপাস করে ফেলে জলধরদা বললেন—

'না হে, ও আমার কম্মো নয়। আসুক হরিদাস, এ-সব শান্তিনিকেতনী আর্ট ও-ই বুঝবে ভালো।'

ক্ষীণ কণ্ঠে সভয়ে আমি বললাম—'আজ্ঞে না। এটা শান্তিনিকেতনী আর্ট নয়, কন্টিনেন্টাল আর্ট। একেবারে মডার্ন ইটালিয়ান স্কুল।'

গর্জন করে উঠলেন জলধরদা।'—এসব ইস্কুলের ছেলে ছোকরাদের ছবি তা আমার কাছে এনেছ কেন? 'মৌচাক' 'শিশুসাথী'তে গেলেই তো পারতে?'

বুঝলাম প্রতিবাদ করা বৃথা। আসুন হরিদাসবাবু, অর্থাৎ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অন্যতম কর্তা। তাঁর কাছেই নিবেদন পেশ করা যাবে। ততক্ষণে জলধরদা আবার সেই সৌম্য শান্ত মূর্তিতে ফিরে গেছেন, সেই অর্ধনিমীলিত চোখ। নির্বিকার, নিরাসক্ত।

চুপচাপ বসেই আছি, আরও কতক্ষণ বসে থাকতে হবে জানি না। আমারও জেদ চেপে গেছে, একটা কিছু না করে আর নড়ছি নে। আসুন হরিদাসবাবু।

এমন সময় ছড়ি হাতে দীর্ঘাঙ্গ এক প্রৌঢ় ঘরে ঢুকেই বোমাফাটার মত চিৎকার করে উঠলেন—'এ কী জলধরদা, আপনি বলেছিলেন এ-মাসেই আমার গল্পটা ছাপা হবে কিন্তু পত্রিকায় তো গল্পটা দেখলাম না?'

চেয়ারে এলায়িত দেহটা ততক্ষণে খাড়া করে জলধরদা বললেন—'তা আমার কি দোষ। ছাপবার জন্যে প্রেস-এ তো দিয়েছিলাম।'

'প্রেস-এ দিয়েছিলেন তা তো আমিও জানি। তবে ছাপা হল না কেন? গল্পের কোথাও অশ্লীলতা কিছুই তো ছিল না।'

'তা ছিল না, তবে ফুটকি ছিল, প্রেস-এ অতো ফুটকি নেই। হরিদাসকে বলে ফাউণ্ড্রিতে একপো ফুটকির অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এলেই ছাপা হবে।'

শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত জলধরদার মুখাবয়বে আবার সেই তূষ্ণীভাব, নির্বিকার নিরাসক্ত। আগন্তুক ভদ্রলোক এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঝিম মেরে গেলেন। কোথায় গেল সেই দাপট, কোথায় সেই আস্ফালন। মাজায় বাড়ি-খাওয়া কুকুরের মত কেঁউ-কেঁউ করে তিনি বললেন—'ফুটকিগুলো কেটে দিলেই তো পারতেন।'

জলধরদা যেন সমাধিস্থ অবস্থাতেই বিড়বিড় করে বললেন, 'তোমাদের এই ফুটকি-রহস্যের আজও আমি কোন হদিস করতে পারলাম না। ওই

ফুটকির মধ্যে কী যে অকথিত কথা থাকে তা তুমিই জানো আর জানে তোমার পাঠকরা। প্রিন্টার এসে গোল বাধায়, বলে ফুটকি নেই, ফুটকি চাই।'

আমার এই গল্পে এখানেই বাধা পড়ে গেল। আড্ডার এক বেরসিক বন্ধু আর অপেক্ষা করতে না পেরে বলে বসলেন—'এ নিশ্চয় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।'

উত্তর দেবার আগেই সমস্বরে আর সবাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—'আরে মশাই এ-যে সৌরীন মুখুজ্যে সে কি বলে দিতে হবে? বলে যান তারপর কি হল?'

আমি দেখলাম প্রতিবাদ করা বৃথা। তাছাড়া আমার গল্প তো সেই লেখককে নিয়ে নয়, আমার গল্পের নায়ক সেই ছবি, তাও আবার শরৎচন্দ্রের। শরৎচন্দ্রের সেই অয়েল-কালার পোর্ট্রেট-এর কি দশা, অথবা দুর্দশাই হল সেই কথাই বলছি।

টেবিলের উপর পড়ে থাকা শরৎচন্দ্রের উপর 'ফুটকি সাহিত্যিকের' ততক্ষণে নজর পড়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ছবিটা টেনে নিয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করলেন—

'এ কী জলধরদা, শেষে কি বুড়ো বয়সে চরিত্তির খোয়াবেন? এ-সব উগ্র আধুনিক আর্ট আপনার টেবিলে?'

'না হে, 'ওটা শরৎচন্দ্র। এই ছোকরা এনেছে ছাপবার জন্যে। আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। সোজা করে ধরলে মনে হয় আকাশের সাদা মেঘ, উল্টো করে ধরলে আমাদের মেছুয়াবাজারের পাকা দাড়িওয়ালা বুড়ো কলিমুদ্দি দপ্তরীর চেহারাটা ভেসে ওঠে। শরৎচন্দ্র যে এর মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছেন খুঁজে পেলাম না। তাছাড়া বুড়ো হয়েছি, চোখের দৃষ্টিও কমে এসেছে।'

বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্রের সাদা চুল এ-ছবির অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল।

এর পরে আর আমার পক্ষে অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। যদিও এই ছবি প্রসঙ্গে দুই সাহিত্যিকের মন্তব্যে কৌতুকবোধ করছিলাম এবং এই রঙ্গমঞ্চে হরিদাসবাবুর আবির্ভাব হলে আরও কিছু নতুন মন্তব্য শোনাতে পারতাম। কিন্তু আর অপেক্ষা করা যায় না। এদিকে বেলা তখন বারোটা পার। স্নান-খাওয়া কিছুই হয় নি। বিকেল চারটার গাড়িতে আবার আমায়

শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতে হবে। সন্তর্পণে ছবিটা প্রবীণ সাহিত্যিকের হাত থেকে উদ্ধার করে খবরের কাগজ দিয়ে মুড়তে মুড়তে আর অধিককাল অপেক্ষা করার অসুবিধার কথা জানিয়ে বিদায় চাইলাম।

নিমেষে জলধরদার করুণাঘন দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ হল। সহানুভূতিমাখা কণ্ঠে বললেন—'সে কী, সেই ভোরে রওনা হয়ে স্টেশন থেকে সোজা এসেছ, কই, সে কথা এতক্ষণ বলো নি কেন?'

কথা বলতে বলতে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কোটের এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে একটা আধুলি টেনে বার করেই বেয়ারাকে হাঁক দিলেন—'যা দৌড়ে যা, কচুরি আর ভালো ভালো সন্দেশ নিয়ে আয়।'

অতি কষ্টে নানা অজুহাত দেখিয়ে জলধরদাকে নিবৃত্ত করলাম। বুঝলাম অস্নাত অভুক্ত হতাশ চেহারাটা ওকে ব্যথা দিয়েছে। ছবিটা বগলদাবা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই জলধরদা অনুনয়ের স্বরে বললেন—'কিছু খেয়েদেয়ে হরিদাসের জন্য আর একটু অপেক্ষা করে গেলে হত না? ও আজকালকার ছেলে, ছবিটা ওর হয়তো পছন্দ হত।'

ইতিমধ্যে আগন্তুক সাহিত্যিক আমাকে ইশারায় কাছে ডেকে ফিসফিস করে বললেন—'তুমি ত শান্তিনিকেতনের ছেলে। জলধরদার ইচ্ছে রোব্‌বাবুর নাম করে রামানন্দ চাটুজ্যেকে ধরে ছবিটি 'প্রবাসী'তে ছেপে দাও। তবেই রগড় জমবে।'

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন জলধরদা। 'বয়েস হয়েছে, আক্কেল হল না? রসিকতারও তো একটা স্থান-কাল-পাত্র আছে।'

জলধরদার গর্জন শুনতে শুনতে আমি ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছি।

আমার কথা শেষ হতেই একজন প্রশ্ন করলেন—'ছবিটা কি শেষ পর্যন্ত আর ছাপাই হয় নি?'

'হয়েছিল বাতায়ন পত্রিকায়, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর। ছবিটা তারিফও পেয়েছিল খুব।'

গল্প বলতে বলতে কখন যে টেবিলের মুড়ি-নারকল সাবাড় হয়ে গেছে টেরও পাই নি। আক্ষেপ জানিয়ে বললাম—'জলধরদার কচুরি-সন্দেশ খাওয়া হল না আর সেই গল্প বলতে গিয়ে মুড়ি-নারকল থেকে বঞ্চিত হলাম।'

ফল হল। আড্ডাধারী বন্ধুদের মধ্যে একজন সঙ্গে সঙ্গে আরেক দফা

মুড়ি-তেলেভাজা তৎসহ আরেক প্রস্থ চায়ের জন্য বেয়ারার হাতে টাকা দিয়েই প্রশ্ন করলেন—

'আচ্ছা, জলধরদা যে কানে খুবই কম শুনতেন সে-কথা তো আপনি বললেন না ?'

অবাক হয়ে বললাম—'কই আমি তো তার কোন পরিচয় পাই নি।'

বন্ধুটি মৃদু হেসে বললেন—'এখন বুঝতে পারছি লোক বিশেষে তিনি কানে কম শুনতেন। সেটাই ছিল তাঁর ট্যাকটিকস্। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলছি।'

সবাই উৎসুক হয়ে উঠলাম আরেকটি গল্পের গন্ধ পেয়ে। বন্ধুবর বললেন—

'আমি তখন আশুতোষ কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, কলেজ ম্যাগাজিনে একটা গল্প লিখে সুনাম হয়েছে। ক্লাসের বন্ধুরা উৎসাহ দিয়ে বললে—নামকরা কাগজে তুই লেখ, নিশ্চয় ছাপা হবে। একদিন কলেজের পর সাইকেলটা নিয়ে সোজা গেলাম ভারতবর্ষ অফিসে জলধরদার কাছে। একটি গল্প দিয়েই চলে এলাম। একমাস যায়, দুমাস যায় তৃতীয় মাসও গেল। গল্পের আর কোন পাত্তা নেই। চতুর্থ মাসে আবার সাইকেলে করে ভারতবর্ষ অফিসে। জলধরদার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'চার মাস আগে একটা গল্প দিয়েছিলাম, সেটা কি আপনার মনোনীত হয় নি ?'

জলধরদা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ডান কানের পিঠে হাত রেখে বললেন—

'কি বললেন ? শরীর ? সঙ্গমে এসে পড়েছি। এখন মহাসমুদ্রে বিলীন হলেই হয়।'

বুঝলাম, আমার প্রশ্ন শুনতে পান নি। তাই আরেকটু গলা চড়িয়ে আমার লেখার কুশল প্রশ্ন করলাম।

—'লেখা ? লেখা-টেখা সব এখন বন্ধ। বয়েস হয়েছে, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ। নতুন লেখায় আর হাত দিতে পারছি না।'

বন্ধু বললেন—'আপনারাই বলুন, এরপর গল্প সম্বন্ধে আর কি প্রশ্ন করা চলে ? নতুন লেখকদের প্রতিষ্ঠা লাভের একমাত্র চাবিকাটি সহিষ্ণুতা। আমিও তাই আর তৃতীয়বার ট্রাই না করেই নমস্কার জানিয়ে বিদেয় হলাম। পরের মাসেই দেখি গল্পটি ছাপা হয়েছে।'

সবাই সমস্বরে হেসে উঠলাম। জলধরদার ট্যাকটিকস্-এর বলিহারি।

নতুন লেখকদের 'কেন গল্প অমনোনীত করেছেন' এই প্রশ্নবাণ থেকে রেহাই পাবার এক মোক্ষম উপায়। মুড়ি-তেলেভাজা এসে গেছে, আমিই সর্বাগ্রে সক্রিয় হয়ে সংকারে লেগে গেলাম। জোড়া টেবিলের পূর্বপ্রান্তে এতক্ষণ যে সাহিত্যিকবন্ধুটি নীরবে বসে এইসব খোশগল্প শুনে যাচ্ছিলেন তিনি একজন কবি, বয়সে আমাদের মধ্যে তরুণতম। এবার তিনি মুখ খুললেন।

—'শুধু জলধরদাকে এই ট্যাকটিকসের জন্য দোষ দিলে চলবে কেন। এরকম ট্যাকটিকস্ আরও একজন সম্পাদককে এবং হালফিলের সম্পাদককে আমি নিতে দেখেছি।'

সবিস্ময়ে আমরা সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকালাম। অর্থাৎ কে তিনি ?

কবি বন্ধু বললেন—'বেশী দিনের কথা নয়। তখন আমি দু-একটা কবিতা লিখলেও ছোট গল্পই বেশী লিখতাম। কোন একটি জনপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তরে একটি গল্প পাঠিয়ে দু মাস বাদে সম্পাদকের অফিসে খোঁজ নিতে গিয়েছি। সেই আমার প্রথম সম্পাদকের কাছে যাওয়া, তাই দুরুদুরু বক্ষে গল্পর কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি টেবিলের ওপরে কাগজের ঠোঙায় রাখা একগাদা পানের মধ্যে থেকে দুটি পান মুখে পুরলেন, পকেট থেকে জর্দার কৌটো বার করে এক খাবলা মুখে ফেলে সেই যে ধ্যানস্থ হয়ে জাবর কাটতে লাগলেন আর স্পীক-টি নট।'

আবার জিজ্ঞাসা করলাম—'আমার দুমাস আগের দেওয়া গল্পটা ?'

ধ্যানীবুদ্ধের মত দক্ষিণ হস্ত তুলে বরাভয়ের মুদ্রা দেখিয়েই আবার তিনি গালভরতি পান জর্দার রস উপভোগে মগ্ন হলেন। আবার প্রশ্ন, আবার সেই হস্ত প্রসারণ। ট্রামের মান্থলি টিকিট দেখালে কনডাকটার যেমন হাত তুলে আশীর্বাদের মুদ্রা দেখিয়ে জানায় 'ঠিক হ্যায়', এও তেমনি, ততক্ষণে আমার মেজাজ তিরিক্ষি। আমারও জেদ চেপে গেল, একটা কিছু উত্তর না নিয়ে ছাড়ছি নে। আবার বললাম, 'গল্পটার কি করলেন বলুন।'

এবারে সম্পাদক মহাশয়ের ধ্যান ভাঙ্গল। বুঝলেন, এ ছোকরা সহজে নড়বার পাত্র নয়। অগত্যা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, বারান্দায় গেলেন, পানের পিক্ ফেললেন, ঘরে এসে খানিকটা জল খেয়ে বললেন—

'পিক্ সেই ফেলালেনই। সবে দু-মাস হয়েছে, আরও একমাস যাক তখন জানতে পারবেন।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে চলে এলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সেই পত্রিকা অফিসের পিয়ন বাড়ির দরজায়। হাতে একটা খাম। আমার সেই গল্প আর তার সঙ্গে সম্পাদকের এক দীর্ঘ পত্র।

আমাদের মধ্যে একজন বললেন—'সেই ছাপানো চিঠি তো? যাতে লেখা থাকে—রচনাটি অমনোনীত হওয়ায় দুঃখের সহিত ফেরত পাঠাইতে হইল। আশাকরি ভবিষ্যতে আপনার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না ইত্যাদি ইত্যাদি।'

কবিবন্ধু বললেন—'ঠিক তা নয় তবে তার কাছাকাছি। সম্পাদকের স্বহস্ত লিখিত সেই চিঠির মোদ্দা কথাটা হচ্ছে গল্প লেখা কস্মিনকালেও আমার দ্বারা হবে না। কবিতাতেই নাকি আমার স্বাভাবিক স্ফূর্তি তাই কবিতাই যেন আমি লিখি। তারপর আর কোনদিন গল্প লিখি নি।'

গল্প শুরু করেছিলাম শরৎচন্দ্র ও জলধরদাকে নিয়ে। কিন্তু প্রস্তাবনা করতে গিয়ে কথায় কথায় কোথায় এসে পড়েছি। গল্পটা শুনেছিলাম সেদিনের আড্ডাতেই আমাদের এক কথা সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে। শরৎচন্দ্র একবার জলধরদাকে কি রকম জব্দ করেছিলেন। আজ থাক। গল্পটা বারান্তরে আপনাদের শোনাব।

॥ ২ ॥

শনিবারের বৈকালিক বৈঠক সেদিন জমজমাট। খোশ গল্পের যাবতীয় ইন্ধন উপস্থিত, শুধু উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছি আমাদের এই আড্ডার প্রধান গাল্পিক সেই কথা-সাহিত্যিক বন্ধুটির, যিনি শরৎচন্দ্র আর জলধরদার কাহিনী আমাদের শোনাবেন বলে সুড়সুড়ি দিয়ে রেখেছিলেন।

এমন সময় শাল পাতা মোড়া একটা ঠোঙা হাতে তিনি এসে উপস্থিত। সবাই বিস্মিত, ঠোঙায় আবার কী এল!

বন্ধুবর বললেন—'বড়বাজারের মোড়ে নেমেই দেখি ফুটপাতের ধারে

অয়েল-কেক, একেবারে গরমাগরম। আড্ডার গল্পের সঙ্গে ভাল জমবে ভেবেই এক ঠোঙা নিয়ে এলাম।'

অয়েল-কেক? সে আবার কি।

'ও, সাহেবী ভাষায় বললাম বলে বুঝি অবাক হচ্ছেন। আমাদের আদি ও অকৃত্রিম তেলে ভাজা। এবার বুঝলেন তো? রাস্তার ধারে তোলা উনুনে ভাজছিল। আর জানেন তো? যত ধুলো পড়বে ততই তার আস্বাদ আর ততই তার রঙের খোলতাই।'

আড্ডার আর এক বন্ধু যিনি রম্য রচনায়, গল্প-উপন্যাসে, কাব্য-কবিতায় সব্যসাচী অর্থাৎ যিনি সাহিত্যের বাজারে 'জ্যাক অব অল্ ট্রেডস' তিনি যেমন শীর্ণদেহ তেমনি পেটরোগা। কথাবার্তায় শ্লেষ তাঁর থাকবেই, কিন্তু আড্ডায় রসের যোগান দিতে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি বললেন—

'আপনার আনা 'অয়েল-কেক্' দেখেই বুঝতে পারছি যে আপনার লেখা গল্প কেন পাঠকরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে।'

'তার মানে? অর্থ টা পরিষ্কার হোক।' অপর একজন প্রশ্ন তুললেন।

'অর্থ? অর্থ তো পরিষ্কার। অয়েল-কেক বলে যেমন তেলেভাজা আমাদের দেখালেন, তেমনি ইংরেজী সাহিত্যিকদের টেক্‌নিক্ অবলম্বন করে দেশী মাল ছাড়তে ইনি ওস্তাদ। পাঠকরা ফলাফল বিবেচনা না করেই গরম-গরম খেল বটে, পরে বদহজম অথবা চোঁয়া ঢেকুরের জ্বালায় অস্থির। আপনারাও এখনই খেয়ে তার ফলভোগ করবেন।'

গাল্পিক বন্ধুটিও ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—'ছেলেবেলায় তেলেভাজা কে না খেয়েছে। আমি আপনি সবাই খেয়েছি। আজ না হয় আপনাদের অরুচি। কিন্তু খাবার লোকের কি অভাব আছে? তাছাড়া আপনি তো একাধারে রসগোল্লা পান্তুয়া সন্দেশ সবই খাওয়াচ্ছেন। তাতে ছানা কোথায়? সবই তো সুজির ডেলা আর চালের গুঁড়ো। তাও আবার ভেজাল ঘিয়ে ভাজা আর ভেলি গুড়ে জ্বাল দেওয়া।'

কোথায় গল্প শুনব, তা নয়, গল্পের গরুকে শূলে চড়াবার উপক্রম। কী দরকার ছিল অর্থ জানবার! অর্থ ই যত অনর্থের মূল। দেখতে দেখতে আড্ডা একেবারে হাফ-আখড়াইয়ে পরিণত হল। নিরুপায় হয়ে একখানা তেলে-ভাজা ঠোঙা থেকে বার করে মুখে পুরে তারিফ করে তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে চলেছি,

ততক্ষণে আমার দেখাদেখি অন্যরাও ঠোঙার শালপাতার সেলাই খুলে তেলে-ভাজায় তদ্গতপ্রাণ হয়ে উঠেছেন। খেলেন না শুধু তাঁরা দুজন, যিনি এনেছিলেন এবং যিনি তেলেভাজা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবহাওয়া থমথমে করে তুলেছিলেন। কিন্তু সেই আবহাওয়াকে হালকা রসিকতায় সরগরম করে তুলতেও তাঁর জুড়ি মেলে না। তিনি বললেন—

'আপনি সেদিন সেই পান-খোর সম্পাদকের যে-ঘটনা বললেন তাতে বুঝতে পারছি আমাদের আড্ডার কবি বন্ধুটির কত বড় সর্বনাশ তিনি করেছেন।'

—'সর্বনাশ! কি করে?'

—'সর্বনাশ ছাড়া কি। গল্প লিখতে লিখতে উপন্যাস লেখা, তারপর পত্রিকায় একবার ছেপে দিতে পারলে প্রকাশক হাজির। সঙ্গে সঙ্গে দুটো পয়সার মুখদর্শন। কিন্তু তাঁকে কবি বানিয়ে দিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎটা তো দিলেন শেষ করে।'

আমাদের এই আড্ডার আরেকজন গল্প-লেখক যিনি অবৈধ প্রেমের গল্প লিখে সম্প্রতি নাম করেছেন, তিনি একটু গম্ভীরভাবেই বললেন—

'আমি কিন্তু ও ভুলটা সময়েই সংশোধন করে নিয়েছি। কবিতা লিখেই আমার সাহিত্যজীবনের প্রথম সূত্রপাত। দেখলাম ওতে নাম হয় না, ইনাম তো দূরের কথা।'

এবারে আমাদের গাল্পিক বন্ধুটি মুখ খুললেন—'কারণটা কি জানেন? আমাদের দেশে এমন একটিও তরুণ নেই যে প্রেমে পড়ে নি, কবিতা লেখে নি আর স্নানের ঘরে ঢুকে গান গায় নি। এই তিনটার কোন একটা যার জীবনে ঘটে নি সে বাঙালী নয়।'

আমি বললাম—'আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু অন্তত বলতে পারি যে, আজকের বাংলাদেশে কবিতার পাঠকের চেয়ে কবিতা লেখকের সংখ্যা তিন তিরিখ্‌খে নয় অর্থাৎ তিনগুণ বেশী। এই দপ্তরে প্রতিদিন কবিতা আসে তিরিশ কি চল্লিশটা। ছাপা হয় সপ্তাহে দুটো কি তিনটে। কিন্তু পাঠকদের মধ্যে তো কোন বিক্ষোভ দেখি না, তারা তো আওয়াজ তোলে না। কবিতা আরও ছাপতে হবে!'

এদিকে আধুনিক কবিরা কিন্তু হিন্দী কবিদের মুশায়েরার অনুকরণে দিকে-

দিকে কবিতা-মেলা আয়োজন করছেন, চৌরঙ্গীর উপর ট্রামের গুমটির সামনে প্যাকিং বাক্সর উপর দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করছেন, এমন কি শোভাযাত্রা করে ধ্বনি তুলছেন—কবিতা পড়ুন, আরও কবিতা পড়ুন। কিন্তু কাকস্য…। ভবি ভোলবার নয়।

আড্ডার কবি-বন্ধু এতক্ষণ নীরবে আমাদের আলোচনা শুনছিলেন। এবারে তিনি প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন—'গল্প-উপন্যাসের মত কবিতার পাঠক আমাদের দেশে অনেক কম এ-কথা মানি। কিন্তু পাঠক একেবারে নেই তা ঠিক নয়। রবীন্দ্র অনুসারী প্রবীণ কবিদের পাঠকদের কথা আমি অবশ্য বলতে পারি না। কারণ তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ব্যর্থ অনুসরণ করে 'মানসী' পর্যন্তই এগিয়েছিলেন। তারপর সেই যে থেমেছেন, সেইখানেই ঘুরপাক খেয়ে চলেছেন উপগ্রহের মত, আর অগ্রসর হতে পারেন নি। সুতরাং তাঁদের পাঠক কে এবং তাঁরা আজও বেঁচে আছেন কিনা জানি নে। কিন্তু আমি অন্তত এটুকু হলপ করে বলতে পারি আমার পাঠক আছে এবং তা আছে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে। তারা নূতন মন নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আজকের দিনে এগিয়ে আসছে। হোক না তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, তবু তারাই আমার পাঠক।'

কবি-বন্ধু থামলেন, থামবার আগে শেষের কথাটা একটু জোরের সঙ্গেই বলে থামলেন। সেদিনের আড্ডার সুর যেন কেটে গেল, গল্প বলা বা শোনার মেজাজ কারোরই যেন আর নেই। এদিকে শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, অফিসের যে অঞ্চলে আমাদের আড্ডা বসে তার আশে পাশের ঘরের লোকজন ছুটি হয়ে যাওয়ায় ঝাঁপ বন্ধ করে চলে গেছেন। গল্প আর জমবে না মনে করে সবারই কেমন যেন উঠি-উঠি ভাব, দু-একজন কাজের অছিলায় উঠেও গেলেন।

চায়ের দোকানের ছোকরাটা এসে হাজির টেবিলের উপর অনেকক্ষণ পড়ে-থাকা চায়ের কাপগুলি তুলে নিয়ে যাবার জন্য। কাপগুলির ভিতরে চায়ের তলানির সঙ্গে সিগরেটের ছাই আর টুকরোয় ভরতি। কাগজগুলি খুলে গিয়ে সিগারেটের তামাক চায়ের জলে ভিজে বজকে উঠে বিশ্রী দেখাচ্ছে। ছোকরাটা বিরক্তিমাখা কণ্ঠে বললে—'টেবিলে দু-তিনটা ছাই ফেলার বাটি থাকতে কেন যে আপনারা চায়ের কাপে সিগরেটের টুকরো ফেলেন বুঝি না। দোকানের বাবু রাগারাগি করেন আমাদের উপর। বলেন– যা, গিয়ে বাবুদের

বল গে যা, এ রকম করলে এবার থেকে সিগারেটের ছাইদানিতে করে চা পাঠাব আর সঙ্গে হাতল-ভাঙা কাপ দিয়ে দেব ছাই ফেলার জন্যে।'

আমাদের আড্ডায় একজন সাত্ত্বিক সাহিত্যিক আছেন, যিনি যাবতীয় পানদোষ থেকে মুক্ত। সুযোগ পেয়ে বলে উঠলেন—'নিন, এবার ঠ্যালা বুঝুন। পই-পই করে আপনাদের বারণ করেছিলাম অত সিগরেট খাবেন না, গলায় ফুসফুসে ক্যানসার হবে, একেবারে দুরারোগ্য রোগ। তা নয়, কারখানার চিমনির মত অনবরত মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়া আর ঘর দোর মেঝে চায়ের কাপ সিগারেটের টুকরোয় তছনছ করা। ঠিক হয়েছে। ওহে ছোকরা, যাও তো পাঁচ ছাইদানি চা এনে দাও বাবুদের। পয়সা না হয় আমিই দেব।'

আমরা তো সবাই অবাক। বলল কি না—'পয়সা আমিই দেব।' জীবনে আজ বোধ হয় প্রথম ওঁর মুখে এই কথা শুনলাম। এমন কি চায়ের ছোকরাটাও যেতে-যেতে কথাটা শুনে যেন হকচকিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ছোকরা দিনের পর দিন এ-ঘরে চা দিয়ে যায়, সুতরাং আড্ডাধারী প্রতিটি ব্যক্তিকে সে ভাল করেই চেনে জানে। পুজোর সময় বকৃশিশ দিতে হবে এই ভয়ে যে লেখক পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পর জন্য পত্রিকা বা টাকা নিতে আসে না, বলে—ডাকে পাঠিয়ে দিন, কাজের চাপে সময় করে উঠতে পারছি না, এ-হেন ব্যক্তি—তিনি এক সাহেব কোম্পানীতে মোটা চাকরি করেন, কলকাতায় তিনতলা যাঁর বাড়ি তা সত্ত্বেও যাঁর কাছে ওয়ান্ পাইস ফাদার-মাদার, সে দেবে চায়ের দাম ?

আমাদের সব্যসাচী লেখক বললেন—'ওঁর কথা আর বলবেন না। আরে মশাই সেদিন ওঁর এক প্রকাশকের অফিসে রয়ালটি বাবদ মোটা টাকার চেক আদায় করেছেন। ওঁর অনেকগুলো উপন্যাস ওখান থেকে বেরিয়েছে কিনা। কর্মচারীরা ওঁকে এসে ধরলেন কিছু মিষ্টি খাওয়াতে; ওখানে যে সব লেখকদের বইয়ের মোটামুটি ভাল বিক্রি তাঁরা কর্মচারীদের পাঁচ-দশ টাকা দিয়ে থাকেন মিষ্টি খাবার জন্যে। কি বলব মশাই, বুক পকেট থেকে অতি কষ্টে একখানা দুটাকার নোট বার করে দিলেন, যেন নিজের কলজেটা উপড়ে দিচ্ছেন, এ রকম মুখের ভাব।'

'আপনি কি করে জানলেন ? আপনি তো আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।' একটু রাগতস্বরে বললেন সাত্ত্বিক সাহিত্যিক।

'উপস্থিত থাকতে হবে কেন। প্রকাশকের সেই প্রুফ-রীডার, যে মাঝে

মামা চোখের ইশারায় আমাকেও সারেণ্ডার করতে বললেন, আমিও বার করলাম। দাদামশায়ের তো দেখে চক্ষু স্থির।

আড্ডার গাল্পিক বন্ধুটি এতক্ষণে মুখ খুললেন। বললেন—'বা-ব্বা! একখানা মামা বটে। তা আপনার দাদামশাই সত্যিই কিছু বললেন না?'

'বলবেন আর কি। পরের মাসেই মামাকে পাঠিয়ে দিলেন রাঁচী। রামকৃষ্ণ মিশনের একটা বিদ্যাপীঠ আছে, যেখানে প্রথমেই ছাত্রদের মাথা মুড়িয়ে দেয়, সেইখানে।'

'যাক, মামার তো সর্বনাশ যা হবার হল। আপনার কি গতি হল?'

'দাদামশায় বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন পরীক্ষার পরই আমাকে যেন কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়েও গেলেন। শুধু কলকাতা থেকে নয়, একেবারে ভারতবর্ষের বাইরে আমাকে চলে যেতে হল।'

আমাদের সেই সব্যসাচী রসিক বন্ধুটি টিপ্পনী কেটে বললেন—'ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিলেন, ভালই করেছিলেন। ফিরে এলেন কেন? সাহিত্যিকদের এই ভিড়ে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী অন্তত কমত।'

॥ ৩ ॥

আবার আপনাদের সেই গল্পতে ফিরিয়ে নিয়ে আসি যে-গল্প দিয়ে 'সম্পাদকের বৈঠকে' শুরু করেছিলাম। শরৎচন্দ্র জলধরদাকে নিয়ে একবার মারাত্মক রসিকতা করেছিলেন, যার ফলে বেশ কিছুকাল দুজনের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গল্পটা শুনেছিলাম বৈঠকের সেই গাল্পিক সাহিত্যিকের মুখে। আমি শুধু পুনরাবৃত্তি করছি।

একদিন দুপুরে জলধরদা বিষণ্নমুখে ভারতবর্ষ অফিসে চুপচাপ বসে আছেন। টেবিলের উপর তাঁর সদ্য লেখা উপন্যাস 'উৎস'র ছাপা ফর্মার উপর সকরুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ। এমন সময় শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেই জলধরদার এমন মুষড়ে পড়া চেহারা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। সভয়ে অথচ স্বভাবগত ফক্কড়ি করে জিজ্ঞাসা করলেন—

'একি জলধরদা! কেন আজি হেরি তব মলিন বদন? কিবা প্রয়োজনে মাগিয়াছ'—

রাগতস্বরে জলধরদা বললেন—'দেখ শরৎ, সব সময় তোমার এই ঠাট্টা ইয়ার্কি ভাল লাগে না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়। তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম কোথায় আমাকে একটা সৎপরামর্শ দেবে, তা নয় ঘরে ঢুকেই থ্যাটারি শুরু করে দিলে।'

জলধরদার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় অনেক দিনের। যেদিন থেকে জলধরদা ভারতবর্ষের সম্পাদনার ভার নিলেন সেদিন থেকেই শরৎচন্দ্র এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক। লেখক-সম্পাদক পরিচয় ক্রমশ নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে এতদিনে মধুর ইয়ার্কির সম্পর্কে এসে দাঁড়িয়েছে। জলধরদাকে শরৎচন্দ্র বরাবরই অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করেন। শুধু বয়ঃজ্যেষ্ঠ বলেই নয়, সাহিত্যিক জলধর সেন শরৎচন্দ্রর অগ্রণী। তাছাড়া এই আত্মভোলা মানুষটির চারিত্রিক মাধুর্য সবসময়েই শরৎচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছে। শরৎচন্দ্র অনুমান করলেন নিশ্চয় সদ্যছাপা উপন্যাস নিয়েই জলধরদার এই দুশ্চিন্তা। ওঁর চোখের দৃষ্টিই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ-যেন অরক্ষণীয়া কন্যার প্রতি পিতার ব্যথাতুর দৃষ্টি।

জলধরদা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—'জানো শরৎ, এইটিই আমার শেষ উপন্যাস। আমার যা-কিছু সঞ্চয় ছিল সেই টাকা দিয়েই উপন্যাসটি ছাপলাম। এখনও প্রেস-কে কিছু টাকা দেওয়া বাকি কিন্তু বাইণ্ডার বলছে কিছু টাকা আগাম না পেলে ছাপাখানা থেকে আর ছাপা ফর্মা ও ডেলিভারি নেবে না। এখন কি করি বল তো?'

শরৎচন্দ্র অবাক। এই বৃদ্ধ বয়সে নিজের সামান্য সঞ্চয় এ-ভাবে নিঃশেষ করলেন?

জলধরদা বলেই চললেন—'তুমি ভাবছ নিজে খরচ করে কেন এ-বই ছাপলাম। কিন্তু এ-ছাড়া আর উপায় কী ছিল। প্রকাশকরা আমার বই নিতে চায় না, বলে কিনা আমার বইয়ের বিক্রি নেই। আমার আগের যে-সব বই প্রকাশকদের কাছে আছে তার বাবদ কি পাওনা হয়েছে তার কোন হিসেব-পত্তর নেই। অন্তত অধিকাংশর কাছে হিসেব চাইতে গিয়ে 'আমার বই বিক্রি হয় না' এই কথা শুনে লজ্জায় ফিরে এসেছি। তাই ভাবলাম আমার জীবনের এই শেষ উপন্যাস আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে নিজের খরচেই

প্রকাশ করব। কিন্তু এখন দেখছি তরী তীরের কাছে এসেই বুঝি ডোবে ডোবে।'

'এই জন্যে আপনার এত দুশ্চিন্তা? কিছু ভাববেন না। আমি আপনাকে সোজা উপায় বাতলে দিচ্ছি।' কথাটা শরৎচন্দ্র বললেন বেশ একটু জোরের সঙ্গেই, যাতে জলধরদার মনের বোঝা নিমেষেই নেমে যায়। সত্যি সত্যি হলও তাই। ক্ষীণ আশার আলোক সঞ্চারে জলধরদার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

টেবিলের উপর থেকে উপন্যাসের ছাপা ফর্মাগুলি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে শরৎচন্দ্র বললেন—'টাইটেল পেজ তো ছাপা হয় নি দেখছি। বইটা উৎসর্গ কাকে করবেন কিছু ভেবেছেন কি?'

জলধরদার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। বললেন—'ঠিক করেছি বইটা আমার প্রথমা পত্নীকেই উৎসর্গ করব—যিনি ছিলেন আমার প্রথম যৌবনের সাহিত্য প্রেরণার একমাত্র উৎস।'

শরৎচন্দ্র মাথা চুল্‌কে বললেন—'প্রথমা পত্নীকে আপনি যে প্রাণাধিক ভালবাসতেন এই বৃদ্ধবয়সে সে-কথা দুনিয়াসুদ্ধ লোককে জানিয়ে আর লাভ কি। তাছাড়া তিনিও তো আর স্বর্গ থেকে নেমে এসে আপনার বই প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিতে পারছেন না। এ-ক্ষেত্রে যাকে উৎসর্গ করলে কাজ হবে তার কথাই ভাবুন।'

এতক্ষণে জলধরদা যেন একটু আশার আলো দেখলেন। বললেন—'তুমিই বল না কাকে উৎসর্গ করা যায়।'

'কেন লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় তো আছেন। একেবারে সাক্ষাৎ গৌরী সেন। তাঁর নামে উৎসর্গ করে সশরীরে বইটা তাঁর হাতে তুলে দিন, দু-চার হাজার তো নির্ঘাত এসে যাবে।'

শিশুর মত একগাল সরল হাসি হেসে জলধরদা বললেন—'এই জন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম শরৎ। তুমি ছাড়া এসব বুদ্ধি আর কার মাথায় খুলত বল? তোমার পরামর্শ তো ভালই বোধ করছি, তবু এর মধ্যে একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে শরৎদা বলে উঠলেন—'সে কথাও আমি যে ভাবি নি তা মনে করবেন না। উৎসর্গ করা সত্ত্বেও যদি টাকাটা না পান তাহলে এ-কূল ও-কূল দুকূল যাবে। এই তো আপনার আশঙ্কা?'

'ঠিকই বলেছ। জাতও দেব পেটও ভরবে না এরকমটা যেন না হয়।'

শরৎচন্দ্র বললেন—'তাহলে এক কাজ করুন। উৎসর্গ পত্রটি এখন আর ছেপে কাজ নেই। ওই পাতাটা কম্পোজ করিয়ে ভাল করে একটা প্রুফ টানিয়ে ছাপা ফর্মার সঙ্গে জুড়ে দিলেই হবে। সুতরাং আর কালক্ষেপ না করে দু-চার দিনের মধ্যেই লালগোলা চলে যান, যাবার আগে একটা চিঠি দিয়ে আপনার যাবার কারণটা না জানিয়ে শুধু খবরটা জানিয়ে রাখবেন।'

শরৎচন্দ্র তো মোক্ষম পরামর্শ দিয়ে চলে এলেন।

তিন-চারদিন পর জলধরদা শিয়ালদায় দুপুরের লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চেপে বসলেন। সন্ধ্যার সময় ইস্টিশনে লালগোলার সরকার মশাই এসে উপস্থিত। যথারীতি সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে তিনি জলধরদাকে নিয়ে গেলেন রাজবাড়িতে, শুভকাজটা সর্বাগ্রে সেরে নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই ছিল জলধরদার ইচ্ছে। কিন্তু সরকার মশাই জলধরদাকে নিয়ে তুললেন অতিথিশালায়। জলযোগের ভূরি আয়োজন ছিল। কিন্তু জলধরদার উৎকণ্ঠিত চিত্ত রাজ-সন্দর্শনের জন্য অস্থির। তিনি প্রশ্ন করলেন—'রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কখন সাক্ষাৎ হতে পারে?'

সরকার মশাই বিনয়ের অবতার। করজোড়ে নিবেদন করলেন—'পথভ্রমণে আজ আপনি ক্লান্ত, জলযোগাদি সেরে বিশ্রাম করুন। আপনার সেবার যাতে কোনরকম ত্রুটি না হয় সে কথা রাজা বার-বার করে আমাকে বলে দিয়েছেন আর বলেছেন, রাত্রে আহারের সময় আপনার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। ততক্ষণ নদীর ধারটা একবার আপনাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসতে বলেছেন, অবশ্য শারীরিক ক্লেশ যদি বোধ না করেন।'

জলধরদা বললেন—'বিলক্ষণ। লালগোলায় আমি আগে কখনও আসি নি। দেশটা ভাল করে দেখে যাওয়াই তো আমার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এ-দেশের মহানুভব রাজার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা।'

সরকার মশাই দুই হাত কচলে বললেন—'সে তো নিশ্চয়, রাজাও আপনার মত দেশবরেণ্য সাহিত্যিকের দর্শনলাভের জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। তা ছাড়া তিনি জানতে চেয়েছেন রাত্রে আপনার আহারাদির কি রকম ব্যবস্থা করা হবে।'

জলধরদা বললেন—'জলযোগের যা বিরাট আয়োজন করেছেন রাত্রে আর কিছু খেতে পারব বলে তো মনেই হয় না। তাছাড়া রাত্রে আমি খাই

যৎসামান্যই। বিশেষ কিছু করবেন না—খান কুড়ি খাঁটি গব্যঘৃতে ভাজা লুচি, তার সঙ্গে কিছু মাংস। ভাজাভুজি দু-চার রকম করলেও করতে পারেন। আলু-ফুলকপি দিয়ে একটা নিরামিষ তরকারি। এখানকার গলদা চিংড়ি শুনেছি খুব ভাল। চিংড়ির একটা কালিয়া গরম-গরম লুচি দিয়ে মন্দ লাগবে না, তার সঙ্গে মুখ মারবার জন্যে আনারসের চাটনি থাকলেও থাকতে পারে। সবশেষে একবাটি ঘন দুধ, ক্ষীর বললেও বলতে পারেন। খাওয়ার শেষে একটা কিছু মিষ্টি খাওয়া আমার বহুদিনের বদভ্যাস। সঙ্গে মর্তমান কলা একটা দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ বেশী কিছু আয়োজন করবেন না। দেখতেই তো পাচ্ছেন—বয়স হয়েছে, তাই রাত্রির খাওয়া একেবারে কমিয়ে দিয়েছি। নইলে ঘুম হয় না, হজমেরও কষ্ট হয়।'

সরকার মশাই ততক্ষণে পকেট থেকে নোটবুক-পেনসিল বার করে দশ-দফা ফর্দ টুকে ফেলেছেন। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে জলধরদা বললেন—'আজ আর বেড়াতে যাবার ইচ্ছে নেই, শরীরটা খুবই ক্লান্ত। আপনি বরং রাত্রে খাবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যাবেন।'

সরকার মশাইকে বিদায় দিয়ে জলধরদা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবনা আর কিছুই নয়, রাত্রে রাজার সঙ্গে দেখা হলে কথাটা কী ভাবে পাড়বেন মনে মনে তারই রিহার্সাল দেওয়া।

যথা সময়ে সরকার মশাই এসে জানালেন, খাবার সময় হয়েছে—রাজা অপেক্ষা করছেন। জলধরদার সেই রাজকীয় পোশাক। গলাবন্ধ কোট আর কাঁধের উপর ভাঁজ করা চাদর। চাদরের আড়ালে বগলের নীচে কাগজমোড়া বইয়ের বাণ্ডিলটা নিতে ভোলেন নি।

ঝাড় লণ্ঠন আলোকিত রাজবাড়ির প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ পার হয়ে 'ডাইনিং রুমে' ঢুকে দেখেন একটা লম্বা টেবিলের একপ্রান্তে সৌম্যদর্শন রাজা তাঁরই অপেক্ষায় বসে আছেন। চেয়ার থেকে উঠে স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানিয়ে টেবিলের অপর প্রান্তে বসবার জন্য আহ্বান জানিয়েই ভোজ্যবস্তু পরিবেশনের জন্য সরকার মশাইকে আদেশ জানালেন—

'কাল সকালে ওঁকে একবার নদীর ধার এবং তার পাশের গ্রামগুলি বেড়িয়ে নিয়ে আসবেন।'

জলধরদা খেতে খেতে বললেন—'আপনি ব্যস্ত হবেন না, গ্রাম দেখতেই

তো আমার আসা। শৈশব কৈশোর আমার গ্রামেই কেটেছে তাই গ্রামের টান আমার প্রাণের টান।'

আহারান্তে লালগোলাধিপতি বিদায় চেয়ে জানালেন পরদিন সকালে যেন জলধরদা তাঁর সঙ্গে চা-পান করেন। প্রয়োজনের কথাটা বলতে গিয়েও সঙ্কোচবশত বলা হয়ে উঠল না, সুযোগই বা পেলেন কোথায়। আহারান্তে বিষণ্নচিত্তেই শয্যা গ্রহণ করলেন।

রাত আর কাটে না। কখন সকাল হবে, জলধরদা তারই প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত গুনছেন।

অবশেষে দুঃখের রাত্রি অবসান হল। সরকার মশাই এসে ডেকে নিয়ে গেলেন চায়ের আসরে। জলধরদার সেই এক বেশ। গলাবন্ধ কোট, কাঁধে চাদর, বগলের তলায় উপন্যাসের বাণ্ডিল।

লালগোলার রাজা তাঁরই প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি তো ?'

'কিছুমাত্র না।' এ-কথা বলেই আর কালক্ষেপ না করে বগলের তলা থেকে বাণ্ডিলটা বার করে রাজার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—'আমি তো যেতেই বসেছি, এই আমার শেষ কাজ। আপনার নামেই—'

'আহা-হা, হা হা, সে পরে হবে। এখন চা খান।' শশব্যস্ত হয়ে জলধরদার কথার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন লালগোলারাজ যোগেন্দ্রনারায়ণ।

সরকার মশাইকে বললেন গ্রামটা একবার ঘুরিয়ে দেখাতে এবং সেই সঙ্গে বললেন—'জলধরবাবু দুপুরে এবং রাত্রে কি কি খেতে ভালবাসেন সব তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ে সেই রকম ব্যবস্থা করবেন। আচ্ছা জলধরবাবু, আমি তাহলে এখন উঠি। দুপুরে খাবার সময় আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

বইয়ের বাণ্ডিলটা চাদরের তলায় ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে জলধরদা হতাশ-কণ্ঠে বললেন—'তাই চলুন সরকার মশাই, গ্রামটা তাহলে ঘুরেই দেখে আসি।'

গ্রাম প্রদক্ষিণ করে দুপুরে খাবার সময় যোগেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে দেখা হতেই এবারে মরিয়া হয়ে জলধরদা চাদরের তলা থেকে বইটা বার করেই একেবারে উৎসর্গের পাতাটা খুলে ধরে বলে উঠলেন—'আমি তো যেতেই বসেছি—'

জলধরদাকে থামিয়ে দিয়ে যোগেন্দ্রনারায়ণ বললেন—'আপনি এর জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। আহারাদি করে বিশ্রাম করুন। আপনি যখন আজ বিকেলেই চলে যাবেন স্থির করেছেন, সরকারকে বলে দিয়েছি সে নিজে গিয়ে আপনাকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবে। আপনি ওর জন্য কিছু ভাববেন না।'

খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন জলধরদা। আশার আলোক যেন একটু দেখতে পেলেন। অতবড় মানুষ অথচ কী লজ্জা, কী বিনয়। একেবারে হাতে হাতে দিতে সংকোচ বোধ করছেন বলেই বোধ হয় সরকারের হাতে ইস্টিশনেই পাঠিয়ে দেবেন।

যথাসময়ে জলধরদা ইস্টিশনে এসে ঘন ঘন পায়চারি করছেন, ট্রেন আসতে তখনও মিনিট দশ দেরি। সরকার মশাই নীরবে একপাশে দাঁড়িয়ে। একটু রূঢ় কর্কশস্বরেই জলধরদা সরকার মশাইকে বললেন—'রাজা কি সত্যিই কিছু আপনার হাতে দিয়ে পাঠান নি? কোন চেক্ বা চিঠিপত্র?'

'কই না। কিছুই তো দেন নি।'

'আমার কথা আপনার কাছে কিছু কি বলেছেন?' উৎকণ্ঠিত চিত্তে জলধরদা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনার কোনরকম অসুবিধা হয়েছে কি না তাই শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর তো কিছুই বলেন নি।'

ট্রেন ততক্ষণে এসে গিয়েছে। ট্রেনের কামরায় বসেও জলধরদার স্বস্তি নেই। বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছেন আর সরকার মশাইকে বলছেন—'দেখুন তো রাজবাড়ি থেকে কোন লোক ছুটতে ছুটতে আসছে কি না?'

সরকার মশাই ভাল করে নিরীক্ষণ করে জানালেন কোন লোককেই এদিকে ছুটে আসতে দেখছেন না।

ট্রেন ছাড়ার হুইসিল বেজে উঠল।

এমন সময় দূরে দেখা গেল একজন লোক সাইকেল চালিয়ে স্টেশনের দিকে আসছে। আর যায় কোথা। জলধরদা চিৎকার করে বলে উঠলেন —'সরকার মশাই, গার্ডকে শিগগির বলুন যেন গাড়ি এক্ষুনি ছেড়ে না দেয়।

রাজবাড়ি থেকে আমার কাছে লোক আসছে। আপনি ছুটে গার্ডের কাছে চলে যান।'

সাইকেল-চালক ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। সরকার মশাই পরামানিককে দেখেই চিনলেন, স্টেশনমাস্টারের দাড়ি কামাবার জন্যে আসছে। জলধরদাকে সে-কথা জানাতেই তিনি দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে এবং ক্রোধে ফেটে পড়লেন—'পরামানিক কি আর সোনামানিক হতে পারত না? ইচ্ছে করলেই পারত। ইচ্ছে না থাকলে আর কোত্থেকে হবে। বুঝলেন সরকার মশাই, এই শরৎই যত নষ্টের মূল। সে-ই আমাকে জোর করে পাঠিয়েছিল। কলকাতায় ফিরেই ওর সঙ্গে বোঝাপাড়া করতে হবে।'

সরকার মশাই জলধরদার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, গাড়ি ছেড়ে দিল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই একখানা ট্যাক্সি নিয়ে জলধরদা সোজা গিয়ে হাজির হলেন শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়িতে। ট্যাক্সি থেকে নামা নয়। ভিতরে বসেই খবর পাঠালেন। 'কী হল জলধরদা, কী হল' বলতে বলতে হন্তদন্ত হয়ে শরৎচন্দ্র বেরিয়ে আসতেই জলধরদা গর্জন করে উঠলেন—'হবে আবার কি। কিছুই হল না, মাঝখান থেকে তোমার কথায় বেল্লিক বনে এলাম। লালগোলা যাওয়া আসার পরিশ্রমই সার হল।'

শরৎদা বিস্মিতকণ্ঠে চোখ বড় বড় করে বললেন 'সে কী! কিছু দিলেন না?'

'না কিছুই না।'

গম্ভীর গলায় দৃঢ়তা এনে শরৎবাবু বললেন—'মামলা ঠুকে দিন।'

'মামলা?' জলধরদা তো অবাক।

বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের ঘুসি ঠুকে শরৎদা বললেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ মামলা। প্রিসিডেন্স্ আছে। এর আগে অনেক লেখকই বই উৎসর্গ করে ওঁর কাছ থেকে টাকা পেয়েছে! আপনিই বা পাবেন না কেন?'

রোষকষায়িত চক্ষে শরৎচন্দ্রের দিকে জলধরদা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। জলদগম্ভীরকণ্ঠে জলধরদা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন—

'ড্রাইভার, যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানেই ফিরে চল।'

এই ঘটনার পর বহুদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জলধরদার বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার ভাব হয়েছিল জলধরদার সম্বর্ধনা উপলক্ষে আহূত এক সভায়। সে আর এক কাহিনী।

॥ ৪ ॥

বিকেল বেলায় আমার দপ্তরের পুবদিকের খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি শেষবর্ষণের আকাশ, মেঘৈর্মেদুরম্বরম্। আর কিছুদিন পরেই বর্ষা বিদায় নেবে, শরৎ-আকাশে দেখা দেবে হালকা মেঘের গুচ্ছ। পূজা সমাসন্ন। শহুরে লোকদের মনের আকাশে ছুটির বাঁশি বেজে উঠবে, শহরের একদল বাইরে বেরোবার জল্পনা-কল্পনায় মুখর, সাজসরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর যারা থাকবে শহরে তারা সার্বজনীন উৎসবের আয়োজনে চাঁদার খাতা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় হুড়োহুড়ি লাগাবে, পূজার বাজার নরনারীর ভিড়ে ঠাসাঠাসি। আর আমরা, যারা সংবৎসর পত্রিকার পাতা ভরাবার কাজ নিয়ে কাটাই, এ-সময়টা তাদের কাছে রস-কষ হীন। মহালয়ার আগেই পূজা সংখ্যা বার করতে হবে, তাও যে-সে আকারের নয়, এক-একখানা পুরু টালি। চল্লিশ পঞ্চাশ ফর্মার একখানি পত্রিকা, তাবৎ স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধের এক বিরাট সমাবেশ। শারদীয় সাহিত্যের এই ভূরিভোজনে পাঠকরা গরম গরম গল্প-উপন্যাস পেয়ে ছুটির দিনগুলি আনন্দেই কাটান। কিন্তু এই আনন্দের আয়োজনের পশ্চাৎপটে যে ভিয়েন আছে, তারও আছে একটা বিরাট ইতিহাস। সে-ইতিহাস লেখক আর সম্পাদকের মধ্যে টানা পোড়েনের ইতিহাস। রঙ্গমঞ্চে আপনারা যখন অভিনয় দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন তখন জানতে পারেন না গ্রীনরুমের আড়ালে প্রধান-অভিনেতা তখনও অনুপস্থিত, মঞ্চ-প্রয়োগকর্তা সজোরে কপালে করাঘাত আর দুই হাতে চুল ছিঁড়ছেন। শারদীয় সাহিত্যের আয়োজন করতে গিয়ে মঞ্চপ্রয়োগকর্তার মত অবস্থা হয় পত্রিকা-সম্পাদকদেরও। তারই দুটি কৌতুককর কাহিনী আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

সাহিত্যিকদের কাছ থেকে রচনা সংগ্রহের তিন দফা পদ্ধতি আছে। প্রথমে আদালতের পরোয়ানার মত পূজার তিন মাস আগে প্রত্যেক সাহিত্যিকের দরবারে একটি লিখিত পরোয়ানা যায় এই মর্মে—

সবিনয় নিবেদন,

শারদীয়া পত্রিকার উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হইয়াছে। এই কাজে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা সর্বদাই আমরা পাইয়াছি, এবারেও তাহা হইতে বঞ্চিত হইব না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আপনার কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, একটি রচনা পাঠাইয়া শারদীয়া সংখ্যার সমৃদ্ধি বর্ধনে সহায়তা করুন। আশাকরি, আগামী ৭ই আগস্টের মধ্যে আপনার রচনা আমাদের হস্তগত হইবে। আপনার সম্মতিসূচক পত্র পাইলে কৃতজ্ঞ হইব। ইতি।

ডাকে চিঠি ছেড়ে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় দিন দশ কাটবে। কেউ কেউ উত্তর দিলেন, অধিকাংশই নীরব। দশ দিন অপেক্ষার পর শুরু হবে সাহিত্যিকদের আস্তানা পরিক্রমার পালা। এক-একদিন এক-একজনের বাড়ি সকাল বেলা গিয়ে অনুরোধ-উপরোধ তাগাদা এমনকি মান-অভিমানের পালাও হবে। একটা উদাহরণ দিই। বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রর কথাই ধরুন। ভদ্রলোক লেখেন কম, তাই সম্পাদকের বাজারে তাঁর লেখার চাহিদা সর্বাধিক। পূজার মাস-দুই আগে থেকেই প্রতিদিন তাঁর বাড়ির একতলার বৈঠকখানায় দেখবেন এক বিরাট দল বসে আছে। তারা সবাই খ্যাত-অখ্যাত নানা পত্রিকার সম্পাদক। সকলের এক লক্ষ্য, প্রেমেনদার একটা লেখা আদায় করা। মিষ্টভাষী প্রেমেনদা কোন সম্পাদককেই নিরাশ করেন না। কাপের পর কাপ চা খাওয়াচ্ছেন, গল্প করছেন। এমন বিষয় নেই যা নিয়ে তাঁর বৈঠকে আলোচনা হচ্ছে না এবং সরস আলাপে তো তাঁর জুড়ি নেই। কিন্তু পত্রিকার সম্পাদকদের দিনের পর দিন আশা দিয়ে নিরাশ করতেও ওঁর মত দ্বিতীয় কোন সাহিত্যিক আজও আমি দেখি নি। প্রত্যেককেই উনি বলবেন—

'নিশ্চয় লেখা দেব। যদি মুড আসে তাহলে কবিতাই পাবে। তা না হলে গল্প।' এ কথা শোনার পর কোন সম্পাদক না উল্লসিত হবেন। কিন্তু প্রত্যেককেই শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হয়। আর লেখা লিখতে না পারার এমন যুক্তি উপস্থিত করেন যে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে সম্পাদকেরই লজ্জা করবে।

একবার তো আমাকে প্রচণ্ড ধমক খেতে হয়েছিল।

সে ঘটনা বলি। পাশের বাড়ির সঙ্গে প্রেমেনদার জানলা নিয়ে মামলা চলছে। তুমুল মামলা। পুবদিকের জানলাটির সামনে এক দেওয়াল তুলে দেওয়ায় এই গণ্ডগোল। এখন, আদালতে প্রমাণ দিতে হবে জানলা আগে না দেওয়াল আগে। মামলার পরিণতি যখন একটা চরম নাটকীয় মুহূর্তে উঠেছে, অর্থাৎ কে-জেতে কে-হারে অবস্থা, যথারীতি লেখার তাগাদায় আমি সকালে প্রেমেনদার বাড়ি হাজির। যাওয়া মাত্রই প্রেমেনদা বলে উঠলেন—

'তুমি কত বছর ধরে আমার বাড়ি নিয়মিত আসছ?'

এ আবার কী প্রশ্ন? তবু মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, বারো বছর হয়ে গেল পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তাই বললাম—

'তা, বারো বছর ধরে পূজা সংখ্যায় লেখা আদায়ের জন্য আপনার বাড়ি নিত্য আসা-যাওয়া করছি।'

'ভেরি গুড। তাহলে বরাবর তুমি পুবদিকের জানলাটা লক্ষ করে এসেছ?'

'এসেছি। তবে খোলা অবস্থায় দেখি নি কোনদিন!'

সোৎসাহে প্রেমেনদা বললেন, 'যাক নিশ্চিন্ত হলাম। তোমাকে কিন্তু মামলায় সাক্ষি দিতে হবে। আদালতে গিয়ে শুধু বলতে হবে বারো বছর ধরে পুবদিকের জানলাটা ওইখানে ওই অবস্থায় তুমি দেখেছ।'

সাক্ষি দিতে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম। মনে মনে জানি পূজা সংখ্যার লেখা পেতে এবার আর বেগ পেতে হবে না। তাই উৎসাহের সঙ্গে প্রেমেনদাকে যেই-না লেখার কথা বলা আর যাবে কোথায়। চোখ পাকিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন—

'লজ্জা করে না লেখা চাইতে? দেখছ মামলা-মোকদ্দমায় ডুবে আছি। উকিল-বাড়ি আর আদালত-ঘর ছুটোছুটি করে মরছি, তার ওপর আবার লেখা?'

যেন লেখা চাওয়াটা মস্ত অপরাধ।

আরেকদিন সকালে শারদীয়ার লেখা আদায়ের আশায় ওঁর বাড়ি বসে আছি, আমার মতন আরও চার-পাঁচ জন আছেন। এমন সময় বিখ্যাত একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এসেই প্রেমেনদাকে বললেন—

'ছয় বছর ধরে আপনি আমাকে লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরাশ করেছেন। এ-ব ছর আর ছাড়ছি না। লেখা দিতেই হবে।'

উত্তরে প্রেমেনদা বললেন,—'প্রত্যেক বছরই তোমাকে লেখা দেব বলে ভাবি। কিন্তু এবার বোধ হয় ভাবতেও পারব না।'

শারদীয়া পত্রিকার রসদ সংগ্রহের দ্বিতীয় দফা পদ্ধতির উদাহরণ একজন সাহিত্যিককে নিয়েই দিলাম। এরকম ঘটনা অন্যান্যদের নিয়ে যে কত আছে তা আর বলে শেষ করা যাবে না। এর পর হচ্ছে তৃতীয় বা চরম পদ্ধতি। ভোরবেলায় লেখকের বাড়ি গিয়ে অনশন ধর্মঘট করে পড়ে থাকা। কয়েক স্লিপ লেখা না নিয়ে নড়ছি না। কুঁড়ে লেখকদের কাছে এই পদ্ধতিতেই ফল পাওয়া যায়। একবার লেখায় বসাতে পারলেই হল। তৃতীয় পদ্ধতিতে অবশ্য লেখকদের গৃহিণীরা সম্পাদকের প্রধান সহায় হয়ে থাকেন—এ কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এখানে উল্লেখ না করলে অপরাধী হতে হবে। ভোর থেকে একটা লোক কুটোটি মুখে না তুলে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে, তাতে যে গৃহস্থ-বাড়ির অকল্যাণ। তাছাড়া কর্তাকে দিয়ে পূজার সময় লেখানো মানেই—ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই সম্পাদকদের প্রতি সাহিত্যিকের গৃহিণীদের সহানুভূতি চিরকালই থাকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রর কাহিনী তো শুনলেন, এবার শুনুন বাংলা-সাহিত্যের আরেক দিকপাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী, শারদীয়া সংখ্যার রচনা সংগ্রহ উপলক্ষ্যে।

শারদীয়া পত্রিকার জন্য লেখা চেয়ে প্রথম দফা পদ্ধতির চিঠি ছাড়ার সাত দিন পরে তারাশঙ্করবাবুর চিঠি এসে হাজির। তিনি লিখেছেন—

পরমকল্যাণবরেষু

সাগরময়, শারদীয়া সংখ্যায় লেখা দেবার জন্য তোমার আমন্ত্রণলিপি পেলাম। তোমাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল দেখাসাক্ষাৎ নাই। আগামী বুধবার নয়টার মধ্যে যদি আমার বাড়ি আসতে পার তাহলে সাক্ষাতে কথা হবে। আমার এখান থেকেই তুমি অফিসে চলে যেয়ো। তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। ইতি—

চিঠি পেয়েই উত্তরে জানিয়ে দিলাম বুধবার যথাসময়েই আমি তাঁর বাড়ি উপস্থিত হচ্ছি।

আমি থাকি টালিগঞ্জে আর তারাশঙ্করবাবু তখন থাকতেন টালা নয়,

বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জি লেন-এ, অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসের সন্নিকটে। এখন সমস্যা সকাল নটার মধ্যে তাঁর বাড়ি হাজির হতে হলে আমাকে বেরোতে হয় সকাল আটটায়। সুতরাং খেয়ে দেয়ে বেরোনোর প্রশ্নই ওঠে না।

আমার গৃহিণীকে তারাশঙ্করবাবুর চিঠিটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম—

'তোমার কি মনে হয়? না খেয়েই বেরোব?'

গৃহিণী বললেন—'খেয়েদেয়ে বেরোনর মত কোন যুক্তি তো চিঠিতে পাচ্ছিনা। অত সকালে ভাত খেয়ে যাবেই বা কি করে।'

আমি বললাম,—'কেন? এই যে লিখেছেন—আমার এখান থেকেই তুমি অফিসে চলে যেয়ো—এই কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা ধরতে পারছ না?'

অবাক হয়ে গৃহিণী বললেন—'এর মধ্যে আবার ইঙ্গিত তুমি পেলে কোথায়।'

মেয়েরা গল্প-উপন্যাসের একনিষ্ঠ পাঠিকা হতে পারেন কিন্তু তাঁরা যে আভাস-ইঙ্গিত বোঝেন না বা বুঝতে চান না এ ধারণা আমার অনেককালের এবং তা বদ্ধমূল। তাই গৃহিণীকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঠাট্টা করে বললাম—'স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে।' ইংরেজীতে একটা কথা আছে—টু রীড বিটুইন দি লাইনস। সে-ভাবে যদি পড়তে জানতে তাহলে তোমার চোখে ও-দুটি লাইনের মাঝে 'চারটি ডাল-ভাত খেয়ে' কথাটা জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠত।'

গৃহিণী আর কথা বাড়ালেন না। বুদ্ধি নিয়ে ইঙ্গিত করলে তিনি নীরব থাকাই পছন্দ করেন।

বুধবার সকালে তাড়াহুড়ো করে স্নান সেরে বেরোতে যাচ্ছি, গৃহিণী একথালা লুচি আর বেগুনভাজা এনে বললেন—'পেট ভরেই খেয়ে যাও, সাহিত্যিকদের কথায় আমার বেশি ভরসা নেই।'

স্ত্রীবুদ্ধি সম্বন্ধে আরেকবার নিঃসন্দেহ হয়ে গোটা-দুই লুচি মুখে পুরে রওয়ানা হলাম বাগবাজার অভিমুখে।

আনন্দ চ্যাটার্জি লেন-এ তারাশঙ্করবাবুর বাড়িতে যখন উপস্থিত হয়েছি তখন প্রায় নটা বাজে। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দাঁড়ালেন স্বয়ং তারাশঙ্কর-বাবু। অনাবৃত দেহে শ্বেতশুভ্র উপবীত যেন ঘনকৃষ্ণ মেঘের গায়ে বিদ্যুল্লতা। প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—

'তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি, এস, এস, বস।

আমাকে চেয়ারে বসিয়েই ভিতরের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'সনৎ, শীগগির প্লেট নিয়ে আয়, সাগর এসেছে।'

তাহলে ডাল-ভাত নয়, জলযোগের ভূরি আয়োজনই হয়েছে অনুমান করলাম। কিন্তু বসতে না বসতেই খেতে হবে? পূজা সংখ্যার লেখা সম্পর্কে কোন কথাই হল না। অথচ আসা মাত্রই খাওয়া? আর, এ খাওয়ানোর উপলক্ষ্যটাই বা কি। প্লেট-এর বন্দোবস্ত যখন, তখন উপলক্ষ্য একটা কিছু আছেই। সে-ক্ষেত্রে অন্যান্য আমন্ত্রিতরাই বা কোথায়? তারা কি আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেল? গৃহিণীর উপর রাগ হতে লাগল। এসেই যদি খেতে বসতে হবে তাহলে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় লুচি-ই বা গিলতে গেলাম কেন? সাত-সতেরো প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরছে, তারাশঙ্করবাবু তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে বলছেন—

'সনৎ, দেরি করছিস কেন? প্লেট-টা তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। কতক্ষণ সাগরকে বসিয়ে রাখব।'

খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম আমাকে খাওয়াবার জন্যে ওঁর ব্যস্ততা দেখে। মৃদুস্বরে বললাম—

'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। আসুন গল্পগুজব করি। ওটা পরেই হবে। আমার তো তেমন কিছু তাড়া নেই।'

আরও ব্যস্ত হয়ে উনি বলে উঠলেন—

'না না, সে কি করে হয়। যে-জন্যে তোমাকে ডেকে পাঠালাম আগে সেটা সেরে নাও, পরে গল্প করা যাবে।'

কথা শেষ হতে না হতেই তারাশঙ্করবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৌম্যদর্শন সনৎ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে উপস্থিত, হাতে বৃহদাকারের একটা কালো খাম।

খাম দেখে আমি তো উল্লসিত। যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছি। পূজা সংখ্যার গল্প তাহলে লেখা হয়ে গেছে? মধুর বিস্ময়ে আমার দুই বিস্ফারিত চোখ খামের অভ্যন্তরে গল্পের পাণ্ডুলিপি দেখবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। পুত্রের হাত থেকে খামটা নিয়েই তারাশঙ্কর বাবু চলে গেলেন পুবদিকের খোলা জানলাটার কাছে। আমাকে বললেন—

'জানলার কাছে সরে এস, আলো না হলে দেখতে অসুবিধা হবে।'

ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তারাশঙ্করবাবু খামের ভিতর হাত ঢুকিয়ে

ফস্ করে টেনে বার করলেন একটা প্লেট। সেই বিখ্যাত প্লেট যার গল্প বহুবার আমাকে অনেক বৈঠকে বলতে হয়েছে, তা আপনাদের আজ শোনাতে বসেছি।

খামের ভিতর থেকে একটি এক্স-রে প্লেট বার করে তারাশঙ্করবাবু সেটা চোখের উপর সূর্যকে আড়াল করে মেলে ধরলেন। একটি শীর্ণকায় মানুষের নাড়ীভুঁড়ি সমেত জট-পাকানো জঠরের ছবি চোখের উপর ভেসে উঠল। মানচিত্রের উপর ছড়ি বুলিয়ে মাস্টারমশাই যেমন ভূগোল্ পড়ান, প্রায় তেমনি ভাবেই তারাশঙ্করবাবু আঙুল বুলিয়ে আমাকে উদরের ভূগোল শেখাতে লাগলেন। গলার কাছে আঙুল ধরে বলে চললেন—

'কণ্ঠনালী দেখতে পাচ্ছ? এই হচ্ছে কণ্ঠনালী। আমরা যখন আহার করি তখন তা এই কণ্ঠনালী দিয়ে পাকস্থলীতে এইভাবে ঘুরে আসছে। ছবির একেবারে তলায় ওটা হচ্ছে পায়ু। পাকস্থলী থেকে খাদ্যবস্তু এখান দিয়ে নিঃসারিত হয়। স্বাভাবিক লোকের পাকস্থলী থেকে পায়ুদ্বারে খাদ্যবস্তু এসে পৌঁছুতে লাগে ছয় ঘণ্টা, আমার লাগছে চার ঘণ্টা। নিজের চোখেই তো দেখলে আমার শরীরের অবস্থা। এক্স-রে করিয়েছি, চিকিৎসাও চলছে, এখন ডাক্তারের কথাতেই দিন-সাতেকের মধ্যে চেঞ্জে যাচ্ছি দার্জিলিং-এ। এই অবস্থায় পূজা সংখ্যায় এবার তো লিখতে পারব না ভাই। এমনি বললে তো আর বিশ্বাস করতে না, ভাবতে, আমি ফাঁকি দিচ্ছি। তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম।'

জট পাকানো নাড়ী-ভুঁড়ির ছবি দেখে আমার নাড়ী-ভুঁড়ি উল্টোবার অবস্থা। অফিসের জরুরী কাজের অছিলায় তখন বেরোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বিদায় চাইলাম।

বিস্মিত হয়ে তারাশঙ্করবাবু বললেন—'এর মধ্যেই উঠবে কি, এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যাও।'

আমি প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললাম—'না চা আর এখন খেতে পারব না। একটু আগেই বাড়ি থেকে পেট ভরে খেয়েদেয়ে বেরিয়েছি।'

বাগবাজারের মোড়ের লড়ুইয়ে চপের দোকানের সামনে এসে ঢুকব কি না ভাবছি, চোখের উপর ভেসে উঠল সেই এক্স-রে প্লেট। আর কালক্ষেপ না করে বাসেই চেপে বসলাম।

আপনাদের কাছে কবুল করতে লজ্জা নেই, স্ত্রীবুদ্ধি সম্বন্ধে আমার

সেই বহুকালের ধারণাটা সেদিনের ঘটনার পর বাধ্য হয়েই বদলাতে হয়েছে।

॥ ৫ ॥

শনিবারের আড্ডায় কথা উঠল সাহিত্যিকদের খাওয়া নিয়ে। কোন সাহিত্যিক কি রকম খেতে পারেন তারি আলোচনা প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উঠতেই সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন—হ্যাঁ, খেতে পারতেন বটে বিভূতিবাবু।

বিভূতিবাবুর খাওয়া সম্পর্কে যাঁর যা অভিজ্ঞতা একে একে বলে চলেছেন। একজন বললেন—মেদিনীপুরে একবার এক সাহিত্যসভায় বিভূতিবাবু গিয়েছিলেন সভাপতি হয়ে। চার পাঁচজন সাহিত্যিক কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন, আমিও ছিলাম দলে। শনি-রবি দুদিন থেকে সোমবার সকালে আমাদের ফেরবার কথা। খড়গপুর স্টেশনে নেমে সেখান থেকে মোটর গাড়িতে আমরা যাব মেদিনীপুর। দুপুরে যথাসময়ে ট্রেন খড়গপুর পৌঁছতেই কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন। বিভূতিদা আমাদের দলপতি, তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আমরা পিছন পিছন চলেছি। আচ্ছা, আপনারাই বলুন, উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তিনি কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে হাঁটছিলেন ?

আমি বললাম, 'কেন ? সভা সম্পর্কে নিশ্চয়ই। কখন সভা, কী বিষয়ে বলতে হবে ইত্যাদি।'

উহুঁ, হল না। তাঁর প্রথম প্রশ্নই ছিল, দুপুরে আহারের বন্দোবস্ত কোথায় হল, কী কী রান্না হয়েছে। প্রশ্নের উত্তরে জানলাম দুপুরে খড়গপুর স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুম-এ খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের মেদিনীপুরের এক উকিলের বাড়ি অতিথি হতে হবে, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বেলা পাঁচটায় সভাস্থলে যাত্রা।

রিফ্রেশমেন্ট রুম-এ খেতে খেতে খাওয়ার গল্পই চলছে, বক্তা বিভূতিবাবু একাই। মেদিনীপুরের খাওয়ার বৈশিষ্ট্য কী তার এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে

বিভূতিবাবু উদ্যোক্তাদের বললেন—'মেদিনীপুরের কাঁকড়ার ঝোল শুনেছি খেতে খুব ভাল। তা কাল তো রবিবার, কাল দুপুরে কাঁকড়ার ঝোল খাওয়াতে পারেন?'

উদ্যোক্তারা এ-হেন ফরমাইশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তাঁরাও পেছ্-পাও হবার লোক নন। বললেন—'আগে খবর পেলে লোক লাগিয়ে ভাল জাতের কাঁকড়া সংগ্রহ করে রাখতাম। তবু যে-করেই হোক কাল আপনাদের কাঁকড়ার ঝোল খাওয়াবই।'

রাত্রে আহারাদির পর একটা হল-ঘরে আমরা সবাই শুয়েছি। সবে তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় ঘরের এক কোণ থেকে খড়খড় আওয়াজ উঠল। আমি পাশের ভদ্রলোককে ডেকে বললাম—'ও মশায়, শুনছেন? ইঁদুরের উৎপাত বলে মনে হচ্ছে। আমাদের 'মিটিংকা কাপড়া' অর্থাৎ সিল্কের পাঞ্জাবি কেটে তছনছ করে দেবে না তো?'

বিভূতিদা অন্যদিক থেকে পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন—'তোরা বড্ড বকর-বকর করিস। ঘুমোতে দে। কাল আবার ভোরে উঠে তিন-তিনটে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কবর দেখতে যেতে হবে না, যাদের বিপ্লবীরা খুন করেছিল?'

'কিন্তু জামা-কাপড়গুলো স্যুটকেস-এ ভরে রাখলে হত না? ইঁদুরের যে-রকম আওয়াজ পাচ্ছি।'

বিভূতিদা একটু রাগতস্বরেই বললেন—'দেখ, তোরা শহরে থেকে থেকে অমানুষ হয়ে গেছিস। ওটা ইঁদুরের আওয়াজ নয়, কাঁকড়ার।'

'কাঁকড়া?' একসঙ্গে হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসে সবাই বলে উঠল—'বিছে নয় তো?'

বালিশের তলা থেকে টর্চলাইটটা বার করতে করতে বিভূতিদা বললেন—'শহরে থেকে থেকে তোদের আর বুদ্ধিশুদ্ধি হল না। কাঁকড়াবিছের আবার ওরকম খড়খড় আওয়াজ হয় নাকি? ওটা কাঁকড়ার-ঝোলের কাঁকড়া। এই ত্যাখ—'

বিভূতিদা টর্চের আলো ফেললেন ঘরের কোণে রাখা একটা ছালার বস্তার উপর। আলো পড়াতে বস্তার ভিতরে জীবগুলি আরও আওয়াজ করে নড়তে লাগল। বিভূতিদা বাতি নিবিয়ে বললেন—'দেখলি তো? এখন শুয়ে পড়।'

একজন জিজ্ঞেস করলে—‘এক বস্তা কাঁকড়া কেন বিভূতিদা, তাছাড়া, আমাদের শোবার ঘরেই বা এনে কেন রাখল ?’

বিভূতিদা ঘুমজড়িতকণ্ঠে বললেন—‘সারারাত ধরে আমাদের জানান দিতে যে আমাদের জন্যে কাঁকড়া সংগ্রহ হয়েছে। আর এক বস্তা কেন জিজ্ঞেস করছিস ? কাল দুপুরে অর্ধেক রান্না হবে আর বাকি অর্ধেক পরশু ভোরে ফেরবার সময় ট্রেনে তুলে দেবে। কাঁকড়ার ঝোল খেতে চেয়েছিলুম কি-না !’

পরদিন দুপুরে খেতে বসে খাওয়া কাকে বলে বিভূতিবাবু তা দেখিয়ে দিলেন। শুধু দেখানো নয়, দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন। নানারকম ভাজাভুজির পর যখন জামবাটির একবাটি করে কাঁকড়ার ঝোল দিয়ে গেল—শুধু তাকিয়ে দেখলাম বিভূতিদার চোখ-মুখের উল্লসিত ভাব। অন্যসব তরিতরকারি সরিয়ে রেখে কাঁকড়ার ঝোলের বাটিটা টেনে নিয়ে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি। বাটিটা নিঃশেষ করে হুঁশ হল আমাদের দিকে তাকাবার। আমাদের বাটির ঝোল যেমন-কে-তেমনই আছে দেখে বিভূতিদা বিদ্রূপের স্বরে বললেন—‘শহরে থেকে থেকে তোরা ভাল জিনিস আর ভাল রান্নার কদর বুঝলি না। রেস্টুরেণ্টে বসে কতকগুলো ফাউল কটলেট, মটন কটলেট, ব্রেস্ট কটলেট, কবিরাজী কটলেট খেয়ে খেয়ে তোদের রসনার বিকৃতি ঘটেছে। আরে, ওগুলো তো সব ভেজাল, বিষ।’

ততক্ষণে উকিল-গিন্নী বিভূতিদার নিঃশেষিত বাটিটা আবার কাঁকড়ার ঝোলে ভরে দিলেন। বিভূতিদার দিক থেকে আপত্তির কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

আমরা আমাদের খাওয়া শেষ করে হাত গুটিয়ে বসে আছি। বিভূতিদার খাওয়া শেষ না হলে আসন ছেড়ে উঠতে পারছি না এবং বেশ বুঝতে পারছি আরও আধ ঘণ্টার আগে ওঠা সম্ভবও হবে না। বিভূতিদা বাটি থেকে একটি একটি করে কাঁকড়া তুলছেন, তার দাঁড়াটা ভেঙ্গে নিয়ে প্রথমে বেশ খানিকক্ষণ চুষিকাঠির মতন চুষে দাঁত দিয়ে কুটুস্ করে কামড়ে দাঁড়াটা ভেঙ্গে নিয়ে তার ভিতরের মাংস কুরে কুরে খেতে লাগলেন।

কী পরিষ্কার পরিপাটি খাওয়া ! রসিয়ে খাওয়াও যে একটা আর্ট তা বুঝলাম সেদিন বিভূতিদার খাওয়া দেখে।

দ্বিতীয় বাটি শেষ করার পর গৃহকর্ত্রী যখন তৃতীয়বার কাঁকড়ার ঝোলে

বাটি ভরতি করবার জন্য এগিয়ে এলেন—বিভূতিদা তখন একটা কাঁকড়ার আস্ত খোল মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে মৃদুস্বরে বললেন—'আমায় আর কেন।' অগত্যা আবার বাটি ভরতি হল, বিভূতিদা নিশ্চিন্ত মনে কাঁকড়া চিবোতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়েই আমরা তখন উঠবার অনুমতি চাইলাম। ততক্ষণে কাঁকড়ার ঝোল আমাদের হাতের চেটো আর আঙ্গুলে শুকিয়ে আঠার মত এঁটে গেছে। বিভূতিদা একটু সলজ্জ হেসে অনুমতি দিলেন। বললেন—'তোরা ওঠ। আমার একটু দেরিই হবে। ভাল জিনিস রেখে-চেখে না খেলে আমি তৃপ্তি পাইনে।'

এই পর্যন্ত বলেই সেদিনের আড্ডার গাল্পিক বন্ধুটি থামলেন। শুধু বললেন—'পরের ঘটনা আর না-ই বললাম, অনুমান করে নিন।'

অনুমান আমরা সবাই ঠিকই করে নিলাম। তবু প্রশ্ন উঠল আধ বস্তা না হয় রান্না হয়েছিল। বাকি আধবস্তা কাঁকড়া কি সত্যি সত্যিই ট্রেনে তুলে দিয়েছিল ?

বন্ধুটি বললেন—'তা বলতে পারব না মশাই। আমরা তো পরদিন ভোরের গাড়িতেই কলকাতা চলে এলাম। ডাক্তারের নির্দেশে বিভূতিদা থেকে গেলেন। বাকি অর্ধেক কাঁকড়ার খবর বলতে পারব না।'

আড্ডার আরেক কোণ থেকে একজন প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা এই ঘটনার পরে বিভূতিদার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কি ?'

'হয়েছিল মাস দুই পরে কলেজ স্ট্রীটে।' মেদিনীপুরের প্রসঙ্গ নিজে থেকেই তুলে বললেন—'তিনদিন বিছানা থেকে উঠতে পারি নি। অবশ্য ওদের দোষ নেই। অসময়ে পুকুরের জাত কাঁকড়া যোগাড় করতে না পেরে ধান ক্ষেতের কাঁকড়া ধরে এনেছিল। তা ছাড়া রান্নাটা বড়ই উপাদেয় হয়েছিল রে, তাই লোভে পড়ে মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছিলাম।'

বিভূতিদাকে নিয়েই আমাদের সেদিনকার বৈঠক সরগরম। মেদেনীপুরের কাহিনী শেষ হতেই কে একজন বলে উঠল—'বিভূতিদার মেয়ে দেখে বেড়ানোর গল্পটা শুনেছেন ?

গল্প পেলেই বৈঠক যেন টগবগিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ফরমাশ চা-চাই। এর আগে তিন রাউণ্ড চা হয়ে গেছে তবুও তৃপ্তি নেই। আমার ঘরের বেয়ারা অমর এক কোনায় তার ছোট টেবিলটায় বসে কতকগুলি চিঠি ফাইল করতে ব্যস্ত। দেখতে ছেলেমানুষ, বুদ্ধিতে সেয়ানা। কাজের ভান করে

কান দুটো সর্বদা খাড়া রাখে বৈঠকের গল্পের উপর। চায়ের কথা বলতেই অমর বললে—'আধ মাইল দূরে চায়ের দোকান। যেতে-আসতে আধঘণ্টা কাবার। তার চেয়ে আমাকে একটা হিটার কিনে দিন আর কয়েকটা পেয়ালা পিরিচ। আমি ঘরে বসে আপনাদের গরম চা করে খাওয়াব। খরচ খাতায় লেখা থাকবে, মাস কাবারে যার ভাগে যা পড়ে হিসেব করে দিয়ে দেবেন।'

প্রস্তাবটা সবার ভালই লাগল, সবাই একবাক্যে রাজী। আমি দেখছি ছোকরা ফন্দিটা এঁটেছে ভাল। ব্যবসা-কে ব্যবসা, মনিবেরও পয়সা বাঁচানো হল। তার চেয়ে বড় কারণ চায়ের জন্য বলতে গিয়ে গল্প থেকে বাদ পড়ে যাওয়া—সেটি আর হচ্ছে না।

অগত্যা চা না আসা পর্যন্ত বিভূতিদাকে আর বৈঠকে আনা গেল না।

চতুর্থ কিস্তির চায়ের কাপে চুমুক মেরে বৈঠকের সেই বন্ধুটি বললেন—'বিভূতিদা ঠিক করলেন তাঁর ছোট ভাইয়ের জন্যে একটি পাত্রীর সন্ধান করবেন। বাংলাদেশের প্রত্যেক জিলার শহরে গ্রামে পরিচিত ব্যক্তির কাছে চিঠি চলে গেল। শর্ত শুধু এই, পাত্রীর স্বহস্তে রন্ধন। এবং যে দেশের পাত্রী, সে দেশের রান্নার বৈশিষ্ট্যটুকু দেখানোই নির্বাচন-পরীক্ষার একমাত্র মাপকাঠি।

বিভূতিদার ধারণা, ভাল রাঁধুনি না হলে ভাল গৃহিণী হওয়া যায় না।

দিনক্ষণ দেখে বিভূতিদা এক জেলা থেকে আর এক জেলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন পাত্রী সন্ধানে। বিভূতিদা ভাল করেই জানতেন যে, পাত্রী সু-রাঁধুনি হোক চাই না হোক, পাত্রীর মা-দিদিমা ঠাকুরমারা তাঁদের পাত্রীকে পার করবার জন্য রাঁধুনি-জীবনের অভিজ্ঞতার যাবতীয় এলেম দিয়ে শুক্ত-চচ্চড়ি-ঘণ্ট ইত্যাদি রান্না করে পাত্রীর নামেই চালাবেন।

প্রায় মাস-দুই কাল সারা বাংলা দেশ ঘুরে প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে বিভূতিদা ফিরলেন। আপনাদের মনে আছে কি না জানি না, সেই বছরের পুজোর সময়ে বিভিন্ন শারদীয়া সংখ্যায় কয়েকটি গল্প বেরিয়েছিল এই পাত্রী দেখা-নিয়ে, আর কি অসাধারণ সে গল্প। বাঙ্গালী মায়ের অন্তরের বেদনার কী সহজ সরল প্রকাশ।'

এইটুকু বলেই বৈঠকী বন্ধুটি সিগারেট ধরালেন। সকলেরই মন ভারাক্রান্ত। সংসারে এক-একজন মানুষ থাকে যাদের বাইরের চালচলন দেখে হাসি পায় বটে, কিন্তু তাদের ভিতরে লুকিয়ে থাকে শিশুর মত সরল ও আপন ভোলা একটি মানুষ যার সংবেদনশীল হৃদয় সংসারের শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণার উর্ধ্বে থেকে

গভীর প্রশান্তির মধ্যে বিরাজ করে। এমন একটি খাঁটি জীবন-শিল্পী আজ আমাদের মধ্যে নেই, সে-দুঃখেই মন ভারাক্রান্ত। কিন্তু বৈঠকের সেই কৃশতনু সাহিত্যিক, ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে গুমোট আবহাওয়াকে তরল করতে যাঁর জুড়ি মেলে না, তিনি বলে উঠলেন—

'আসল কথা কি জানেন? বিভূতিবাবু সত্যিই খেতে ভালবাসতেন। ওঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল খেয়ে দেখা, মেয়ে দেখা ছিল উপলক্ষ্য।'

আমাদের বৈঠকের এক অরসিক বন্ধু বললেন—'আজ যদি বিভূতিবাবু বেঁচে থাকতেন এবং গল্প-উপন্যাস না লিখে একখানা প্রমাণ সাইজের গবেষণামূলক বই লিখে তার নাম দিতেন 'বাংলার রান্না ও রাঁধুনী' বা 'পশ্চিমবঙ্গ রন্ধন সংস্কৃতি' তাহলে আকাদমী না পেলেও রবীন্দ্র পুরস্কারটা মারে কে।'

৬ ॥

সাহিত্যিকদের মধ্যে কে কেমন খেতে পারেন সেই আলোচনা-প্রসঙ্গেই কথা উঠল নিশিকান্তর, আমাদের পণ্ডিচেরীর নিশিকান্ত, যার কবিখ্যাতি কারোর অবিদিত নেই। বৈঠকের বন্ধুরা সবাই আমাকে চেপে ধরলেন ভোজন-রসিক নিশিকান্তর গল্প বলতেই হবে, বিশেষ করে তার খাবার গল্প।

বৈঠকের গাল্পিক বন্ধু বললেন—'এই কবি নিশিকান্তই না আপনাকে নেংটি ইঁদুরের মাংস রান্না করে খাওয়াতে গিয়েছিল? সেই ঘটনাটাই আমাদের বলুন!'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম—ইঁদুরের মাংস খাওয়াটা এমন কিছু একটা বাহাদুরির গল্প নয় যা সবাইকে জাঁক করে বলা চলে। কৈশোর জীবনে কতরকম ঝোঁকই না ঘাড়ে চাপে আর কত কুকীর্তিই না করা হয়। সবই কি আর বলা যায়? তবে এটুকু বলতে পারি—ইঁদুরের মাংস সে-শুধু আমাকে একাই খাওয়াবার চেষ্টা করে নি। সঙ্গে আরও দুজন ছিল। টুনাং নামে ছিল একজন বর্মী ছেলে, শান্তিনিকেতন ইস্কুলে সে-ছিল আমার সহপাঠী। দুর্দান্ত ডানপিটে। আর ছিল আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন-এর পুত্র শ্রীক্ষেমেন্দ্র-মোহন সেন—যাকে শান্তিনিকেতনের সবাই কঙ্কর নামে চেনে।

কঙ্করদা বয়সে ছিলেন আমাদের চেয়ে তিন চার বছরের বড়, বুদ্ধিতেও তুখোড়। আমরা, পাড়ার ছেলেরা একবাক্যে তাঁকে দলপতি মেনে নিয়েছিলাম।

আমাদের পাড়াটা ছিল শান্তিনিকেতনের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে। মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনি দেওয়া এক সারিতে আট-দশ ঘর। পাড়ার নাম 'গুরুপল্লী'। বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষকরা সপরিবারে এই পল্লীতে থাকতেন। এই পল্লীর প্রতিবাসীদের মধ্যে ছিল আত্মীয়তার নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক। পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠরা ছিলেন দাদা ও দিদির মত, কনিষ্ঠেরা ছিল ছোট ভাইবোন। এই সম্পর্কের মধ্যে কখনও আপন-পর ভেদ ছিল না।

কঙ্করদা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার অনেক কিছুই পেয়েছেন। পাণ্ডিত্যের কথা অবশ্য আমি বলতে পারব না, তবে পৈত্রিক বিশেষ যে গুণটি তিনি পেয়েছেন তা হচ্ছে তাঁর অপূর্ব রসিকতা।

একবার শান্তিনিকেতনের এক পারসী অধ্যাপক মিস্টার মরিস কঙ্করদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

'তোমার বাবা সংস্কৃতে বিরাট পণ্ডিত, কিন্তু তোমার নাম কঙ্কর রাখলেন কেন ?'

কঙ্করদা তৎক্ষণাৎ বললেন—'কেন ? এও তো সংস্কৃত শব্দ। কং করোতি যঃ সঃ ইতি কঙ্করঃ।'

মরিস সাহেব অবাক হয়ে বললেন—

'তোমার নামের এমন একটা সংস্কৃত অর্থ আছে তা তো জানতাম না। কিন্তু 'কং' কথার মানেটা কি !

'কং অর্থাৎ রসিকতা। এটা পালি শব্দ, হীনযান বা মহাযান-এ পাবেন না, চীনযান-এ আছে।' এই বলেই কঙ্করদা মরিস সাহেবের সামনে থেকে দে-চম্পট, পাছে আবার চীনযানটা কী জিজ্ঞাসা করে বসেন।

কঙ্করদার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে একবার আমরা বাঘের মুখ থেকে বেঁচে এসেছি। সে-ঘটনা বলি : শান্তিনিকেতনের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে আম-কাঁঠাল লিচু-পেয়ারা ও নানাবিধ দেশী ফল ও ফুলের বাগান পরিবৃত একটি বাড়ির পূর্ব অংশে থাকতেন রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ওই বাড়িরই পশ্চিম অংশে থাকতেন দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথ। বাড়িটার নাম নীচুবাংলা। দ্বীপেন্দ্রনাথকে আশ্রমবাসী সকলেই দীপুবাবু বলে ডাকতেন।

তাঁর উপর তখন ছিল আশ্রমপরিচালনার ভার। রাসভারী মানুষ, কিন্তু তাঁর অন্তরটি ছিল সমুদ্রের মতই বিরাট।

বর্ষাকালের এক দুপুরে কঙ্করদা এসে খবর দিলেন, নীচুবাংলার বাগানে প্রচুর পেয়ারা হয়েছে। কঙ্করদা এমনিভাবে প্রায়ই আমাদের বুদ্ধি যোগান, আমরা তাঁর অনুরক্ত সেনানী, সর্বদাই আদেশ পালনের জন্য পা বাড়িয়েই আছি।

ঠিক হল দুপুরে সবাই যখন দিবানিদ্রায় মগ্ন সেই সময় পেয়ারা পাড়তে হবে। কঙ্করদা বললেন—'না রে, দীপুবাবু আজকাল পাহারা দেবার জন্য গাছতলায় লোক বসিয়ে রাখেন। তার চেয়ে শেষরাত্রে টর্চের আলো নিয়ে পেয়ারা পাড়াই সমীচীন।'

নিশিকান্ত বললে—'রাত্রে শুনেছি একটা নেপালী দরোয়ান বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয়, ওতে আমি নেই।'

ডানপিটে বর্মী টুনাং বললে—'কুছ পরোয়া নেই। দুপুরেই পেয়ারা পাড়ব। আমাকে কেউ ধরতে পারবে না। তোমরা শুধু দূর থেকে নজর রেখো পাহারাদার লোকটা কোনদিকে থাকে। বিপদ বুঝলেই ইশারা করবে, আমি গাছ থেকে এক লাফে নেমে ছুট লাগাব।'

স্থির হল কঙ্করদা দূর থেকে ইশারা করবেন, টুনাং গাছে চড়বে, আমি তলায় দাঁড়িয়ে পেয়ারা কুড়ব।

পরিকল্পনা যখন প্রস্তুত তৎক্ষণাৎ তা কাজে পরিণত করা চাই। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা নীচুবাংলার বাগানে ঢুকেছি। টুনাং চক্ষের নিমেষে মগডালে উঠে জল-ভেজা পেয়ারা ধপাধপ ফেলছে আর আমি তা কুড়তে ব্যস্ত।

হঠাৎ ভারিক্কী গলার বাজখাঁই আওয়াজ উঠল—

বয়, ছোঁড়াগুলোকে ধরে আন তো।'

'বয়' ছিল দীপুবাবুর চব্বিশ ঘণ্টার অনুরক্ত ভৃত্য। ভৃত্য বললে তাকে ছোট করা হয়। সে-ছিল দীপুবাবুর ফ্রেণ্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড। বালক বয়সেই সে দীপুবাবুর ভৃত্যরাজতন্ত্রে উজির-নাজির হয়ে ঢুকেছিল, যৌবনে সে হয়েছিল একচ্ছত্র সম্রাট। বালক বয়সে 'বয়' নামেই সে সকলের পরিচিত, তার পৈত্রিক নাম শান্তিনিকেতনিকরা কেউ কখনও জানতেন না।

চক্ষের নিমেষে টুনাং টার্জনের মত এক ডাল থেকে আরেক ডালে ঝুলতে ঝুলতে লাফ মেরে মাটিতে পড়েই টেনে দৌড়। আমি তখনও পেয়ারা পকেটস্থ

করতে ব্যস্ত, কখন যে মালী আর চাকর মিলে জন-চারেক লোক এসে ঘিরে ফেলেছে টেরই পাই নি। বমাল ধরা পড়লাম! তাকিয়ে দেখি কঙ্করদা আমার আগেই ধরা পড়েছেন, টুনাং ততক্ষণে পগার পার। আমাদের দুজনকে হাজির করা হল দীপুবাবুর সামনে। দীপুবাবুকে আমরা বাঘের মত ভয় করতাম। আর পড়বি তো পড় সেই বাঘের মুখেই। দীপুবাবুর দুই প্রিয়পাত্রের আমরা দুই পুত্র। বয়ঃজ্যেষ্ঠ কঙ্করদা, সুতরাং তাঁকেই উদ্দেশ করে দীপুবাবু মেঘমন্দ্রস্বরে বললেন—

'পেয়ারা পাড়ার অনুমতি নিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে না।'

'কটা পেয়ারা পেরেছ?'

সঙ্গে সঙ্গে হাফ প্যান্ট আর জামার পকেটে যে-কটা পেয়ারা ছিল বার করে সামনে রাখলাম।

দীপুবাবু পেয়ারাগুলোর দিকে তাকিয়ে একটু বেদনাহত কণ্ঠে বললেন— 'ঈস্, এই সব কচি-কচি পেয়ারাগুলো পেড়ে নষ্ট করলে? বড় হলে তো তোমরাই খেতে, আর দু-চারটে দিন অপেক্ষা করতে পারলে না?'

এইটুকু বলেই কঙ্করদার দিকে তাকিয়ে বললেন—

'আচ্ছা কঙ্কর, তুমিই বল। আমি যদি তোমার বাগানে গিয়ে এইভাবে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে কচি পেয়ারা পেড়ে তছনছ করতাম, তোমার মনে কি দুঃখ হত না?'

কঙ্করদা সঙ্গে সঙ্গে মুখে একটা অমায়িক হাসি এনে হাত কচলাতে কচলাতে সলজ্জ স্বরে বললেন—

'আজ্ঞে আপনি আমার বাগানে পেয়ারা পাড়তে যাবেন সে-সৌভাগ্য কি আমার কোন দিন হবে?'

এই কথা শোনার পর দীপুবাবু আর কপট গাম্ভীর্য ধরে রাখতে পারলেন না। সহাস্যে বললেন—'বাপের উপযুক্ত পুত্রই বটে। বয়, ছোঁড়া দুটোকে কিছু লেবেঞ্চুস দিয়ে দে।'

কঙ্করদার উপস্থিত 'কং' অর্থাৎ রসিকতার গুণে সেদিন শাস্তির বদলে লজেন্স নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আর পালিয়েছিল বলে টুনাং-এর তখন কী দুঃখ।

আগেই বলেছি, কঙ্করদা ছিলেন নানারকম বুদ্ধি বাতলানোর বাদশা আর আমরা ছিলাম তাঁর হুকুমবরদার। কঙ্করদা স্থির করলেন গুরুপত্নীর জন্য একটা

সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হবে এবং তার নাম হবে 'গুরুপল্লী সমাচার'। কঙ্করদার মুখ দিয়ে একটা কিছু নতুন প্ল্যান বেরলেই হয়, আমি ছিলাম এ-সব ব্যাপারে ঝড়ের আগে এঁটো পাতা।

দৈনিক সংবাদপত্রের আকারের একটা পেস্ট-বোর্ড সংগ্রহ করে ফেললাম, কিছু ফুলস্ক্যাপ সাদা কাগজও। ময়দা জ্বাল দিয়ে লেই তৈরী করতে দেরি হল না। কঙ্করদা ছিলেন পত্রিকার একাধারে সম্পাদক, বার্তাসম্পাদক, রিপোর্টার, নিজস্ব সংবাদদাতা ইত্যাদি। আমার হাতের লেখা কিছুটা রাবীন্দ্রিক ধাঁচের ছিল বলে আমি ছিলাম তার মুদ্রাকর। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর লণ্ঠন জ্বেলে আমরা দুজনে 'গুরুপল্লী সমাচার' প্রস্তুত করতাম এবং ভোরবেলা কাক-কোকিল ডাকবার আগেই গুরুপল্লীর সামনের একক বাঁশঝাড়টার গায়ে তা লটকে দিয়ে আসতাম। সকাল হলে ইস্কুলে যাবার আগে বাড়ির ছোট্ট ঘরের জানলার পাল্লাটা একটু ফাঁক করে দেখতাম সংবাদপত্রের প্রচার কতখানি হল অর্থাৎ পাঠক সংখ্যা কতজন। দুঃখের বিষয় আমাদের সমবয়সী দু-চার জন পাঠক ছাড়া বিদগ্ধ পাঠকদের সে-পত্রিকা আকর্ষণ করতে পারে নি। তা না করুক। আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রেখেছিলাম।

বুধবার ছিল আমাদের ছুটি। সেদিনের সমাচারে থাকত গুরুপল্লীর বিভিন্ন মাস্টারমশাইদের নিয়ে টিপ্পনী। এক বুধবারের কাগজে সংবাদ পরিবেশিত হল :

গুরুপল্লীতে গরু বিভ্রাট

দুই গুরুর মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামার উপক্রম

[নিজস্ব সংবাদদাতা প্রদত্ত]

সংবাদে প্রকাশ গুরুতর কোন এক মাস্টারমশাইয়ের গৃহপালিত গরু পার্শ্ববর্তী মাস্টারমশাইয়ের রান্নাঘর সন্নিকটস্থ তরকারির ক্ষেতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া কচি ঢ্যাড়শ খাইয়া তছনছ করিয়াছে। ক্ষেতের মালিক প্রতিবাদ জানাইলে তুমুল বাদবিতণ্ডা শুরু হয়। বিষয়টি উচ্চ আদালতে (গুরুদেবের সন্নিকটে) উপস্থাপিত হইবার পূর্বেই অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট রায় সাহেব জগদানন্দ রায়ের মধ্যস্থতায় আপসে মিটমাট হইয়া যায়। এরূপ শোনা যাইতেছে যে, গরুর মালিক সবজিক্ষেতের মালিকের নিকট গরুর অন্যায় অপকার্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

পাড়ার কোন এক বকাটে ছেলে শিরোনামা থেকে সংবাদের সর্বত্র 'গু' স্থানে 'গ' ও 'গ' স্থানে 'গু' লিখে রেখেছিল।

'গুরুপল্লী সমাচারে' এই ধরনের সংবাদ প্রায়ই প্রকাশিত হত, প্রায়ই তার উপর ফাজিল ছেলের দল নানাবিধ মন্তব্য লিখে রাখত। সংশ্লিষ্ট মাস্টার-মশাইদের মধ্যে কেউ কেউ এতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকরের নাম ও পরিচয় গোপন থাকায় নীরবে টিপ্পনী হজম করতেন, প্রকাশ্যে কিছু বলতেন না।

নিশিকান্ত ছিল আমাদের পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই সে ব্যঙ্গ কবিতা লিখত, আমরা প্রাধান্য দিয়েই তা প্রকাশ করতাম। নিশিকান্ত একবার গ্রাম্য কবিয়ালদের ছড়ার অনুকরণে 'গুরুপল্লীনামা' শীর্ষক একটি ছড়া লিখেছিল। সেই ছড়া সমাচারে প্রকাশিত হবার পর পত্রিকার পাঠকসংখ্যা বেড়ে গেল। পরবর্তী কালে নিশিকান্তর সেই 'গুরুপল্লীনামা' কিছু পরিবর্তিত আকারে কবিগানের সুর সংযোগে শান্তিনিকেতন আশ্রমের বহু আসরে গীত হয়েছে।

তিন মাস ধরে প্রতিদিন 'গুরুপল্লী সমাচার' পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে একটা সামান্য কারণেই পত্রিকার অকাল-মৃত্যু ঘটল। সেদিন ছিল বুধবার। এখনকার বাংলা দেশের সেরা পত্রিকাগুলির ছুটির দিনের খোরাক যোগাবার জন্যে রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। সমাচারের ছিল বুধবাসরীয় ক্রোড়পত্র, তাতে থাকত গুরুপল্লীর বালখিল্যদের নানাবিধ রচনা : গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী। মঙ্গলবার সারারাত আমার কেটে গেল পত্রিকা ছাপাতে— অর্থাৎ লেখাগুলি শ্রীঅক্ষরে কপি করতে। ভোরে যথারীতি বাঁশঝাড়ে লটকে দিয়েই বাড়ি এসে টেনে এক ঘুম।

বেলা দশটা নাগাদ কঙ্করদা হন্তদন্ত হয়ে এসে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বললেন—

'এই শিগগির ওঠ। এক কাণ্ড হয়েছে। গোঁসাইজী আমাদের পত্রিকার উপর কী সব মন্তব্য লিখেছেন।'

ধড়ফড়িয়ে বিছানা ছেড়েই ছুটলাম বাঁশঝাড়ের দিকে। গোঁসাইজী মন্তব্য লিখেছেন? গোঁসাইজী আমাদের পাড়ারই বাসিন্দা। আমরা ইস্কুলে তাঁর কাছে বাংলা পড়তাম, পরবর্তী জীবনে কলেজে উঠে পড়েছি বৈষ্ণব সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সেদিনও আমাদের শ্রদ্ধা

ছিল, আজও আছে। গোঁসাইজী মন্তব্য লিখেছেন, আর আমাদের পায় কে!

বাঁশঝাড়ে গিয়ে দেখি গুরুপল্লী সমাচার লাল পেন্সিলের দাগে ক্ষতবিক্ষত। বত্রিশটা ভুল বানান আর পনেরটা শব্দের অপপ্রয়োগের উপর লাল পেন্সিলের ঢ্যাঁড়া মেরে পত্রিকার এক-কোনায় মন্তব্য লেখা আছে—

'মুদ্রাদোষে পত্রিকাটি কণ্টকাকীর্ণ। যে-বালক ইহা নকল করিয়াছে তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বাংলা পরীক্ষায় তাহার উত্তীর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না।' মন্তব্যের নিচে স্পষ্টাক্ষরে স্বাক্ষর আছে শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী।

পত্রিকা প্রকাশের উৎসাহটা গোঁসাইজী সেদিন এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিলেন। আজ চালশেধরা চল্লিশের পরপ্রান্তে এসে দেখছি আমার জীবনে গুরুর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। শুধু বাংলা পরীক্ষায় কেন, জীবনের সব পরীক্ষায় ফেল মেরে অবশেষে আজ যেখানে এসে পৌঁছেছি, সেখানে চারিদিকে এত আলো তবু আমি অন্ধকারে। লেখক আর হতে পারলাম না, যদিও লেখা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করা আজ আমার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। বালক বয়সে যা-ছিল আমাদের নেশা, ভাগ্যচক্রের আবর্তনে আজ তা পেশায় পরিণত হয়েছে। কঙ্করদা আজ ইংরেজী দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতম কর্মী আর আমি আজ বিশ বছর যাবৎ একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর গুরুবাক্যের অমোঘ সত্য প্রতি সপ্তাহে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছি।

॥ ৭ ॥

আমাদের বৈঠকের গাল্পিক কথা-সাহিত্যিক বললেন—'আপনার গল্পে কবি নিশিকান্তকে একবার ছুঁইয়েই ছেড়ে দিলেন। সেই ইঁদুরের মাংস খাওয়ার ঘটনাটা? সেটা তো ধামা চাপা পড়ে গেল।'

আড্ডার সেই ক্ষীণকায় সব্যসাচী লেখক টিপ্পনী কেটে বললেন—'ধান

ভানতে শিবের গাজন। কোথায় পড়ে রইল নিশিকান্তর খাওয়ার গল্প, নিজের কথাই সাত কাহন।'

হক-কথা। স্মৃতি মন্থন করে যাঁরাই গল্প বলেন তাঁদের প্রধান দোষ বা মুদ্রা দোষই বলুন, অপরের কথা বলতে গিয়ে নিজের কথাকে সামনে তুলে ধরা। তবু আমি চেষ্টা করেছিলাম শৈশবে যে-পরিবেশে আমরা মানুষ হয়েছিলাম, এবং যে-পরিবেশে নিশিকান্তর সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত, সেই পরিবেশটি শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরতে।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কালে কোনও চরিত্রকে দর্শকদের সামনে ফুটিয়ে তুলতে হলে পটভূমিকার পরিবেশ সৃষ্টি করে তার উপর আলো নিক্ষেপ করতে হয়। আমারও ছিল সেই একই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমার কাজ ছিল নিশিকান্তর উপর আলো নিক্ষেপ করা। কিন্তু অনবধানতাবশত নিজেই যে কখন সেই আলোর সামনে এসে গেছি তা টের পাই নি। সবিনয়ে বন্ধুদের কাছে মার্জনা চেয়ে বললাম—'নিশিকান্তর কথা বলতে গেলে খানিকটা নিজের কথাই এসে পড়বে—আমি নিরুপায়। ছেলেবেলা থেকেই নিশিকান্তর সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব। তার কবি-প্রতিভার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা শৈশবকাল থেকেই। শান্তিনিকেতন আশ্রম ছেড়ে পণ্ডিচেরীর আশ্রমের আশ্রয়ে তার চলে যাওয়ার পিছনে যে বিরাট ট্র্যাজেডী ছিল তা আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তির জানবার কথা নয়।'

গাল্পিক বন্ধু আমার কথাটা থামিয়ে দিয়ে বললেন—'আপনার কাছে আমরা ভোজনরসিক নিশিকান্তর গল্প শুনতে চাই, কবি নিশিকান্তর নয়।'

আড্ডার তরুণ কবি বললেন—'তা কেন। কবি নিশিকান্তর শান্তিনিকেতন ছেড়ে পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার রহস্যটাই আমাদের জানবার আগ্রহ বেশী। আপনি সেটাই বলুন।'

দুই বন্ধুকেই থামিয়ে বললাম—'দুজনের কথাই রাখতে চেষ্টা করব।' ভোজনরসিক ও কাব্যরসিক—নিশিকান্ত চরিত্রের এই দুই রূপ আপাতবিরোধী মনে হলেও একটি আরেকটির পরিপূরক। নিশিকান্ত যখন আহারে বসে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তার কাছে বিলীন হয়ে যায়। ওর মত একাগ্রচিত্তে তদ্গত-ভাবে আহার্য-বস্তুকে উপভোগ করতে আমি আর কাউকে দেখি নি। আবার যখন কবিতা রচনায় সে বসে তখনও দেখেছি তার সেই একই রূপ। স্নানাহার ভুলে কাব্যরসে এমন তন্ময় হয়ে ডুবে যাওয়া এক নিশিকান্তকেই আমি দেখেছি।

কবিতার ছন্দ, আঙ্গিক, শব্দচয়ন ও বিষয়বস্তু নিয়ে নিশিকান্ত নিত্যনিয়ত যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত তেমনি চলত তার রান্না নিয়ে নানারকমের এক্সপেরিমেণ্ট। নিশিকান্ত ছিল ঘোরতর মাংসাসী।

শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাঁওতালদের প্রায়ই দেখা যেত শীতকালে ধানকাটা হয়ে যাবার পর ধানক্ষেতে ছেলে বুড়ো সবার ইঁদুর ধরার উল্লাস। পাঁচদশটা ইঁদুর যদি ধরতে পারল তো পরব লেগে গেল। সন্ধ্যায় হাঁড়িয়ার সঙ্গে ইঁদুরের মাংস, তারপরে মাদল বাজিয়ে নাচ। বর্ষাকালে ছিল তাদের ধানক্ষেতের ব্যাঙ-গেলা ঢোঁড়াসাপ ধরবার পালা। ৪।৫ হাত লম্বা একটা সাপ ধরতে পারলে সেদিন পরব চলবে সারারাত আর হাঁড়িয়া চলবে কলসী কলসী।

এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই নিশিকান্তর থিয়োরী ছিল যে, সাঁওতালরাও মানুষ, আমরাও মানুষ। ওরা যা খেতে পারে আমরা তা পারব না কেন? সুতরাং পরীক্ষাটা ইঁদুরের মাংস দিয়েই প্রথম শুরু হয়ে যাক। খাওয়ার ব্যাপারে নিশিকান্তর কোনও বাছ-বিচার ছিল না। এ-বিষয়ে ও ছিল সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। আর তা হবে না-ই বা কেন। ওর দাদা সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ছিলেন আরও এক কাঠি সরেস। সুধাকান্তদার কাহিনী শুনলে খাবার ব্যাপারে নিশিকান্তর বেপরোয়াপনা বুঝতে অসুবিধা হবে না।

শান্তিনিকেতন থেকে মাইল চারেক দূরে তালতোড় বলে এক জায়গায় একবার বাঘের উৎপাত দেখা দিল। গ্রামবাসীদের গরু-ছাগল প্রায়ই মারা পড়ছে এ-খবর আমরা রোজই পাচ্ছিলাম। একদিন বাঘের কামড়ে জখম-হওয়া এক সাঁওতালকে শান্তিনিকেতনের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এনে হাজির করল। সাঁওতালটির অবস্থা দেখে উঁচুক্লাসের ছাত্ররা স্থির করল বাঘ মারতেই হবে। নেপালবাসী নরভূপ ছিল আশ্রমের আত্মবিভাগের ছাত্রদের দলপতি, যেমন বিশাল তার চেহারা তেমনি বলশালী। তালতোড়ের এক পুকুর ধারে বাঘ গরু মেরে ফেলে গেছে, এই খবর পেয়ে নরভূপ কোমরে নেপালী কুকরি আর সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ঘেয়ো কুকুর-মারার দোনলা বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে চলল বাঘ মারতে। সঙ্গে ছিল তার সমবয়সী দুঃসাহসী আটদশজন সতীর্থ। তাদের হাতে লাঠি, হকিস্টিক, বাঁশ ইত্যাদি। মাস্টার মশাইদের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই দুপুরবেলা

চলে গেল পশ্চিম প্রান্তের প্রান্তর পেরিয়ে তালতোড়ার দিকে, আমরা দূর থেকে তাদের চলে যাওয়াটাই দেখলাম। আশ্রমময় সে কী উৎকণ্ঠা।

সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে হঠাৎ দেখা গেল মেঠো রাস্তার ধুলো উড়িয়ে বিরাট দল আশ্রমের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে এক ছপ্পর হীন গরুর গাড়ি, তার উপর পাশ ফিরে শুয়ে আছে সেই বাঘ।

আশ্রমসুদ্ধ সবাই ভেঙ্গে পড়ল বাঘ দেখবার জন্যে। হাসপাতালের সামনে গরুর গাড়ি থেকে মৃত বাঘকে নামান হল, দেখা গেল বাঘের গলাটা ভোজালী দিয়ে এ-পাশ ও-পাশ কাটা। আর নরভূপদার দুই কাঁধ বাঘের থাবার আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত।

কুকুর-মারা বন্দুকের গুলিতে বাঘ মরবে কেন। একটা গুলী ছুঁড়তেই বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল নরভূপদার উপর। নরভূপদা দুই বলিষ্ঠ হাতে সেই যে বাঘের গলা টিপে ধরলেন আর ছাড়লেন না। অন্য ছেলেরা প্রাণের দায়ে বাঘের মাজা লক্ষ করে সমানে চালালেন লাঠি আর হকিস্টিক, যতক্ষণ, বাঘের শিরদাঁড়াটা না ভাঙ্গল। বাঘ একটু ঘায়েল হতেই নরভূপদা চিৎকার করে বললেন, ভোজালিটা দাও। কোমর থেকে ভোজালিটা টেনে বার করে ওর হাতে দিতেই তা চালিয়ে দিলেন বাঘের কণ্ঠনালীর উপর।

আমরা সবাই বাঘের চারিদিক ঘিরে বাঘে মানুষের লড়াইয়ের লোমহর্ষক কাহিনী উদগ্রীব হয়ে শুনছি, এমন সময় একটা মাংস কাটা ছুরি হাতে সুধাকান্তদা সেখানে এসে হাজির। বললেন—'বাঘের ছাল ছাড়িয়ে সামনের পায়ের রান থেকে মাংস চাই। বাঘ মানুষের মাংস খায়, আজ আমি বাঘের মাংস খাব।'

সুধাকান্তদার এই উদ্ভট সংকল্প শুনে কে একজন বলে উঠলেন—'বাঘের মাংস খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়।'

সুধাকান্তদা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—'বাঘের মাংস খেলে পাগল ভাল হয়ে যায়।'

সুধাকান্তদার নানারকম পাগলামী খেয়ালের জন্য শান্তিনিকেতনে সবাই ওঁকে 'পাগল' বলেই ঠাট্টা করত।'

সেই রাত্রেই সুধাকান্তদা প্রচুর পেঁয়াজ রসুন সহযোগে বাঘের মাংস রান্না করেছিলেন, কিন্তু একটুকরো মুখে দিয়েই ফেলে দিতে হয়েছিল। বাঘের মাংস যে এতটা তেতো হবে তা তিনি আগে বুঝতে পারেন নি।

গল্পের এখানেই বৈঠকের একজন বললেন—'ওয়েফ্ ফাদার! এ হেন বড় সুধাকান্তর ছোট ভাই নিশিকান্ত। তাহলে ব্যাপারটা বুঝুন। ইঁদুরের মাংস দিয়ে যার শুরু তার শেষটা কোথায় একবার অনুমান করুন।'

আমি বললাম—'এ আর কি শুনলেন। নিশিকান্তর বাদুড়ের মাংস খাওয়ার গল্পটা তা হলে বলি। আমার সহপাঠী বর্মী ছেলে টুনাং নিশিকান্তর মাংস খাওয়ার উৎসাহ দেখে বললে, বর্মা দেশে বাদুড়ের মাংস নাকি খুব প্রিয় খাদ্য। যাঁহাতক শোনা—নিশিকান্তরও রোখ চেপে গেল সে-ও বাদুড়ের মাংস খেয়ে দেখবে। এখন বাদুড় কোথায় পাওয়া যায়? অবশেষে টুনাং এসে খবর দিল, নীল কুঠিয়াল চীপ সাহেবের পরিত্যক্ত কুঠির বাগানে সন্ধ্যের পর নাকি ঝাঁকে-ঝাঁকে বাদুড় বসে। চীপ সাহেবের কুঠি ছিল শ্রীনিকেতন থেকে মাইল দুই উত্তরে বল্লভপুর গ্রামের কাছে। শ্রীনিকেতনে তখন এক জাপানী সপরিবারে থাকতেন, নাম তাঁর কাসাহারা। হনুমান শ্রীনিকেতনের চাষের ফসল নষ্ট করত বলে এলমহার্স্ট সাহেব তাঁকে একটা বন্দুক দিয়েছিলেন। টুনাং কাসাহারাকে পটিয়ে-পাটিয়ে বন্দুক যোগাড় করে সন্ধ্যার আগেই সাইকেলে চেপে চলে গেল চীপ সাহেবের কুঠি।

আমরা মাংস রান্নার যাবতীয় মালমশলা সংগ্রহ করে টুনাং-এর জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় টুনাং সাইকেলের হ্যাণ্ডেল-এ একজোড়া বাদুড় ঝুলিয়ে এসে হাজির। রান্না হল বটে কিন্তু খাওয়া গেল না। যা আঁশটে গন্ধ!

নিশিকান্ত দমবার পাত্র নয়। বললে—'ভিনিগারে একরাত ভিজিয়ে রাখতে পারলে গন্ধ মারতে পারতুম। ঠিক আছে। আরেকদিন হবে।'

আমাদের উৎসাহ অবশ্য সেদিনই ধামা-চাপা পড়ল।

নিশিকান্তর পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হবার দৃষ্টান্ত একাধিক। তার মধ্যে দুটি গল্প আপনাদের শোনাই।

১৯৩০ সালের কথা। আমি তখন শান্তিনিকেতন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, নিশিকান্তর কবিখ্যাতি তখন শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দি পেরিয়ে কলকাতার 'পরিচয়' 'বিচিত্রা' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাদেশেও ছড়িয়েছে। সে তখন শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র। কবিতা লেখার মত ছবি আঁকাতেও সে ট্রাডিশন ভেঙেচুরে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তন্ময়।

শান্তিনিকেতনে তখন পূজোর ছুটি, সকাল-সন্ধ্যেয় শীতের আমেজ তখন

সবে শুরু। একদিন সকালে একটা হলদে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে নিশিকান্ত আমার বাড়ি এসে বললে—'সাগর, চটপট একটা আলোয়ান গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আয়। আমার সঙ্গে চল্।'

কোথায় যেতে হবে, কী হয়েছে, শীত না পড়া সত্ত্বেও আলোয়ান গায়ে দিতে হবে কেন, এসব প্রশ্ন করা বৃথা। সঙ্গে যেতে হবে যখন তখন যেতেই হবে। আমার ছিল একটা লাল রঙের আলোয়ান, তাই গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পথে যেতে যেতে নিশিকান্ত বললে—'উত্তরায়ণের পশ্চিম দিকের ভুট্টা খেতে বড় বড় ভুট্টা হয়েছে। চল পেড়ে আনি, ভেজে খাওয়া যাবে।'

প্রস্তাবটা আমার কাছে খুব মনঃপূত হল না। চিন্তিত হয়ে বললাম—'বাগানের মালীরা ঘোরাফেরা করে। তাছাড়া—'

এক ধমক দিয়ে নিশিকান্ত বললে—'ওসব তোকে ভাবতে হবে না। আমি সব খোঁজ নিয়েছি। সকালে মালীরা উত্তরায়ণের পুব দিকের গোলাপ বাগানে থাকে। তোর যদি এতই ভয়, তুই চলে যা। আমি একাই যাব। তারপর যখন উনুনে সঁাতলে গাওয়া ঘি মাখিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাব তখন চাইতে আসিস।'

পৌরুষে ঘা লাগল। নিশিকান্ত আমাকে এতই ভীতু মনে করবে? তাছাড়া ভুট্টা খাবার বর্ণনাটাও ততক্ষণে রসনাকে রসিয়ে তুলেছে। দ্বিরুক্তি না করে ওর সঙ্গেই পা চালালাম।

উত্তরায়ণের পশ্চিম দিকের তারের বেড়া টপকে দুটি হলদে আর লাল আলোয়ান বিরাট ভুট্টা খেতের মধ্যে মিলিয়ে গেল। গোটা তিন চার কচি ভুট্টা পেড়ে আলোয়ানের মধ্যে লুকিয়ে খেত থেকে বেরিয়েই দেখি উত্তরায়ণের উড়িয়া খাস চাকর নাথু, পান দোক্তা খাওয়া কালো দাঁত বার করে হাসছে।

নাথুকে দেখেই নিশিকান্ত ফিসফিস করে আমাকে বললে—'খবরদার, ঘাবড়াস নে। কি বলে শোনা যাক।'

নাথু আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললে—'বউঠান আপনাদের দুজনকে ডাকছেন।'

বউঠান ডাকছেন! শুনেই তো মাথায় বজ্রাঘাত। কী লজ্জার কথা। ভুট্টা চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেলাম! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই শেষ, নিশিকান্তর সঙ্গে আর কোন দিন কোথাও যাচ্ছিনা।

নিশিকান্ত কিন্তু নির্বিকার। নাথুকে বললে—'চল্ যাচ্ছি।'

নাথুকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরায়ণের দিকে যেতে যেতে মোলায়েম স্বরে নিশিকান্ত বললে—'হ্যারে নাথু, বউঠান কি আমাদের ভুট্টা ক্ষেতে ঢুকতে দেখতে পেয়েছেন? না কি তোরা দেখতে পেয়ে বউঠানকে বলে দিয়েছিস?'

নাথু বললে—'আমি ঘরের ভিতর ঝাড়পোঁছ করছিলাম। বউঠান ডেকে বললেন আপনাদের দুজনকে নিয়ে আসতে।'

উত্তরায়ণের পশ্চিম দিকের বারান্দায় ঢুকে দেখি বউঠান গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূকে শান্তিনিকেতনের সকলেই বউঠান বলেই সম্বোধন করে থাকে। নিশিকান্ত সামনে, আমি পিছনে মাথা নীচু করে অপরাধীর মত বউঠানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বউঠান স্বভাব-স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে বললেন—'ভুট্টাগুলি আমার হাতে দাও।'

নিশিকান্ত আলোয়ানের ভিতর থেকে দুটো ভুট্টা বের করে বউঠানের হাতে দিল, ওর দেখাদেখি আমার দুটোও বার করে দিলাম। কোন কথা না বলে ভুট্টাগুলি হাতে করে ভিতরে চলে গেলেন, যাবার সময় শুধু বলে গেলেন—'তোমরা বোস, আমি আসছি।'

বসে আছি তো বসেই আছি। এক-একটা মুহূর্ত তখন আমার কাছে এক-এক ঘণ্টা। মনে তখন দুশ্চিন্তাও ঘনিয়ে এসেছে। বউঠান যদি রথীদাকে বলে দেন। যদি এই ব্যাপারটা গুরুদেবের কানে ওঠে! নিশিকান্তকে ভয়ে ভয়ে বললাম—'চল পালাই।'

নিশিকান্ত আবার ধমকে উঠল—'চুপ করে বোস্। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কী হয়। তোর যদি এতই ভয়, তাহলে আমার সঙ্গে এলি কেন।'

অগত্যা চুপ করেই বসে রইলাম। নিশিকান্ত ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে নিশ্চিন্ত নীরবে চেয়ারে গা এলিয়ে বাঁ-পায়ের উপর ডান-পা তুলে নাচাচ্ছে। ভাবখানা যেন কবিতার একটা আইডিয়া সদ্য মাথায় গজিয়েছে, শুধু ছন্দে গেঁথে তোলাই বাকি।

এমন সময় প্রতিমা দেবী আবির্ভূতা হলেন। দুই হাতে দুটি থালা। একটি থালায় গোটা আষ্টেক ডবল সাইজের পান্তুয়া, অপর থালায় নুন-ঘি মাখানো চারটি ভুট্টা। ভুট্টাগুলি আগুনের তাপে তখনও তেতে আছে।

সামনের টেবিলের উপর থালা দুটি রেখে বললেন—'সব কিন্তু খেতে হবে। কিচ্ছু ফেলা চলবে না।'

আমি ততক্ষণে লজ্জায় কাঠ হয়ে গেছি। নিশিকান্ত মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে পান্তুয়াগুলি তুলে টপাটপ মুখে ফেলতে লাগল। অর্ধোন্মীলিত চোখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে পান্তুয়া চিবিয়ে চলেছে—শব্দ হচ্ছে চপ্‌ চপ্‌ চপ্‌।

বউঠান আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—'কী, লজ্জা করছ কেন, খাওয়া শুরু কর। তা না করলে, তুমিই ঠকবে। নিশি তোমার জন্যে কিছুই বাকি রাখবে না। ওকে তো তুমি জানো।'

ততক্ষণে নিশিকান্ত ভাবের ঘোরে নিজের ভাগের চারটা পান্তুয়া শেষ করে আমার ভাগের উপর হামলা চালিয়ে আর দুটো শেষ করেছে। আমি তখন নিরুপায় হয়ে থালাটা নিজের কোলের উপরেই টেনে নিলাম। নিশিকান্ত ভুট্টার থালায় হাত বাড়াল।

খাওয়া শেষ করে আমরা যখন যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, বউঠান বললেন —'যেদিন তোমাদের ভুট্টা খাবার ইচ্ছে হবে সোজা আমার কাছে চলে এসো। আমিই খেত থেকে আনিয়ে তোমাদের খাওয়াব।'

সেদিনের পর অবশ্য আমি আর কোনদিন বউঠানের কাছে ভুট্টা খেতে যাই নি। নিশিকান্ত গিয়েছিল কি না জানি না। গিয়ে থাকলেও সে কি আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? আর আমিই কি ওর সঙ্গে আর কখনও যেতাম?

তবু আরেকবার ওর সঙ্গে যেতে হয়েছিল। এবার বউঠানের কাছে নয়, দিনদার কাছে। রবীন্দ্রনাথের সকল গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের সকল আনন্দোৎসবের উৎস। তাঁর কাছে ছেলে-বুড়ো সবারই ছিল অবারিত দ্বার। বিশেষ করে আশ্রমের বালক-বালিকাদের উনি খুব ভালবাসতেন। ছেলেদের বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়ানো-দাওয়ানো, তাদের সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানারকম মজার গল্প করা এবং গানে অভিনয়ে সকলকে মাতিয়ে রাখা ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ।

নিশিকান্তর সঙ্গে কথা হল—পরদিন খুব ভোরে উঠে দুজনে খেজুর গাছের রস খেতে যাব গোয়ালপাড়ার গ্রামে। শীতের রাত। ভোর সাড়ে চারটায় উঠে গোয়ালপাড়ায় যখন পৌঁছেছি তখন গাছ থেকে সবে হাঁড়ি পাড়া হচ্ছে। রস যেখানে জ্বাল দেয় সেখানে আগুনের ধারে বসে নিশিকান্ত একাই এক হাঁড়ি রস খেয়ে দুবার ঢেঁকুর তুলল। আমি চেষ্টা করেও দু গেলাসের বেশী আর খেতে পারলাম না।

গোয়ালপাড়ার রাস্তা ধরে আমরা যখন উত্তরায়ণের কাছাকাছি ফিরেছি তখন পুবদিকের রেল লাইনের ধারে তাল গাছের মাথায় সবে সূর্য দেখা দিয়েছে। রাস্তার ডানদিকে উত্তরায়ণ, বাঁদিকে দিনদার বাড়ি। নিশিকান্তর মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপল। বললে—'চল, দিনদার বাড়ি যাই।'

আমি বললাম—'সে কী, এই ভোরে দিনদার বাড়ি? উনি হয়তো ঘুম থেকেই ওঠেন নি। এখন গিয়ে উৎপাত করাটা কি ঠিক হবে?'

নিশিকান্ত বললে—'তুই জানিস না। দিনদা এতক্ষণে চায়ের পাট নিয়ে বসেছেন। কাক কোকিল ডাকবার আগেই উনি ঘুম থেকে ওঠেন। এখন গেলে বাসি মাংস খাওয়া যাবে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'বাসি মাংস? সে আবার কি!'

নিশিকান্ত বললে—'রাত্তিরে ওঁর জন্যে কাবাবের মত পেঁয়াজ রসুন দিয়ে মাংস রান্না করে অল্প আঁচের উনুনে রেখে দেওয়া হয়। সকালে চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি দিয়ে খান। আর মজা হচ্ছে এই, এ-সময় যে যায় সে-ই ভাগ পায়।'

আমি বললাম—'এ সংবাদটি তুমি ছাড়া আর বোধ হয় কেউ জানে না।'

নিশিকান্ত হেসে বললে—'জানলে কি আর রক্ষে ছিল। এতক্ষণে দেখতে পেতিস প্রাতঃভ্রমণকারীরা দিনদার বাড়ির সামনে লাইন দিয়েছে।'

কথা বলতে বলতে আমরা দিনদার বাড়ির পশ্চিম দিকের কাঁকর-ঢালা উঠোনটায় এসে পড়েছি। নিশিকান্ত যা বলেছিল ঠিক তাই। দিনদা অশ্বত্থ গাছের নীচে একটি আরাম-কেদারায় বসে আছেন, কোলের উপর একটা বাঁধানো খাতা, হাতে পেন্সিল। গুনগুন করে সুর ভাঁজছেন আর খাতায় কি টুকছেন। আমাদের দুজনকে দেখেই সোৎসাহে বলে উঠলেন—'এই যে মানিকজোড়, আয় আয়। তা এত সকালে কী মনে করে!'

নিশিকান্ত বললে—'গোয়াল-পাড়ায় রস খেতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে তাই ভাবলাম একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

'তা বেশ করেছিস।' বলেই দিনদা হাঁক দিলেন—'ওগো শুনছো, মানিকজোড় এসেছে। এবার আমাদের চা দাও।'

আমাদের দুজনকে সর্বত্র একসঙ্গে দেখা যেত বলেই বোধ হয় দিনদা আমাদের সব সময় 'মানিকজোড়' বলেই ডাকতেন।

নিশিকান্তর বাক্য দেখছি অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। দিনদার স্ত্রী কমল

বউঠান যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলেন, সঙ্গে এল পুডিং তৈরীর প্যান-এ ঠাসা এক প্যান বাসি মাংস। নিশিকান্ত আড়চোখে আমার দিকে তাকাল। ভাবখানা যেন—'কেমন, যা বলেছি ঠিক কি না ছাখ।'

আমাদের নির্লজ্জ খাই-খাই স্বভাবটা ঢাকা দেবার জন্যে বললাম—'দিনদা, আপনি খাতায় কি লিখছিলেন?'

দিনদা বললেন—'আর বলিস কেন। রবিদার কাণ্ড। শেষ রাত্রে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন একটা সদ্য রচিত গান তুলে নেবার জন্যে। গানটা কাল রাত্রে বিছানায় শুয়ে রচনা করেই সুর দিয়েছেন। সারারাত ঘুমোন নি পাছে ঘুম থেকে উঠে সুর ভুলে যান। ভোর চারটের সময় নীলমণি এসে হাজির, বললে বাবুমশায় এখুনি ডাকছেন। এই তো একটু আগে রবিদার কাছ থেকে ফিরলাম। সুরটা স্বরলিপি করে খাতায় টুকে রাখছি।'

কথা বলতে বলতেই দিনদা রবীন্দ্রনাথের সদ্য রচিত গানটি গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন— "কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে,
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥"

গান থামিয়ে দিনদা বললেন—'তোরাই বল, গানটা যদি রাতের বেলায় এসেছিল তাহলে তখনই আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হত। তা নয়, সারারাত না ঘুমিয়ে জেগে রইলেন কখন আমি যাব। রবিদাকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ দাদামশায় ও নাতি সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের দৌহিত্র হলেন দিনেন্দ্রনাথ, দীপুবাবুর পুত্র, যে-দীপুবাবুর গল্প আগেই আপনাদের শুনিয়েছি।

ইতিমধ্যে কমল বউঠান চা ও খাবার সবাইকে পরিবেশন করেছেন। নিশিকান্ত এক স্লাইস পাঁউরুটির উপর পুরু করে মাংস ঢেলে তার উপর আরেক স্লাইস রুটি চাপিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে পরমানন্দে খেয়ে চলেছে। যেন ও অনেক দূরের মানুষ, আমাদের সঙ্গে যেন ওর কোন সম্পর্কই নেই। মুখের খাদ্যবস্তু এক ঢোঁকে উদরসাৎ করে নিশিকান্ত মুখ খুলল। বলল—'আপনি গুরুদেবকে বলেন না কেন যে যত রাতই হোক আপনাকে ডেকে পাঠাতে?'

দিনদা হাসতে হাসতে বললেন—'সে কি আর বলি না। বহুবার বলেছি, আজও বলেছি। কিন্তু ওঁর ওই এক কথা। ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে ডাকলে

নাকি আমার কষ্ট হবে। অথচ নিজে জেগে থেকে কষ্ট করবেন সারারাত।' একথা বলেই দিনদা আপন মনে আবার গানটি গেয়ে উঠলেন।

আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি। এমন সময় দিনদার সর্বাধিক প্রিয় পাত্রী অমিতা সেন আমাদের চায়ের আসরে এসেই টিপ করে দিনদাকে প্রণাম করল।

শশব্যস্ত হয়ে দিনদা বলে উঠলেন—'এই যে নাইটিঙ্গেল, সকাল বেলায় এসেই প্রণাম করলি? কি ব্যাপার, সুখবর কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই।'

অমিতা সেন, যাকে 'খুকু' বলেই শান্তিনিকেতনের সবাই চিনত, তার ছিল ঈশ্বর-দত্ত গাইবার ক্ষমতা। তার কণ্ঠস্বর ছিল যেমন সুরেলা ও মধুর তেমনি ছিল উদাত্ত। ছেলেবেলা থেকে অদ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের গান বহু মেয়ের কণ্ঠেই শুনেছি কিন্তু খুকুর মত এমন সহজ সরল কণ্ঠের প্রাণঢালা গান আমি আর কোথাও শুনি নি। খুকু দেখতে ছিল কালো, কিন্তু যখন গান গাইত, অপরূপ হয়ে উঠত সে নিজে, অপরূপ করে তুলত চারিদিকের পরিবেশ। দিনদা তাঁর এই প্রিয় শিষ্যাকে সব সময়ই আদর করে 'নাইটিঙ্গেল' বলে ডাকতেন এবং এই ডাক যে কতখানি সত্যি তা খুকুর গাওয়া 'ফিরে ডাক দেখি-রে পরাণ খুলে ডাক' রেকর্ডটি যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন। খুকু অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে এবং ওর চলে যাবার সঙ্গে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল সেই কোকিল-কণ্ঠীর গান।

দিনদা ও কমলা বউঠানকে প্রণাম করেই খুকু বললে—'আজ আমার জন্মদিন। ঘুম থেকে উঠে সবার আগে আপনার পায়ের ধুলো নিতে এসেছি।'

খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে দিনদা বললেন—'খুব আনন্দের কথা। কিন্তু আগে জানাতে হয়। তোর জন্মদিনে একটা কিছু উপহার দিতে হবে তো। কী চাস্ তুই আমার কাছে বল।'

খুকু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—'এই মাত্র যে-গানটা গাইছিলেন সেইটা শিখিয়ে দিন।'

দিনদা বললেন—'এ গান তো তোদের গাইবার জন্যই, এ তো শিখবিই। আমার কাছে আর কী তুই চাস বল।'

খুকু একটু ভেবে আমতা-আমতা করে বলল—'আপনি যদি কথা দেন যা চাইব দেবেন, তবেই চাইব।'

বড় বড় চোখ করে দিনদা বললেন—'ওরে বাবা! এ যে দেখছি

রামায়ণের মুনিঋষিদের দেবতার কাছে বর চাওয়ার ব্যাপার। তা তোর তপস্যার জোর আছে তুই বর চাইতে পারিস। কথা দিলাম, যা চাইবি দেব।'

খুকু বললে—'আপনার লেখা কবিতার বই 'নীরব বীণা' একখানা চাই।'

নিমেষের মধ্যে দিনদা যেন চুপসে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কমল বউঠানকে বললেন একখানা বই বাক্স থেকে নিয়ে আসতে। বই এল। বইয়ের প্রথম পাতায় লিখে দিলেন 'কল্যাণীয়া খুকুকে দিনদার স্নেহাশীর্বাদ।'

বই পেয়ে খুকুর আর আনন্দ ধরে না। আরেকবার দিনদা আর বউঠানকে প্রণাম করে সে বিদায় নিল। দিনদা সেই যে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন আর কোনও কথা বললেন না।

বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। যে মানুষ এতক্ষণ হাসি-ঠাট্টায় গানে-গল্পে চায়ের আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন হঠাৎ কেন নীরব হয়ে গেলেন, এ-রহস্য কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। নিশিকান্তর দিকে চাইতেই সে ইশারা করল উঠে পড়তে; আমরা দুজন উঠে পড়তেই দিনদা শুধু একটি কথাই বললেন—'আবার আসিস।'

রাস্তায় বেরিয়ে নিশিকান্তকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ব্যাপরটা কি বল তো ?

নিশিকান্ত বললে—'খুকু দিনদার একটা দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছে। পরিহাসরসিক সদাহাস্যময় দিনদার ভিতরে একটি কবি-মন লুকিয়ে আছে। আগে কবিতা লিখতেন, এখনও লেখেন কিন্তু কখনও তা ভুলেও প্রকাশ করেন না। এই 'নীরব বীণা' কবিতার বইটি দিনদা তাঁর যৌবনকালে অতি সঙ্কোচের সঙ্গেই ছাপিয়েছিলেন। সেই সময় 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি এই বই সম্পর্কে তাঁর পত্রিকায় টিপ্পনী কেটে লিখেছিলেন; 'দাদামহাশয় ও নাতি উভয়ে মিলিয়া যে-ভাবে সরবে 'নীরব বীণা' বাজাইতেছেন তাহাতে মনে হইতেছে গড়ের বাদ্যের আর প্রয়োজন হইবে না'। এই মন্তব্যই কাল হল। দিনদা এসব ব্যাপারে স্বভাবতই লাজুক। তার উপর সমাজপতির রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে মন্তব্য করায় সেই যে আঘাত পেলেন তার ফলে দোকান থেকে সব বই চেয়ে এনে পুড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছিলেন। কমল বউঠান তা করতে না দিয়ে বাক্স বন্দী করে রেখেছেন। এ-বই কাউকেই উনি কখনও দেখান নি এবং দেন নি। খুকু অনেক দিন ধরেই বইটি আদায়ের মতলবে ছিল। শেষে জন্মদিনের নাম করে আদায় করল

নিশিকান্তর শেষ মন্তব্যটুকু আমার কাছে আপত্তিজনক মনে হতেই বললাম—'জন্মদিনের নাম করে আদায় করল—এ-কথা তুমি কেন বলছ।'

'প্রমাণ চাস্? সাতদিনের মধ্যে তোকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়ে দেব।' এ-কথা বলেই নিশিকান্ত হনহন করে হাঁটা দিল।

দিন সাতেক বাদে এক ছুটির দিনে ভোরে সূর্যোদয়ের আগেই নিশিকান্ত আমার বাড়ি এসেই বললে—'চল্, এক্ষুনি বেরোতে হবে।'

সাত সকালে দু মাইল হেঁটে আবার রস খেতে যেতে হবে ভেবেই তো চক্ষুস্থির। আমি ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বললাম—'রস কিন্তু আমি খেতে যাব না।'

নিশিকান্ত বললে—'না রে না, রস খেতে নয়। তুই চল না আমার সঙ্গে।'

নতুন কিছু একটা মতলব নিয়ে নিশিকান্ত এই ভোরে বেরিয়েছে সেটা অনুমান করতে দেরি হল না। নিশিকান্তর সব কাজেই আমার কৌতূহল অপরিসীম। ওর সঙ্গে আর কোথাও যাব না এ-প্রতিজ্ঞা বহুবার করেও তা ভাঙতে হয়েছে, শুধু এই কৌতূহলের জন্যে। সেদিনও বিনা বাক্যব্যয়ে ওর সঙ্গী হলাম।

নিশিকান্তর সঙ্গে সোজা এসে হাজির হলাম দিনদার বাড়ি। যথারীতি অশ্বত্থ গাছের তলায় দিনদা তখন চায়ের আসর সাজিয়ে একাই বসে আছেন।

আমাদের দেখতে পেয়েই হাঁক দিলেন—'আরও দুটো কাপ পাঠিয়ে দাও, মানিকজোড় এসেছে।'

নিশিকান্ত আমাকে পিছনে ফেলে হনহনিয়ে হেঁটে গিয়ে দিনদাকে এক প্রণাম ঠুকেই বললে—'আজ আমার জন্মদিন।'

আমি তো অবাক। আমি যেমন আমার জন্মদিন কবে তা আজও জানি না, নিশিকান্তও তার নিজের জন্মদিনের খবর কোনকালেই রাখে না বলেই আমার ধারণা। সরল মানুষ দিনদা, তা-ই বিশ্বাস করে বসলেন। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন—'আই তো, তোর জন্মদিন। কী দিই তোকে বল তো। তোর তো আবার পছন্দ মত জিনিস হওয়া চাই—'

নিশিকান্তর জন্মদিনে কি উপহার দেবেন এই ভাবনা নিয়ে যখন দিনদা মাথা ঘামাচ্ছেন ঠিক সেই সময় বাড়ির চাকর কাঠের বাক্সর খাঁচা থেকে এক ঝাঁক হাঁস ছেড়ে দিয়েছে। বাক্স থেকে ছাড়া পেয়েই হাঁসগুলি মহাকলরবে

ছুটে চলে এসেছে আমরা যেখানে বসে ছিলাম সেইখানে। দিনদার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। নিশিকান্তকে বললেন—'তুই তো আবার মাংস খেতে খুব ভালবাসিস। ঝাঁক থেকে একটা হাঁস নিয়ে যা, তোর জন্মদিনের উপহার!'

দিনদার মুখ থেকে কথা বেরোতে না বেরোতেই চক্ষের নিমিষে নিশিকান্ত গায়ের আলোয়ানটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝাঁকের মধ্যে সবচেয়ে পুরুষ্টু, সাদা ধবধবে হাঁসটার উপর। ইস্ট বেঙ্গলের গোল রক্ষক কে দত্ত যেন বডি-থ্রো করে রসিদের পায়ের উপর থেকে বলটা ছিনিয়ে নিল।

হাঁসটাকে আলোয়ানে মুড়ে বগলদাবা করে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে নিশিকান্ত বললে—'আজ তা হলে চলি দিনদা। চা আজ আর খাব না, আরেকদিন আসব।'

দিনদা নিশিকান্তর রকমসকম দেখে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললেন—'সাদা হাঁসটাই নিলি। ওটা আমার বড় প্রিয় হাঁস ছিল রে'—কি যেন ভাবতে ভাবতে দিনদা আবার বলে উঠলেন—'তা তোর যখন ওইটাই পছন্দ তুই নিয়েছিস, বেশ করেছিস।'

দিনদার বাড়ির চৌহদ্দি পার হতেই আমি উষ্মাভরা কণ্ঠে বললাম—'এটা কি উচিত হল? স্রেফ ভাঁওতা দিয়ে একটা হাঁস নিয়ে এলে?'

নিশিকান্ত আমার কথার কিছুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বলল—'প্রমাণ দেব বলছিলাম, তাই দিলাম। তাছাড়া এখন আমার মাথায় ঘুরছে কোথায় স্টোভ, কোথায় তেল-নুন-ঘি-আলু-মশলা, কোথায় ডেকচি। তোর নীতিবাক্য শোনবার সময় নেই আমার।'

সেই রাত্রে বিরাট ভোজ হল। নিশিকান্ত সারাদিন তার রান্নার যাবতীয় অভিজ্ঞতা দিয়ে রেঁধেছিল চমৎকার। কিন্তু খাবার সময় প্রতিমুহূর্তে দিনদার সেই কথাটা মনের মধ্যে কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধছিল—'আমার বড় প্রিয় হাঁস ছিল রে!'

আমাদের শনিবাসরীয় বৈঠকের মাঝে মাঝে যে ছেদ ঘটত না তা নয়, তবে সেটা ছিল আকস্মিক ব্যাপার। এমনও হয়েছে যে কোন সভা-সমিতি বা সিনেমা-থিয়েটারের আমন্ত্রণে শনিবার দপ্তরে আমি অনুপস্থিত, কিন্তু তাতে কী এসে যায়। সহকর্মীরা সাহিত্যিক বন্ধুদের জুটিয়ে জটলা জমিয়েছেন, আমার অনুপস্থিতিতে চা-সিগরেট-পান-বিড়ি সহযোগে বৈঠকীদের আপ্যায়ন করেছেন পাছে এ-কথা ওঠে যে আমার অবর্তমানে লেখকদের আদরআপ্যায়নে কোন ত্রুটি ঘটেছে। আমার সহকর্মীরা আমাদের আসরের গল্পগুজবের ছিলেন নীরব শ্রোতা। কিন্তু আড্ডা জমিয়ে তোলার যোগানদারিতে তাঁর এক-একজন কেউ-কেটা।

বলছিলাম তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বৈঠকে ছেদ ঘটত। এই যেমন ঘটছে, গত সংখ্যার 'জলসা'য় সম্পাদকের বৈঠকের। কারণটা আকস্মিক। আমার বৈঠকের দুই বন্ধুকেই কথা দিয়েছিলাম যে নিশিকান্তর খাওয়ার গল্প আর নিশিকান্তর শান্তিনিকেতন ছেড়ে পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার কাহিনী দুইই বলব। একজনের কথা রেখেছি খাইয়ে নিশিকান্তর গল্প বলে, অপরজনের কথা রাখতে গিয়েই বিভ্রাট। ভোজনরসিক নিশিকান্তর কথা যে-সংখ্যায় লিখেছিলাম সেই সংখ্যাটি কোন সময়ে জলসা-সম্পাদক নিশিকান্তকে পণ্ডিচেরীর ঠিকানায় পাঠিয়ে বসে আছেন। পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিশিকান্তর শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাওয়ার বিরাট-ট্রাজেডি ফলাও করে লিখছি এমন সময় পণ্ডিচেরী থেকে নিশিকান্তর পত্রাঘাত। অগত্যা নিশিকান্ত-প্রসঙ্গর সেইখানেই ইতি, সম্পাদকের মাসিক বৈঠকও জলসায় বসল না। কারণ কী? নিশিকান্তর সেই চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃতি থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন:

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী
৪।৮।৫৭

ভাই সাগর,

'জলসা' পত্রিকা পেয়েছি।…আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম, সাধক-কবি

নিশিকান্ত সম্বন্ধে অনেকে লেখে। খাদক-লোভী নিশিকান্তকে নিয়ে কেউ লেখে না কেন? এই কথা ভেবে আমার আফসোসের অন্ত ছিল না, এতদিনে সে-ভাবনা ঘুচল। লিখে যাও, ভাই সাগর লিখে যাও। এখনও ভোজনরসিক নিশিকান্তকে নিয়ে অনেক, অনেক লিখবার আছে। দেদার লেখ, প্রচুর লেখ, এন্তার লেখ। শুধু সেই ট্রাজেডিটা চেপে রেখে দাও। আমার স্বরূপ এতদিনে পাচ্ছি। এখানে আমার বান্ধবরা বলছে, তোমার লেখায় আমার ভাব-ভঙ্গি কথা বলার ধরন খুব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।...

'কালি কলম' 'কল্লোলে' আমার কোন কবিতা প্রকাশ হয় নি। কবি-কর্তার কঠোর আদেশ ছিল, আমি যেন আমার কবিতা কোন পত্রিকায় না দিই। 'বিচিত্রা'য় আর 'পরিচয়ে' তিনিই আমার কবিতা প্রকাশ করেছিলেন এবং তার দরুন কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটেছিল।

ইতি—

তোমাদের নিশিকান্ত

'ট্রাজেডিটা চেপে রেখে দাও' এই অনুরোধের মধ্যে নিশিকান্তর মনের আরেকটা দিক আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। যে-নিশিকান্ত চিরদিনের মত শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাবার সময় তিন-তিনখানা কবিতার খাতা আমার সামনেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল, যে-নিশিকান্ত তার শিল্পী-জীবনের আঁকা এক বাণ্ডিল ছবি ডাকটিকিটের উপর সই করে লিখে দিয়েছিল—'আমার এই অস্থাবর সম্পত্তি শ্রীসাগরময় ঘোষকে দান করিয়া গেলাম', সেই নিশিকান্ত আজ লিখছে ট্রাজেডিটা চেপে রেখে দাও। তাই রাখলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কেন সে এই পরম দুঃখের ঘটনাকে আজও চেপে রাখতে চায়। যে-বেদনার জন্য তাকে তার জীবনের শিল্পকীর্তিকে ছিন্ন বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যেতে দিয়েছিল, সে-বেদনা হয়তো সে বিধাতার দান বলেই মেনে নিয়েছে এবং সেই কারণেই বোধ হয় সে প্রেমে প্রাণে গানে রূপে রসে ভরা সংসারের বন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সাধক-জীবনের মধ্যে সেই পরম বেদনার পরমা শান্তি খুঁজে পেয়েছে। আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর হল নিশিকান্তর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। দূর থেকে সাধক নিশিকান্তর পরিচয় পাই তার গানে কবিতায়, কিন্তু সে-পরিচয় আর কতটুকু? আমি শিল্পী-সাহিত্যিক নিশিকান্তকেই চিনতাম

আর চিনতাম মানুষ নিশিকান্তকে। সাধক নিশিকান্ত আমার কাছে তাই আজও রহস্য হয়েই আছে।

॥ ৯ ॥

সম্পাদকের দপ্তর থেকে দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে দেখি টেবিলের উপর এক-বাণ্ডিল চিঠি অপেক্ষা করছে। চিঠিগুলি খুলব কি খুলব না এই প্রশ্ন মনের মধ্যে যখন দোদুল্যমান, একে একে বৈঠকের বন্ধুদের আবির্ভাব।

একজন বললেন—'কী ব্যাপার, আজ কোথায় একটু জমাটি আড্ডা দেব, আপনি কি-না চিঠির তাড়া নিয়ে বসলেন?'

আড্ডার সব্যসাচী সাহিত্যিক স্বভাবসুলভ টিপ্পনী কেটে মন্তব্য করলেন—'তাহলে আজ আপনি আপনার প্রেমপত্রগুলি নিয়েই মশগুল থাকুন, আমরা গুটিগুটি বিদায় হই।'

মনে মনে ভাবলাম প্রেমপত্রই বটে। নানা ধরনের হাতের লেখায় এই বিচিত্র পত্রাবলীর মধ্যে অলংকারশাস্ত্রের যে-কয়টি রসের উল্লেখ পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিই আমার সামনে নীরবে অপেক্ষা করছে। রুদ্ধ খামের অর্গল উন্মুক্ত করলেই একে একে তারা কথা বলে উঠবে—কেউ জানাবে হতাশার দীর্ঘশ্বাস, কেউ চায় আশার আলো, আবার কেউ অভিমানভরা কণ্ঠে জানাবে প্রত্যাখানের বেদনা। আবার এর মধ্যে এমন পত্রলেখকও আছেন যিনি কিছুদিন অপেক্ষার পর লেখা ফেরত চেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে পত্রাঘাত করলেন —

'পত্রিকা সম্পাদনার কাজে আপনার কোন যোগ্যতাই নেই। হাতীবাগানের বাজারে আলুওয়ালা হওয়াই ছিল আপনার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র।'

এ-মন্তব্য করেছিলেন রানাঘাটের এক প্রখ্যাত কবি, যাঁর কবিতা পত্রিকায় প্রকাশে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটেছিল। আসরের তরুণ কবি-বন্ধুকে এ ঘটনা বলতেই তিনি বললেন—

'আপনাদের পত্রিকার আপিস তো বর্মণ স্ট্রীটে। আপনাকে বর্মণ বাজারের আলুওয়ালা হবার উপদেশ না দিয়ে হাতিবাগান বাজারের কথা কেন বললেন?'

আসরের সেই ক্ষীণকায় সব্যসাচী সাহিত্যিক টেবিলে আঙুল দিয়ে তবলার টোকা মারতে মারতে ঘাড় দুলিয়ে বললেন—'হুঁ' 'হুঁ', কথাটা বলেছে ঠিকই। হাতিবাগান নামের সঙ্গে সেই বাজারের আলুওয়ালাদের দেহগত সাদৃশ্য নিশ্চয় আছে, তা না হলে এত বাজার থাকতে হাতিবাগান কেন।'

আসরের এই ক্ষীণকায় বন্ধুটি সুযোগ পেলেই আমার স্থূল দেহে চিমটি না কেটে পারেন না। তিনি আবার বললেন—'এই চিঠির পর নিশ্চয় সেই কবির কবিতা আপনাদের পত্রিকায় আর প্রকাশিত হয় নি।'

আমি বললাম—'তা কেন হবে। ওই চিঠিতেই তিনি কবিতাটি ফেরত পাঠাতে বলেছিলেন; কোন মন্তব্য প্রকাশ না করে কবিতাটি তাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিই। ছয় মাস পর তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে সে-কথা অসংকোচে স্বীকার করে কবিতাটি আবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, যথাসময়ে তা প্রকাশিতও হয়। শুধু তাই নয়, অদ্যাবধি তাঁর কবিতা সাধারণ সংখ্যা ও পূজাসংখ্যায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।'

মনে মনে জানি এর জন্যে লেখককে অপরাধী করা অন্যায়, অপরাধ সম্পাদকেরই। সম্পাদনা-কাজে একটা নির্মমতার দিক আছে। সময় সময় তা এমন প্রকট হয়ে ওঠে যে লেখকের সেন্টিমেণ্ট-এর মূল্য তাদের কাছে তখন এক কানাকড়িও থাকে না। কবিতা রচনার পরই কবি ব্যস্ত হয়ে পড়েন তা প্রকাশের জন্য। তিনি চান তাঁর কবিতা কাব্যরসিকদের কাছে অবিলম্বে পৌঁছে যাক। এই অবিলম্বের কাজে বিলম্ব ঘটলেই লেখক অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, তার ফলেই এ-ধরনের পত্রাঘাত।

চিন্তাজাল ছিন্ন করে গাল্পিক বন্ধু বললেন—'আপনার কাছে নতুন লেখকদের যে সব চিঠি আসে তার প্রধান বক্তব্য বিষয়টি কী?'

'বক্তব্য সকলেরই প্রায় এক—লেখা কবে প্রকাশিত হবে, আর যদি লেখা নিতান্তই অমনোনীত হয়, তার কারণ জানিয়ে উত্তর দেবার অনুরোধ।'

বন্ধুবর বললেন—'আপনি কি সবাইকে উত্তরে জানিয়ে দেন কেন লেখা মনোনীত হল না?'

'বলেন কি মশাই! সে কখনও জানাতে আছে? প্রত্যেক লেখকেরই, সে অখ্যাতই হোক আর প্রখ্যাতই হোক, নিজের সাহিত্যসৃষ্টির প্রতি মমত্ব আপন সন্তানের মতই। সদ্যোজাত শিশু যদি কুশ্রীও হয়, আপনি কখনও তার পিতার মুখের উপর তা বলতে পারেন?'

কথাসাহিত্যিক বন্ধু বললেন—'কথাটা অবশ্য ঠিক। আমারই কথা ধরুন না। আমি যখন প্রথম-প্রথম ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিচিত্রায় গল্প পাঠাতাম, তার কিছু ছাপা হত, কিছু হত না। ফেরত-পাওয়া গল্পর জন্ম সম্পাদকের জবাবদিহি কখনও তলব করি নি। তা ছাড়া আমার লেখার সবচেয়ে বড় সমালোচক আমার দু-একজন সাহিত্য-রসিক বন্ধু। যখনই কিছু লিখি, সেই লেখা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।'

আমি বললাম—'এইটিই তো হওয়া উচিত। নবীন লেখকরা এটুকু যদি বুঝতেন তা হলে সম্পাদকের কাজ কত সহজ হয়ে যেত, লেখকের কাছে অপ্রিয়ও হতে হত না। তা ছাড়া এ-কথাটা তাঁরা বোঝেন না যে, কেন লেখা অমনোনীত হল তার কারণ বলতে গেলে প্রত্যেক অমনোনীত লেখার জন্ম সম্পদককে চিঠির বদলে প্রবন্ধ লিখতে হয়। তাতে নূতন লেখকদেরই ক্ষতি। কৈফিয়ত দিতে গেলে যে-সময় চলে যায় সে-সময়ে নতুন লেখকদের ফাইল-ভরতি রচনার অনেকখানিই পড়া হয়ে যেত।'

বৈঠকের আরেক কোণ থেকে কে-একজন বলে উঠলেন—'আপনারা কি সব লেখা সম্পূর্ণ পড়ে ফেরত দেন?'

আমি বললাম—'অধিকাংশ নবীন লেখকের একটা প্রচলিত ধারণা আছে লেখা না পড়েই আমরা ফেরত দিই। একটা মজার ঘটনা বলি। কিছুদিন আগে ফুলস্ক্যাপ সাইজের দু-শ পাতার একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি লেখকের কাছে ফেরত যাবার পরই তিনি মারাত্মক অভিযোগ করে চিঠি লিখে জানালেন যে, সম্পাদকরা লেখা না পড়েই ফেরত দেন একথা তিনি বহুজনের কাছেই শুনেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও আস্থা ছিল বলে তাদের কথা অবিশ্বাস করেই তিনি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরত পেয়ে বন্ধুদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর আর সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা যে না পড়েই লেখাটি ফেরত দিয়েছি তার প্রমাণও তিনি হাতে-নাতে পেয়েছেন। পাণ্ডুলিপির ১১৫ পৃষ্ঠা থেকে ১২৫ পৃষ্ঠার একটি ধার তিনি কলে সেলাই করে দিয়েছিলেন এবং তা অক্ষত অবস্থাতেই আছে। এখন আপনারাই বুঝুন, সম্পাদককে বোকা বানাবার কত রকম ফন্দি।'

বৈঠকের অপর দিক থেকে প্রশ্নকর্তা আবার বললেন—'বুঝেছি। এ-অভিযোগ নিশ্চয় আর খণ্ডন করতে পারেন নি।'

আমি বললাম—'খণ্ডন না করলে কি আর পার পাবার যো ছিল। সুরসিক পণ্ডিত ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের বিখ্যাত উক্তিটা আপনাদের মনে আছে তো—"It is unnecessary to eat the whole ox to find out whether the beef is tough"; এই উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে সোজা বাংলায় তাঁকে লিখেছিলাম যে, হাঁড়ির একটা চাল টিপলেই বোঝা যায় সব ভাত গলাধঃকরণ সম্ভব কি না।'

আড্ডার রসিকচূড়ামণি মুখ ফসকে কাঁচা বাংলায় বলে ফেললেন—'অর্থাৎ লেজ উল্টে দেখে নেওয়া মাদি না মদ্দা।'

বৈঠকের তরুণ কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—'এটা কিন্তু ঠাট্টার বিষয় নয়। ভেবে দেখুন, নতুন লেখকরা কত যত্নে, কত আগ্রহ নিয়ে, কত আশা করে তাদের লেখা সম্পাদকের হাতে তুলে দিয়ে কী উৎকণ্ঠায় দিন কাটান। এ-যেন আদরের কন্যাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে বরের বাপের সামনে পাঠিয়ে দিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে-থাকা মায়ের উৎকণ্ঠার মত।'

কবিবন্ধু কথাটা কাব্যিক উপমা দিয়েই বললেন, এবং তা অগ্রাহ্য করবার মতও নয়। কিন্তু এর আরেকটা দিক আছে ভেবে দেখবার। নতুন লেখকদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে সম্পাদকরা না পড়েই লেখা ফেরত দেন, অথবা নতুন লেখকদের লেখার প্রতি তাদের আগ্রহ নেই। এই ভ্রান্ত ধারণাটা আমার মনে হয়, কোন কালেই এদের মন থেকে দূর করা যাবে না। কিন্তু এই সব লেখকরা পত্রিকার লেখক-সূচী যত্ন সহকারে অনুধাবন করলে দেখতে পাবেন নতুন লেখকদের লেখা কী পরিমাণ আগ্রহ নিয়ে আমরা খুঁজে বেড়াই। যে-কোন পত্রিকার জীবনী-শক্তিই হচ্ছে নতুন লেখকদের পাণ্ডুলিপি। তবে একথাও ঠিক, সম্পাদকরাও মানুষ। বিচারে ভুল-ভ্রান্তি তাদের ঘটতে পারে, ঘটেও থাকে। এক পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে কোন লেখা ফেরত গেলে মুষড়ে পড়বার কোন হেতু নেই। সেই লেখাই অন্য পত্রিকার সম্পাদক সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে একাধিক। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপি প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ফেরত দিয়েছিলেন এবং পরে যমুনা পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল তা সমাদরের সঙ্গেই পত্রস্থ করেন।

বৈঠকে আরেক প্রস্থ চা এসে গেল। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সবাই চাঙ্গা হয়ে উঠল। আমি আবার ফিরে গেলাম আমার প্রতীক্ষারত চিঠির মধ্যে। এক-একটি করে চিঠি খুলে চলেছি, বন্ধুরা ততক্ষণ গল্পগুজবে মত্ত। একটা চিঠির মধ্যে কৌতুককর এমন কিছু মন্তব্য ছিল যা পড়ে আমি হাসি সংবরণ করতে পারি নি। আমাকে হাসতে দেখে বৈঠকের সব্যসাচী সাহিত্যিক বলে উঠলেন—'একাই উপভোগ করছেন, আমরাও কি ভাগ পেতে পারি না?

দপ্তরে প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য-সরস্বতীর নবীন ভক্তদের কাছ থেকে পুরুতের কাছে যে-সব চিঠিপত্র আসে তা ছাপানো হলে পত্র-সাহিত্য একটি রীতিমত উপভোগ্য সামগ্রী হতে পারে। কিন্তু সম্পাদককে বাধ্য হয়েই এই সব পত্রাবলীর রস একা-একাই উপভোগ করতে হয়। সবাইকে ভাগ দিয়ে উপভোগের মস্ত অন্তরায় হচ্ছে, চিঠি নিতান্তই ব্যক্তিগত। সম্পাদক তা প্রকাশ করতে পারেন না, তেমন কাজ সাংবাদিকের নীতিগত বিশ্বস্ততার বিরোধী।

তবু যে-চিঠিটি আমি একাই পড়ে উপভোগ করছিলাম, বৈঠকের বন্ধুদের উপরোধে তা না শুনিয়ে পারলাম না। এই নীতিবিরুদ্ধ কাজের জন্য পত্রলেখকের কাছে পূর্বাহ্নেই মার্জনা ভিক্ষা চাই।

গার্ড ই. রেলওয়ে
রামপুরহাট

সবিনয় নিবেদন,

আপনার জবাবী পোস্টকার্ডের উত্তর পেয়ে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি, বেদনাও পাই নি কম। আপনি তবু ভদ্রতা করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দেন নি—এই যা আনন্দ। নইলে আর আনন্দ পাওয়ার মত কিছুই ছিল না আপনার মর্মবাণীতে।

মহিমান্বিত বিশাল "সাগরের" মতই আপনি উদার হৃদয় এই ভেবেই আমার আশাবাণী আপনার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলুম; কিন্তু আপনার উত্তর পাওয়ার পর এই সিদ্ধান্তেই শেষে পৌঁছুলাম যে, আপনি সাগর-শুকিয়ে-ওঠা দিগন্তপ্রসারী জ্বালাময়ী মরুপ্রান্তর ছাড়া আর কিছু নন। সাগরের মহিমা হারিয়ে আপনি নীরস বালুচর হয়ে রুদ্রাক্ষমূর্তি ধরেছেন। নামের

মহিমাই নেই আপনার মধ্যে। আপনার নাম মন্মথ ঘোষ হলে মন্দ হয় না, নয় কি?

রেলওয়েতে সামান্য 'গার্ডের' চাকরি করি জেনে এই ধারণাই যদি করে থাকেন যে, বাণীর আসন পাতা নেই আমার মনে-প্রাণে তাহলে নিশ্চয় করে বুঝব, আপনি চরম ভুল করেছেন একটা। আমি বাণীর একনিষ্ঠ সাধক এই কথাটাই আজ গর্বভরে আপনাকে জানালাম। আমার মধ্যে যে আগামী সম্ভাবনা ও প্রতিভার অঙ্কুর প্রকাশ পেতে চাইছে আলো-ঝলমল পৃথিবীতে, আপনার মত সাহিত্যসেবী যদি তাকে এতটুকু সাহায্য করে বাইরের রৌদ্রকরোজ্জ্বল সাহিত্য-জগতের মুখ না দেখান—তাহলে সেই শিশুচারা যে চিরকালের বুকে অজান্তেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উপযুক্ত প্রার্থিতকে বিফলমনোরথ করার একটা 'সাবকনশাস্' বেদনাবোধ আছেই, পরে হয়তো একদিন অনুভব করবেন জীবনের গোধূলিবেলায়। আপনার প্রত্যাখ্যান মানেই, আমার প্রতিভার শিশুচারাকে হাতের চেটোয় নির্মমভাবে পিষে ফেলা ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু আমার কেন, আমারই মত বহু আশাকামী সাহিত্যসেবীর প্রতিভাই অঙ্কুরে বিনাশ হয়ে গেছে আপনাদের মত প্রাণহীন বেদরদী সাহিত্যিকদের নির্মম উপেক্ষা আর তাচ্ছিল্যের চাপে। এতবড় জীবন-নাট্যের ট্র্যাজেডি আর কি আছে?

আপনি আমাকে 'সারমন' দিয়েছেন দুটো। একটা হল—উপস্থিত পত্রিকার স্থানাভাব। "দাঁতের মাজন", "লোমনাশক সাবান" আর "কুঁচ-তৈলের" বিজ্ঞাপনে বোঝাই পাতাগুলো দেখলে স্বাভাবিকভাবে আপনার এ 'সারমন' মাথা পেতে নিতে পারি না।

এ ছাড়াও দেখেছি, যে-সব সাধারণ মামুলী গল্পকে আপনারা অতি সহজে পাসপোর্ট দিয়ে দেন মুদ্রণের জন্য, আমার রচনা সেগুলোর চেয়ে নিকৃষ্ট কোনও মতেই নয়। ধন্য আপনাদের গুণবিচার।

ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি জেনে এসেছি যে 'সুপারিশ' 'তদ্বির' আর 'মামার জোর' না থাকলে চাকরি, ব্যবসা, সিনেমা ও থিয়েটার-জগতে স্থান পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনার মিষ্টি সুরের প্রত্যাখ্যানপত্র পাওয়ার পরে এও জানলাম যে বিদ্যাদেবীর রাজ্যেও উমেদারির প্রয়োজন আছে।

আপনার দ্বিতীয় 'সারমন' কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তববিরোধী। অনির্দিষ্ট কালের এক সময়ের গণ্ডি এঁকে দিয়েছেন আপনি আমার ভবিষ্যৎ বাসনার ওপর।

এ যে অসম্ভব। আপনি লিখেছেন, 'যদি কখনও পত্রিকার পাতার সংখ্যা বাড়ানো যায়, তখন যোগাযোগ স্থাপন করবেন।' ততদিন কি আমি এই ধূলার ধরণীতে টি'কে থাকব ? ইতি—

ভবদীয়

সাধনকুমার দাস

চিঠি পড়া হতেই বৈঠকের এক বন্ধু বললেন—'আজকালকার লেখকদের আপনারা কচি খোকা মনে করবেন না। যতই আপনারা 'স্থানাভাব' আর 'পৃষ্ঠা বৃদ্ধির' মামুলী যুক্তির মোয়া তাদের হাতে তুলে দেন না কেন, ভবী ভোলবার নয়।'

গাল্পিক বন্ধু বললেন—'এ তো তবু ভাল। জাপানে শুনেছি পত্রিকা-সম্পাদকরা বৈষ্ণব বিনয়ের এক-একটি অবতার। ছাপার অযোগ্য লেখা লেখককে যে চিঠি দিয়ে ফেরত দেন তা হচ্ছে—'আপনার লেখার মান এতই উচ্চস্তরের যে, এই লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পত্রিকার মানও উচ্চস্তরে উঠিয়া যাইবে। কিন্তু ইহার একটি বিপদ আছে। আপনার ন্যায় বিদগ্ধ মনস্বী লেখক আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় একজনও নাই। সুতরাং আপনার রচনা প্রকাশিত হইলে পত্রিকার মান যে-স্তরে উঠিবে সে-স্তর রক্ষা করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কা করিয়াই আপনার এই বহুমূল্যবান রচনা গভীর দুঃখের সহিত ফেরত পাঠাইলাম।'

আমি বললাম—'আমাদের দেশে তরুণ লেখকদের মনোনীত লেখা প্রত্যাখ্যান যত মোলায়েম ভাষাতেই করুন না কেন তারা বিক্ষুব্ধ হবেই। আগেই বলেছি, আপন সন্তানের মতই লেখার প্রতি লেখকদের অসীম মমতা, তাই এই বিক্ষোভ। এবং এই বিক্ষোভজনিত উষ্মাভরা চিঠি সম্পাদকের দপ্তরে প্রতিদিন আসে এবং তা সম্পাদককে নতমস্তকে শিরোধার্য করে নিতে হয়। এটা তাদের নিত্য প্রাপ্য। কিন্তু শিক্ষিত প্রবীণ লেখকেরা যে কত বেশী ছেলেমানুষি করে থাকেন, তার একটা নমুনা আপনাদের দিই।—

এই কলকাতারই কোন একটি বিখ্যাত ইংরিজী দৈনিক পত্রিকার এক সহকারী সম্পাদক গল্প-উপন্যাস লিখে থাকেন। একবার পূজা সংখ্যার জন্য একটি গল্প তিনি পাঠান। পূজা সংখ্যা প্রকাশের পূর্বে লেখকদের নামের

তালিকা প্রকাশিত হয়। তালিকা যে-দিন প্রকাশিত হয়েছে সেই দিনই দুপুরে আমার দপ্তরে ভদ্রলোকের আবির্ভাব। দেখতে রোগা এবং বেঁটে হলে কি হবে, কড়া-মেজাজী লোক। দরজার চৌকাঠ পার হয়েছেন কি হন নি—হাতের ইয়া-মোটা বেতের লাঠিটা ঠকাস্ ঠকাস্ করে মেঝেতে ঠুকতে ঠুকতে আমার দিকে বাক্যবাণ ছুঁড়তে লাগলেন—'তালিকায় আমার নাম নেই কেন?'

ধরেই নিয়েছেন তালিকা থেকে ওঁর নাম কখনই বাদ যেতে পারে না।

আবার গর্জন—'আমার লেখা আপনারা ছাপবেন কি ছাপবেন না, জানতে পারি কি?'

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার একটা লাইন মনে পড়ে গেল। 'এত ক্ষুদ্র যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়'। সভয়ে বললাম—'আজ্ঞে, জায়গা করতে পারি নি, তাছাড়া গল্পটা আকারেও—'

'ওসব ছেঁদো কথা শুনতে চাই না। লেখাটা ফেরত দিন।' ওঁর চেহারার আস্ফালন লাঠির আস্ফালনকেও ছাড়িয়ে যায়। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

তাড়াতাড়ি ফাইল থেকে লেখাটা বার করে এগিয়ে দিতেই ফস্ করে আমার হাত থেকে পাণ্ডুলিপিটা এক হ্যাঁচকায় কেড়ে নিয়ে বললেন—'এই বলে গেলুম। একদিন লেখার জন্য আপনাকে আমার বাড়িতে দু-বেলা হাঁটাহাঁটি করতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে বললাম—'আমিও প্রার্থনা করছি যেন সে-সৌভাগ্য আমার হয়।'

ঝড়ের বেগে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন, আমার কথাটা শুনতে পেলেন কি না জানি নে।

বৈঠকের সেই সব্যসাচী লেখক রস দিয়ে বললেন—'যা দিনকাল পড়েছে তাতে লেখা ছাপানোর এই পদ্ধতিটাই দেখছি প্রশস্ত। এক হাতে লাঠি, অপর হাতে লেখা, কোনটা চাই।'

আড্ডার গাল্পিক-লেখক বললেন—'ভদ্রলোকের ভবিষ্যদ্বাণীটা কি ফলেছে?'

আমি বললাম—'সেইটাই তো আমার আফসোস। আজ দশ বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি, তাঁর বাড়িতে দু-বেলা হাঁটাহাঁটির সুযোগ আজও আমি পেলাম না।'

আসরের তরুণ কবি-বন্ধু বললেন—'সাধনকুমার আর লাঠিধারী লেখকের নজির থেকে নিশ্চয় আমাদের এ-সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না যে, এ-ক্ষেত্রে সব নতুন লেখকেরাই সম্পাদকের শত্রু হয়ে ওঠেন।'

আমি টেবিলের সেই চিঠির বাণ্ডিল থেকে একটি পোস্টকার্ড বার করে দেখালাম। পত্রলেখককেও অক্ষমতা জানিয়ে রচনা ফেরত দেওয়া হয়েছিল। পত্রলেখক সম্পাদকের মনের কথাই এই চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন।

লোকপুর
বীরভূম

মহাশয়,

আপনার বিনীত উত্তরে কৃতজ্ঞ হলাম। আমার রচনাটি প্রকাশে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চেয়ে কিন্তু দুঃখ দিয়েছেন। আপনাদের পত্রিকা বাংলার সম্পদ। আমারও অংশ তাতে নিশ্চয় আছে। সাধারণ বস্তুতে কোষ-কলেবর স্ফীত না করে বিশেষ সম্ভারে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলাই তো কোষাধ্যক্ষের প্রকৃত কর্তব্য। তাতে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষোভ এলেও বৃহত্তর ব্যক্তি-সমাজ আনন্দই লাভ করবে।

স্থানকালে কথাটি উপদেশের মত শোনালেও বিশ্বাস করবেন আন্তরিকভাবেই বলছি। আপনাদের পত্রিকার সমৃদ্ধি আন্তরিকভাবে কামনা করে এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

ভবদীয়
দেবপ্রসাদ

সম্পাদকের দপ্তরে অধিকাংশ পত্রলেখক সপ্তমে সুর চড়িয়ে এই কৈফিয়ত তলব করেন যে, তাঁর মত একজন লেখকের লেখা যখন ছাপানো হয় নি তখন সম্পাদক মহাশয় যে নিতান্ত একজন অপদার্থ ব্যক্তি তা তিনি অনুগ্রহ করে সম্পাদককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। অপর একদল আছেন যাঁদের চিঠি সম্পাদকের স্তাবকতায় ভরা।

এই সব চিঠির এ-হেন রাগানুরাগের উদ্দেশ্য কী, সম্পাদকের অবশ্য তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। মনের কথাটা সহজেই তাঁরা বুঝে নিতে

পারেন—এবং সে-কথাটা হচ্ছে—পত্রলেখকরা সবাই চান তাঁর লেখা ছাপানো হক এবং উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গেই ছাপানো হক।

প্রস্তাব অবশ্য মন্দ নয়, অযৌক্তিকও নয়। পত্রিকায় লেখা ছাপানোর প্রয়োজন আছে, সুতরাং সে প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য গরজ দেখানোও দোষের কিছু নয়। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, সম্পাদক মহাশয়দের পক্ষে সব সময় এই গরজ অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় না, ফলে প্রতিদিন গাদা-গাদা লেখা ফেরত যায় এবং লেখকদের নিদারুণ মনঃক্ষোভের কারণ ঘটে।

বৈঠকের একজন প্রশ্ন করলেন—'কেন এমনটা হয়, এর কি কোন প্রতিকার নেই?'

সেইটাই বিবেচ্য। লেখা ছাপাবার প্রয়োজন আছে, এবং এও সত্য যে, সে-প্রয়োজন প্রতিপালন করা সম্পাদকের কর্তব্য। সম্পাদকরা যদি সে কর্তব্যে পরাম্মুখ হন, তবে তাঁদের উপর অভিযোগ করার কারণ নিশ্চয় থাকে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই কর্তব্য প্রতিপালন করার অভিযোগ তাঁদের উপর বাস্তবিক করা যায় কি না অনেকে তা বুঝে উঠতে পারেন না, ফলে সম্পাদকের উপর 'অবিচারের' একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে বসেন।

লেখা ছাপানোর প্রয়োজন সত্যিই আছে, দশজনের চোখে সেগুলি পড়ে এবং তাতে কাজ হয়; কিন্তু এই কাজের দিকটা হাসিল করাই যদি সব লেখার উদ্দেশ্য হত, অন্তত শুধু সেইটুকুর উপর জোর দেওয়া হত, তবে সমস্যা বিশেষ কিছু ছিল না। পত্রিকায় লেখা ছাপানোর মূলে একটা উদ্দেশ্য থাকে সেটা আর কিছুই নয়, নিজের নামটা জাহির করা, যশ বা খ্যাতির আকর্ষণ। যশ বা খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা কারও থাকে থাকুক, সম্পাদকের তা খতিয়ে দেখার আবশ্যক ততটা থাকে না; তাঁদের দ্রষ্টব্য হল পাঠকদের মনের ক্ষুধা মিটছে কিনা। কোন লেখকের লেখা যদি পাঠকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তবে সে-লেখার সূত্রে লেখক যশ বা খ্যাতি পান ভালই। তাতে পত্রিকারও যশ বা খ্যাতি বাড়ে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে নিছক অযোগ্যকে তোল্লা দেওয়া সম্পাদকের কর্তব্য নয়, সে-লেখক যিনিই হন এবং যত বড় মেকদারের লোকই হন না কেন। সাহিত্যের কমলবনে এই সব মেকদার হস্তীর উৎপাত মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। নিজের নাম বা যশকে বড় করে দেখিয়ে সম্পাদকদের

চাটুকারিতা করা যেমনই অবান্তর বা অনাবশ্যক, তেমনই তাঁদের হুমকি দেখানও হাস্যকর। এক্ষেত্রে সম্পাদকরা নিন্দা-স্তুতিতে সমান নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য, বাধ্য কর্ত্তব্য-প্রতিপালনেরই দায়িত্বে।

বৈঠকের পেট-রোগা সব্যসাচী সাহিত্যিক খোঁচা দিয়ে বললেন—'সম্পাদকদের হয়ে ওকালতি করতে গিয়ে খুব যে লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লেন। না হয় মানলুম পাঠকদের কথা ভেবেই আপনারা কর্তব্য পালন করে থাকেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনগুলি কি পাঠকদের চক্ষুশূল নয়? আর লেখকরাই বা কেন মনে করবেন না যে, বিজ্ঞাপনগুলো হচ্ছে দেবী সরস্বতীর পূজামণ্ডপের চাঁদমালা আর লেখকদের রচনা হচ্ছে সেই চাঁদমালা ঝোলানোর সুতো। রামপুরহাটের সেই পত্রলেখকের অভিযোগ কি নিতান্তই মিথ্যে?'

'একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন, বিজ্ঞাপন হচ্ছে যে-কোন পত্রিকার মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডের জোর না থাকলে সব পত্রিকাকেই খুঁড়িয়ে চলতে হয়, অবশেষে অকালেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। বিজ্ঞাপনই হচ্ছে প্রদীপের সলতে। যতই তেল ঢালুন বা পাতার পর পাতা সারগর্ভ রচনা দিয়ে ভরাট করুন, সলতে না থাকলে আলো জ্বলবে কেন? অনেকেই এটা বোঝেন না যে, শুধু সাহিত্যের মহান আদর্শ নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে না বাঁচে পত্রিকা, না টেঁকে আদর্শ। আদর্শ নিশ্চয় থাকবে কিন্তু সেই সঙ্গে চাই সমপরিমাণ ব্যবসা বুদ্ধি। যে-পত্রিকার পরিচালক এ-দুয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পেরেছেন তাঁদেরই পত্রিকা আজ মর্যাদা আর প্রতিষ্ঠা দুইই লাভ করেছে। তা ছাড়া কাগজের এই দুর্মূল্যের বাজারে গ্রাহকদের কাছ থেকে যে চাঁদা পাওয়া যায় তাতে কাগজের দামই ওঠে না। তার উপর আছে কম্পোজ, ছাপা, বাঁধাই, কর্মীদের বেতন এবং সর্বোপরি লেখকদের সম্মান-মূল্য। বিজ্ঞাপন না হলে এ-খরচটাই বা আসবে কোথা থেকে? নিছক আদর্শের জন্য ঘরের-খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে একাধিক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকা বাংলা দেশ থেকে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে—তার নজির খুঁজতে বেশীদূর যেতে হবে না। আমার মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা এই কারণেই বেশীদিন চালাতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' ও 'ভারতী' পত্রিকার অচিরে বিলুপ্তি এই একই কারণে। আর রবীন্দ্রনাথের সর্বাত্মক পোষকতা সত্ত্বেও ডাকসাইটে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে কী আক্ষেপের সঙ্গে 'সবুজপত্র' বন্ধ করতে হয়েছিল

সে তো হালফিলের ঘটনা, আপনাদের অজানা নয়। জমিদারির আয় যখন কমে গেল 'সবুজপত্র'র পাতাও ক্রমে হলদে হয়ে একদিন ঝরে পড়ল। পরবর্তী যুগে যাঁরাই সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করেছেন তাঁরা পূর্ব-সূরীদের এই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রদীপের সলতের দিকে নজর রেখেছিলেন বলেই সে-পত্রিকা আজও সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ পাঠক এই দিকটা বিবেচনা করেন না, তাই অকারণে পত্রিকার পরিচালক বা সম্পাকের উপর দোষারোপ করে থাকেন।'

সাহিত্যে সব কারবারের কারবারী সব্যসাচী লেখক বললেন—

'আপনার এই যুক্তি সম্পূর্ণ মেনে নিতে না পারলেও এটুকু স্বীকার করবই যে, আগেকার দিনে সাহিত্যিকরা লিখতেন প্রাণের তাগিদে, প্রতিদানে পেতেন যশ ও খ্যাতি। তাঁরা ছিলেন তাতেই সন্তুষ্ট। আজকের দিনে জীবনের মূল্যবোধ গেছে পালটে। যশ ও খ্যাতির বিচার হয় টাকায়, জীবনের মূল্যায়ন হয় কাঞ্চনমূল্যে। সেদিক দিয়ে আজকের লেখকরা লাভবান। প্রাণের তাগিদকে শিকেয় তুলে রেখে টাকার তাগিদেই লেখেন, সাহিত্যপদবাচ্য হক আর না হক। এই সব লেখক সবচেয়ে বেশী আস্কারা পান পত্রিকা-সম্পাদক আর পুস্তক প্রকাশকদের কাছে।'

আমি বললাম—'এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। আমি বলব, পাঠকরা কেন এই লেখা হুমড়ি খেয়ে পড়েন। আপনি বলবেন সম্পাদক-প্রকাশকরা কেন এ সব লেখা ছাপেন। এর কোন মীমাংসা নেই—এ হচ্ছে ভিশ্যাস্ সার্কল্।'

আমাদের গাল্পিক বন্ধু এতক্ষণে মুখ খুললেন—'তাহলে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন বিকেলে কলেজ স্ট্রীটে আমার বইয়ের প্রকাশকের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছি, এমন সময় এক যুবক কাউণ্টারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনাদের কাছে পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাবে?'

দোকানের মালিক বললেন—'আপনি ভুল করেছেন, আমরা টেক্সট্ বুক ছাপাই না।'

উত্তরে যুবক বললেন—'তা জানি। বইয়ের বাজার তো অপাঠ্য পুস্তকে ছেয়ে গিয়েছে। আমি তাই কিছু পাঠ্যপুস্তক খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

আমি বললাম—'ভদ্রলোক খাঁটি কথাই বলেছেন। বই বাছতে গুদাম উজাড়। শান্তিনিকেতনে আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই জগদানন্দ

রায়কে আপনারা সবাই চেনেন। ছেলেদের জন্য বিজ্ঞানের বই লিখে যিনি স্বনামধন্য। তাঁর একমাত্র ছেলে ত্রিগুণানন্দ রায়, ডাক নাম পটল। স্কুলে কলেজে খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন, যৌবনে ভাল চাকরিও করতেন। সেই আমাদের পটলদা হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন। একদিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুরে দেখি পটলদা মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ি বেঁধে তার উপর বীরভূমী তালপাতার একটা টোকা চাপিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। গায়ে গরম কোট, হাতে একটা লণ্ঠন এবং লণ্ঠনটি জ্বলছে। ওঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল—'কি পটলদা, দুপুর বেলায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে কোথায় চললেন ?'

গম্ভীর হয়ে পটলদা শুধু বললেন, 'মানুষ খুঁজতে।'

বৈঠকের এক দর্শনিক কবি বলে উঠলেন—'আহা হা, কী খাঁটি কথা। দেশ যেখানে অমানুষে অন্ধকার সেখানে আলো জ্বালিয়ে খাঁটি মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছেন। আপনাদের পটলদাকে পাগল বলছেন কি মশাই, এ-তো হাই ফিলসফি। গগন হরকরার সেই বিখ্যাত বাউল গানটা মনে পড়ে গেল—

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দিশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

সব্যসাচী লেখক দার্শনিক কবিকে থামিয়ে দিয়ে টিপ্পনী কেটে বললেন —'মানুষ নিয়ে দর্শনশাস্ত্র আওড়ানো এখন থাক। আমাদের কথা হচ্ছিল লেখক নিয়ে। ফকিরের গানটায় 'মানুষ'-এর জায়গায় 'লেখক' বসিয়ে দিন— আমাদের আজকের অলোচনার মোদ্দা কথাটা সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে এবং বই-খুঁজতে-আসা সেই যুবকের প্রশ্নের হেঁয়ালিটাও জলবৎ তরল হয়ে যাবে।'

তরুণ কবি বলেলেন—'বিষয়টা কিন্তু সত্যিই চিন্তা করবার। আপনার পটলদা দিনের আলোয় লণ্ঠন জ্বেলে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, বই পাড়ার সেই যুবক খুঁজে বেড়াচ্ছেন পাঠ্যপুস্তক আর সম্পাদকরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন মনের মত লেখক। কিন্তু এ-খোঁজার কি শেষ আছে ?'

এবার গাল্পিক লেখক বললেন—'যে কথা দিয়ে আজকের আলোচনা শুরু

হয়েছিল তাই চলুক। আপনারা বড় বাজে কথায় চলে যাচ্ছেন, কাজের কথায় আসুন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সম্পাদকের দপ্তরে যে-সব বিক্ষোভপূর্ণ চিঠিপত্র আসে তাদের প্রধান অভিযোগটা কী?'

আমি বললাম—'প্রধান অভিযোগ যা, তা তো আপনারা রামপুরহাটের চিঠিতেই পেলেন। 'তদ্বির', 'মামার জোর' না থাকলে সম্পাদকরা লেখা ছাপেন না। সম্পাদকের বিরুদ্ধে, প্রধানত সাময়িক-সাহিত্য এবং চিরন্তন সাহিত্য এই দুই রকম মাল নিয়ে একসঙ্গে যাদের কারবার, কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে সম্পাদকরা বাইরে থেকে ভাল লেখা পেলেও ছাপেন না। তাঁদের একটা জোট-বাঁধা দল আছে, শুধু সেই লেখকদের লেখাই তাঁদের আদর পায়। এই অভিযোগ যে কতটা ভিত্তিহীন, পত্রিকার সংশ্রবে যাঁরাই এসেছেন তাঁরা ভালভাবেই জানেন। ভাল লেখা যে পাওয়া কত দুর্ঘট, বাইরে যাঁরা থাকেন, তাঁরা সে খবর রাখেন না। এমন অবস্থায় ভাল লেখা পেলেই সম্পাদকরা সেগুলি অনাদর করবেন, একি সম্ভব? পত্রিকা পরিচালনার অন্য আদর্শ বা সে সম্বন্ধে সম্পাদকের কর্তব্যের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া যায়, তা হলেও এ-যুক্তি টেকে না। সম্পাদকরা বেশ জানেন, ভাল লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করলে, তাঁদের কাগজের আদর বাড়বে, প্রচার এবং প্রসার হবে, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনও বাড়বে। অন্য কথায় ব্যবসার অর্থাৎ পয়সা আসবার পথ বেশী প্রশস্ত হবে। দলের খাতির যোগাতে গিয়ে ভাল লেখাগুলিকে বাদ দিয়ে যে-সব লেখা খারাপ সেগুলিকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ তাঁদের নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা। এমন বিচার নিয়ে চলতে গেলে নিজেদের কাগজের অন্তেষ্টিক্রিয়ার দিনটা আগে নির্দিষ্ট করে নিতে হয়। সত্যিই কোন কাগজের যদি নিজেদের কোনো সাহিত্যিক দল থাকে তবে সে-দলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যতই বড় বড় কথা শোনা যাক না কেন, আসলে হল স্বার্থ, অর্থাৎ ভাল লেখা পাবার ব্যবস্থা করা। খাতিরে লেখা ছাপানো কালে ভদ্রে চলতে পারে, কিন্তু দলের খাতিরে কারো মন্দ লেখা বরাবর চালানো যায় না। কারণ স্বার্থের দিক থেকেই তা' ক্ষতিকর। বাইরে থেকে যদি কারও ভাল লেখা পাওয়া যায় তাহলে সম্পাদকরাই তাঁকে দলে টেনে আনবার জন্য তৎপর হয়ে পড়বেন এবং সেইটিই ঘটে থাকে।

'সম্পাদকের কাছে তরুণ লেখকরা হামেশাই অনুরোধ করে থাকেন তাঁদের

লেখা কাঁচা হলেও তা প্রকাশ করে উৎসাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু নীতির দিক থেকে সম্পাদকেরপক্ষে এমন অনুরোধ রক্ষা করা কঠিন। কারণ, সম্পাদকরা যাঁদের নুন খান, সোজা কথায় যারা তাঁদের গ্রাহক, তাঁদের প্রতি কর্তব্য কিভাবে প্রতিপালিত হয়—সেটিই তাঁদের প্রধান বিবেচ্য। ছাপানোর মূলে ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদকের মহৎ উদ্দেশ্য যতই থাকুক না কেন, গ্রাহকেরা সে ধার ধারবেন না। অনেক সময় সম্পাদকের কাছে এমন অনুরোধ আসে যে আর্থিক অনটনে জীবন দুর্বিসহ, লেখাগুলি ছেপে দিলে বিপদে উপকার হয়। এক্ষেত্রে সম্পাদকের ব্যক্তিগতভাবে সৎপ্রবৃত্তি বা সাধু উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য গ্রাহকদের খারাপ জিনিস দেওয়া সঙ্গত হতে পারে না। সম্পাদকরা সব সময় ভাল লেখাই দিয়ে থাকেন এমন কথা জোর দিয়ে আমি বলতে চাই না। তবে তাঁরা চেষ্টা করেন সব সময় যতটা সম্ভব ভাল লেখা দিতে।

'তরুণ লেখকদের একটা কথা জানা উচিত যে, সাহিত্যভারতীর মন্দিরের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। অনেক তিতিক্ষা, অনেক প্রতীক্ষা, অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন সে-মন্দিরের পূজা-মণ্ডপে উপস্থিত হতে। অন্তরে জ্বালা নিয়েই এ-পথে এগিয়ে আসতে হবে, আঘাতে হতোদ্যম হলে চলবে না। লিখে যাওয়া উচিত, এবং সে লেখা সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে যাওয়াও উচিত ফলের আশা ত্যাগ করেই। এই ভাবেই একদিন কাঁচা লেখা পাকা হবে, সম্পাদকরা তখন আগ্রহের সঙ্গেই সে-লেখা প্রকাশ করবেন। এমনি করেই তাঁরাও একদিন সম্পাদকের গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পড়বেন।'

আমার কথাও ফুরল, আসরের শেষ চক্কর চা-ও এসে গেল। কথায় কথায় রাত হয়ে এসেছে, সবারই উঠি-উঠি ভাব। টেবিলের উপর একরাশ খোলা চিঠি। চিঠিগুলি এতক্ষণ তাদের অনুরোধ উপরোধ রাগ অনুরাগ উষ্মা আর হতাশা নিয়ে আমার কাছে কলরব করে উঠেছিল, এখন তারা শান্ত স্তব্ধ নীরব। এরা কি চিরকালের মত আমার কাছে নীরব থেকে যাবে? আমি আশাবাদী তাই আমি জানি যে, এদের মধ্যেই কোন-কোন লেখক একদিন কথা বলবে এবং সে-কথা সম্পাদকের দপ্তর ছাপিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হবে। সেই অনাগত পথিকের পদধ্বনি শুনবার জন্যই আমি কান পেতে আছি।

॥ ১০ ॥

শারদীয়া সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনার অবসান হল। শেষ ফর্মার প্রিন্ট অর্ডার দেওয়া হয়ে গেলে প্রিন্টার এসে বলেছিলেন—যান, এবার গঙ্গাস্নান করুন। কিন্তু গঙ্গাস্নানেও কি মুক্তি আছে? পত্রিকা প্রকাশের পরেও হাজার ঝামেলা। লেখকদের কাছ থেকে টেলিফোনে অনবরত তাগাদা আসছে—কী মশাই, বাজারে পত্রিকা বেরুলো, আমরা পাচ্ছি কখন? পিয়ন দিয়ে পাঠাবেন না, পেতে দেরিও হয়, খোয়াও যায়। নিজেই গিয়ে নিয়ে আসব।

দেড় মাস ধরে খাটাখাটুনির পর কোথায় একটু বায়োস্কোপ থিয়েটার দেখে চিত্তবিনোদন করব, তা নয়, ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে হবে কখন কে আসবেন পত্রিকা নিতে।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হল। টেলিফোন বেজে উঠতেই রিসিভার তুলেছি, দূরভাষী বন্ধুর পরিচিত কণ্ঠস্বর, ম্লান করুণ গম্ভীর।

'হ্যালো!'

'বলুন, কাকে চাই?'

'আপনাকেই দরকার। আমার গল্পটা দিতে পারলেন না?'

'চেষ্টা খুবই করেছিলাম। আপনি তো নিজেই দেখে গিয়েছিলেন আপনার গল্পের ছবি প্রুফ সবই তৈরী ছিল।'

'সেই দেখেই তো নিশ্চিন্ত ছিলাম যে গল্পটা নিশ্চয় প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের তালিকায় নাম না দেখেও হতাশ হই নি, কারণ ইতিপূর্বে একাধিক-বার বিজ্ঞাপনের তালিকায় নাম না থাকলেও লেখা প্রকাশিত হয়েছে। শুধু আমারই নয়, আরও অনেকের। তাই আজ আপনাদের পত্রিকা প্রকাশিত হতেই অফিস যাবার পথে এসপ্ল্যানেডের স্টল-এ পত্রিকা নেড়েচেড়ে দেখলাম আমার গল্প নেই। অফিস যাওয়া হল না। কাছেই একটা দোকান থেকে টেলিফোন করছি।'

'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। কিন্তু এই জন্যে আপনি অফিসে গেলেন না?'

'কি করে যাই বলুন। অফিসের সবাইকে বলেছিলাম আপনাদের কাগজেই এবার আমার সবচেয়ে ভাল গল্পটা বেরোচ্ছে।'

'ছি ছি, আমি খুবই লজ্জিত। আপনি আগে থেকেই সবাইকে না বললেই ভাল হত। জানেন তো অনেক অনিশ্চয়তা নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়।'

'তা জানি। তবু মনে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সত্যি করে বলুন, গল্পটা কি আপনার পছন্দ হয় নি ?'

'আরে না না, তা কেন হবে ? তা ছাড়া আমার পছন্দ-অপছন্দয় কী যায়-আসে। আপনারা বহুদিন ধরেই লিখছেন, এবং লেখার মধ্যে দিয়ে আপনারা নিজেদের পাঠকও সৃষ্টি করে নিয়েছেন। এখন সম্পাদকের দপ্তর ছাপিয়ে দায়িত্বটা পাঠকদের কাছেই বেশী। আপনার গল্পর ভাল-মন্দর বিচারক আজ তারাই।'

'সেইজন্যেই তো আপনার পত্রিকায় লেখা দিতে হলে অনেক ভেবেচিন্তে লিখতে হয়। যতক্ষণ না লেখা সম্বন্ধে নিজে নিঃসন্দেহ হতে পারছি ততক্ষণ আপনার কাগজে লেখা পাঠাতে ভরসা পাই না। আপনার পত্রিকার পাঠকরা যে কড়া বিচারক তা আমরা সবাই জানি। তবু আমার লেখা সম্পর্কে এ-অঘটন কেন ঘটল সে-প্রশ্ন মন থেকে কিছুতেই দূর হচ্ছে না।'

'তাহলে আসল কারণটা আপনাকে খুলেই বলি। আমাদের সাহিত্য সম্রাট শেষ মুহূর্তে খবর পাঠালেন যে তিনি পূজা সংখ্যার জন্য গল্প লেখায় হাত দিয়েছেন, সুতরাং তার জন্য যেন জায়গা রাখা হয়। কতখানি জায়গা রাখতে হবে জানতে চাইলে বললেন যে, গল্প ছোটই হবে, ছ-পাতা জায়গা রাখলেই চলবে। সম্রাটের কথা তো, তাঁর ছোট গল্প মানেই বড় গল্প, বড় গল্প মানে উপন্যাস, উপন্যাস মানে আরেকটি মহাভারত। ছ-পাতার পরিবর্তে বারো পাতা জায়গা রেখেছিলাম। কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখেছেন, সে গল্প উনিশ পাতায় এসে ঠেকল। তখন উপায় ?'

টেলিফোনে আমার সাহিত্যিক বন্ধু বললেন—'বুঝেছি। অর্থাৎ আপনি বলতে চান। বড় গল্পটি কয়েকটি ছোট গল্পকে তাড়িয়ে জায়গার জবর দখল নিয়েছে।'

হতাশার সুরে আবার বললেন—'আমার দুর্ভাগ্য, কোপটা পড়ল আমারই উপর।'

'তার জন্য আমিই অপরাধী, সাহিত্য সম্রাটকে দোষ দেবেন না। এ-ক্ষেত্রে একজন না একজন বাদ পড়তই। আপনার লেখা বাদ দিলাম এই ভেবে যে আপনার সঙ্গে তো আমার শুধু লেখক-সম্পাদক সম্পর্ক নয়। আমার তাই এই বিশ্বাসটুকু আছে যে আপনি অন্তত আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'ভুল আমি বুঝি নি। আমার দুঃখের আসল কারণটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি। আমার শালী আমার গল্পের একজন অনুরাগী পাঠিকা। তাকে বলেছিলাম গল্পটা আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। তার কাছে আমার মুখরক্ষা হল না, সেইটিই আমার দুঃখ।'

এ কথা শোনার পর স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এর পর কিছু বলা যায় না অথচ কিছু বলতেই হয়। অন্তত সহানুভূতির সঙ্গে দু-চারটি কথা। মানুষের দুর্বলতা কত রকমের থাকে। টেলিফোনে কিছু একটা বলব বলে প্রস্তুত হচ্ছি, ওপার থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে কথা ভেসে আসে—'আর আপনাকে বিরক্ত করব না, নমস্কার।'

টেলিফোন ছেড়ে দিলেন। বিমর্ষ মন নিয়ে বসে আছি। একে একে পূজা সংখ্যার লেখকদের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। লেখকদের পরস্পরের মধ্যে এক প্রশ্ন—এবারে কে কটা গল্প লিখেছেন। কোয়ালিটির চেয়ে কোয়ান্টিটিই যেন এযুগে শ্রেষ্ঠতার মাপকাঠি। পুজোর বাজারে কে কতগুলি গল্প লিখেছেন সেইটিই নাকি আজকের দিনে জনপ্রিয়তার কষ্টি-পাথর।

বৈঠকের গাল্পিক বন্ধু বললেন—'কাল সন্ধ্যায় হাজরার মোড়ের কাগজের স্টল-এ পূজা সংখ্যা পত্রিকাগুলি উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। যে-কাগজ খুলি তাতেই দেখি আমাদের নরেন্দ্রনাথ মিত্র। আমাদের পাড়ার সংহতি সংঘের সার্বজনীন পূজার উৎসাহী ছেলেরা আজ সকালে এসেছিল পত্রিকা দিতে। পাড়ায় যারা চাঁদা দেয় তাদের নামের তালিকা ছাপানোই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে সাহিত্যযশঃপ্রার্থী পাড়ার কিছু কিছু ছেলে তাদের গল্প কবিতাও প্রকাশ করে। কাগজটা খুলে দেখি সেখানেও নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ভদ্রলোক থাকে এণ্টালী, চেতলা সংহতি সংঘের সার্বজনীন পূজা-পত্রিকায় তাঁর লেখা।'

বন্ধু যে রকম ভীত শঙ্কিত চোখে কথাটা বললেন সবাই না হেসে থাকতে পারি নি। সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল শৈশবে সুকুমার রায় সম্পাদিত

'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতার কথা। কবিতার লাইনগুলি মনে নেই, ভাবার্থ হচ্ছে একটি ছেলে সুন্দরবনে তার মামাবাড়িতে প্রথম বেড়াতে গেছে। সে-দেশে সর্বত্রই সাপ। রাত্রে যে-ঘরে তাকে শুতে দিয়েছিল তার যেদিকে তার চোখ পড়ে সেখানেই দেখে সাপ। চৌকাঠে সাপ, কড়িকাঠে সাপ, মশারির দড়িতে সাপ, মশারির উপরে সাপ, খাটের তলায় সাপ। এই দেখে-দেখে ভয়ে আতঙ্কে পাশবালিশটি আঁকড়ে ধরে চোখ বুজতে যাবে, তখন পাশ বালিশটা ছুঁয়েই দেখে মস্ত একটা সাপ।

কবি-বন্ধু বললেন—'আমার কাছে এটা একটা বিস্ময়ের বিষয় যে দশটা-পাঁচটা চাকরি করে নরেনদা এত লেখেন কী করে?'

আড্ডার সব্যসাচী লেখক বললেন—'এইমাত্র আপনাদের অফিসের সামনেই নরেনবাবুর ভাই ধীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা। দাদার সংবাদ জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, তিনি নাকি এখনও ঘাড় গুঁজে লিখে চলেছেন এবং অষ্টমীর দিন পর্যন্ত নাকি তাঁর বায়না আছে।'

গাল্পিক বন্ধু বললেন—'যাক, তাহলে এমন পত্রিকাও আছে যার পূজা-সংখ্যা দুর্গা পূজায় না বেরিয়ে কালীপূজায় বোরোয়।'

সব্যসাচী লেখক বললেন—'পূজা-সংখ্যার সময়টা ইদানীং অনেকখানি ব্যাপক হয়ে পড়েছে। এদিকে জগন্নাথের রথ ওদিকে কালী পূজা।'

আলোচনা যখন এতদূর এগিয়েছে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমাদের ঘরে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বৈঠকে তখন কথার তুবড়ি ছুটছিল, ঠাণ্ডা জল পড়তেই তা-যেন হুস্ করে নিবে গেল।

'দূরভাষিণী'র স্বল্পভাষী লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র কথা বলেন এত আস্তে যে কান পেতে শুনতে হয়। বোধ হয় কম কথা বলেন বলেই তাঁর কলমে গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলি এত মুখর হয়ে ওঠে। কম কথা বলে বেশী লেখার শক্তি অর্জন করতে দেখেছি নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে। এর ঠিক বিপরীত উদাহরণ হচ্ছে আমাদের সৈয়দদা, ডকটর সৈয়দ মুজতবা আলী। শতং বদ মা লিখ—পূর্বাচার্যদের এই আপ্তবাক্যটি তাঁর জীবনের বীজমন্ত্র। ইদানীং চাপে পড়ে ছিটে-ফোঁটা কিছু লিখেছেন। রাজশেখর বসুর পরে বাংলা সাহিত্যে রসের স্রোত বইয়ে দিতে এঁর জুড়ি নেই। এঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইনি যতটুকু লিখেছেন, পড়েছেন তার শতগুণ এবং গল্প বলেছেন সহস্রগুণ। বাংলা সাহিত্যের এই জনসনের কোন বস্ওয়েল বন্ধু নেই, এইটিই

আক্ষেপের বিষয়। সৈয়দদার গল্প অনেক বলবার আছে, বারান্তরে বলবও। এখন ফিরে আসি নরেনবাবুর কথায়। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র টগ্‌বগানো ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়ার নিস্তব্ধতা দেখে নরেনবাবু বললেন—'কী ব্যাপার, বাইরে থেকে ঘরে আলোচনার জোর শোরগোল শুনেছিলাম, আমি যেন সে-আলোচনায় বাধা দিলাম বলে মনে হচ্ছে ?'

সবাই এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে আমিই অবশেষে বললাম—'এই, আপনার কথাই এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। কথা হচ্ছিল, এবার পূজা-সংখ্যায় কে ক-টা গল্প লিখেছে। তাতে বৈঠকের বন্ধুরা একবাক্যে রায় দিলেন যে এবারে গল্প সবচেয়ে বেশী লিখেছেন আপনি এবং অষ্টমীর দিন পর্যন্ত আপনার লেখার বায়না আছে।'

কথাটা বলতেই নরেনবাবু যেন খানিকটা মুষড়ে পড়লেন। উত্তরে কিছু একটা বলবার জন্য দম নিলেন, কিছু একটা বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট ধ্বনিও বেরুলো, কিন্তু থেমে গেলেন। কথার পরিবর্তে বেরিয়ে এল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস।

এবারে সত্যিই আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। বৈঠকের অন্যান্যদের চোখে-মুখেও একটা লজ্জা ও সংকোচের ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। নরেনবাবু কি ঘরে ঢোকবার আগে আমাদের আলোচনা বাইরে থেকে শুনতে পেয়েছেন ? নরেনবাবু আমাদের সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় লেখক। শুধু তাই নয়, এই নিরহঙ্কার নিরভিমানী সরল মানুষটিকে আমরা সবাই ভালবাসি, আর সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনন্যমনা নিষ্ঠা আর সাহিত্যবোধের প্রতি অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে। তাঁর মনে কোনরকম আঘাত দেওয়া আমরা তো কল্পনাই করতে পারি না। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে আমি বললাম—'দেখুন নরেনবাবু, আমার কথাটা যদি আপনার কাছে অপ্রিয় বলে মনে হয়ে থাকে তারজন্য আমি ক্ষমা চাইছি।'

এবারে নরেনবাবুর মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি একটু থেমে, আমতা-আমতা করে বললেন—'আমার দুঃখটা কি জানেন ? নারায়ণ এবারও আমার চেয়ে বেশী লিখেছে। আমি লিখেছি উনিশটা গল্প, ও লিখেছে তেইশটা। তাছাড়া খবর নিয়ে জানলাম ওর বায়না আছে বিসর্জনের দিন পর্যন্ত।'

বৈঠকের সব্যসাচী লেখক বললেন—'নারায়ণ গাঙ্গুলী তো আপনার বাল্যবন্ধু এবং অভিন্নহৃদয় বন্ধু। আপনাদের দুজনের প্রতিযোগিতায় আমরা, যারা এই মরসুমে দু-চারটে লিখে থাকি, তাদের অবস্থাটা বুঝুন। আপনাদের দুই বন্ধুর নামের নামাবলীতে সব পত্রিকার অঙ্গ আর তার বিজ্ঞাপন মোড়া। আমাদের নাম পাঠকরা আর মনে রাখবে কেন?'

নরেনবাবু এবার যেন কণ্ঠে একটু উত্তেজনা ঢেলে বললেন—'এই প্রতিযোগিতায় নামানোর জন্য আপনারাই দায়ী। প্রত্যেক বছর আপনারা আমাকে এই নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। বলেছেন, যত বেশী গল্পই লিখি না কেন, নারানকে ছাড়াতে পারব না। আমি তাই এবার কোন কাগজকেই ফিরিয়ে দিই নি। কলকাতা মফস্বল যে-কোন জায়গার যে কোন কাগজের সম্পাদক এসে লেখা চাইতেই কথা দিয়েছি এবং কথা রেখেওছি। এত করেও নারানকে ছাড়াতে পারলাম না।'

বৈঠকের তরুণ কবি নরেনবাবুকে সান্তনা দেওয়ার সুরে বললেন—'দেখুন নরেনদা, নারানদার সঙ্গে এই কম্পিটিশনে আপনার নামাই উচিত হয় নি। নারানদা হচ্ছেন প্রলিফিক রাইটার আর আপনি হচ্ছেন প্রটেকটিভ রাইটার। যতই যা-কিছু লিখুন, আত্মরক্ষা করেই আপনি লেখেন। অর্থাৎ সমালোচকরা হয়তো বলবে আপনি ইচ্ছা করলে আরও ভাল লিখতে পারতেন। কিন্তু এ কথা তারা কখনই বলবে না যে আপনি বাজে লিখেছেন।'

সব্যসাচী লেখক বললেন—'নারায়ণবাবু ঘটনাবহুল গল্প লিখতেই বেশী ভালবাসেন বলেই তাঁর গল্পের গতি দ্রুত। আপনি লেখেন মনস্তত্ত্বমূলক গল্প, তাই অতি সন্তর্পণে আপনার চলা।'

আমি বললাম—'আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে যাকে বলে দ্রুত খেয়াল, নারায়ণ-বাবুর লেখা হচ্ছে তাই। দুন থেকে চৌদুনে তার গতি। নরেনবাবুর লেখার চালটা হচ্ছে ঢিমা-লয়ের খেয়াল, রাগের বিস্তার দেখানোই যার উদ্দেশ্য।'

নরেনবাবু এবারে সলজ্জ জড়িতকণ্ঠে বললেন—'আচ্ছা, আপনারা আজ আমাকে নিয়ে পড়লেন কেন বলুন তো?'

আমার গাল্পিক বন্ধু বললেন—'পূজা-সংখ্যা বেরিয়ে গেলে শহরসুদ্ধ লোকের মুখে আপনার কথা। যত বেশী গল্পই আপনি লিখুন, একথা কেউই অস্বীকার করবে না যে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড আপনি সব লেখাতেই বজায় রাখেন। এ ক্ষমতা খুব কম লেখকেরই থাকে।'

নরেনবাবুর চেহারার দিকে লক্ষ্য করলাম। কম কথার এই ছোট-খাটো মানুষটি লজ্জায় যেন টেবিলের তলায় ঢুকে পড়তে পারলে বাঁচেন।

তরুণ কবি বললেন—'নারানদার গল্প পাঠকদের দৌড় করায় এবং একেবারে উর্ধ্বশ্বাসে। আর নরেনদা? পাঠকদের হাত ধরে ধীর পদক্ষেপ গহন অরণ্যের মাঝে এনে বলেন—কান পেতে শোন বনমর্মর আর কত বিচিত্র পাখির ডাক, আর শোন হিংস্র শ্বাপদের কবলে অসহায় হরিণীর কাতর ক্রন্দন। চেয়ে দেখ হ্রদের দিকে স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের গভীরে কত বিচিত্র প্রাণীর—'

হঠাৎ নরেনবাবু পকেট থেকে একটা ডায়েরী বার করে কী যেন নিরীক্ষণ করলেন, তার পরেই হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন—'কই, আমার পূজা-সংখ্যার কাগজটা দিন। সাড়ে চারটা বাজল, পাঁচটার মধ্যে 'বঙ্গশ্রী' অফিসে যাব বলেছি।'

পত্রিকা হাতে নিয়েই নরেনবাবু প্রায় এক লাফে ঘরের চৌকাঠ পার হয়েই হাওয়া। নরেনবাবুর গল্প সম্বন্ধে তরুণ কবির কাব্যিক বিশ্লেষণেও বাধা পড়ল। শুধু বৈঠকের সব্যসাচী লেখক টিপ্পনী কেটে নরেনবাবুর পিছনে কথা ছুঁড়লেন—'নরেনবাবু, ঝাঁকামুটে নিন। একা অতগুলি পূজা সংখ্যা বাড়ি বয়ে নিয়ে যাবেন কি করে?'

কে একজন প্রশ্ন করল—'নরেনবাবু ডায়েরী দেখতে-দেখতে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চলে গেলেন কেন জানেন?'

আমি বললাম—'ওটা একটা উপলক্ষ্য। নিজের লেখার প্রশংসা শুনতে লজ্জা পাচ্ছিলেন বলেই বোধ হয় ডায়েরীর পাতায় মুখ লুকোচ্ছিলেন।'

'কিছুই জানেন না আপনি। ওঁর ওই ছোট্ট ডায়েরীতে লেখা থাকে কার সঙ্গে কতখানি সময়ের অপব্যয় করবেন। আপনার এখানে টাইম ছিল আধঘণ্টা। পার হতেই পগারপার। কিরকম মেথডিক্যাল লোক ভেবে দেখুন। উনি কি আর আমার-আপনার মত? আড্ডায় বসে গেলুম তো কা তব কান্তা।'

নরেন্দ্র-নারায়ণ আলোচনার মাথায় মুগুড় মেরে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলেন আমাদের আড্ডার না-লিখে-সাহিত্যিক বিশুদা, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। ঘরে ঢুকেই চোখ বড় বড় করে বিশুদা বললেন—'শুনেছেন, প্রভাতদা কি কাণ্ড করেছেন? একেবারে কেলেঙ্কারির একশেষ।'

'প্রভাতদা? কোন প্রভাতদা?'

'আরে আমাদের প্রভাত দেব সরকার গো। এবারে আপনার পূজা সংখ্যায় 'বিনিয়োগ' নামে যে-গল্পটি লিখেছেন, সেটি নাকি ওঁরই এক বিশেষ পরিচিত বাল্যবন্ধুকে নিয়ে লেখা। ওঁর বন্ধু কাজ করে এক সরকারী অফিসে, সেখানে প্রভাতদার এক জ্যাঠতুতো দাদাও কাজ করে। বন্ধুটি গল্প পড়ে ক্ষেপে গিয়ে প্রভাতদাকে হাতের কাছে না পেয়ে অফিসের মধ্যেই তাঁর সেই জ্যাঠতুতো দাদাকে বেদম ঠেঙ্গিয়েছে। চশমা-টশমা ভেঙ্গে একাকার। এই নিয়ে অফিসে মহা শোরগোল।' এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে হাঁপাতে লাগলেন।

কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলেও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি। বিশুদার কথা তো! বৈঠকে একটা কিছু রুদ্ধশ্বাস গল্প ফেঁদে আসর গরম করায় ওঁর জুড়ি মেলে না।

আমাদের মুখের ভাবসাব দেখে বিশুদা বললেন—'কথাটা বিশ্বাস করলেন না তো? ধর্ম্মত বুকে হাত দিয়ে বলছি, ঘটনা সত্যি। আমার কালিঘাট পাড়ার একটি ছেলে ওই অফিসে কাজ করে, সে-ই দুপুরে টেলিফোনে খবরটা দিল। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে টেলিফোনে বার তিনেক ধরবার চেষ্টা করেছি, এনেগেজড্। তাই সশরীরে এসে খবরটা দিলাম।'

বিশুদা বললে—'আমার কিন্তু দুশ্চিন্তা আপনাকে নিয়ে। প্রভাতদার ষণ্ডামার্কা চেহারা—ওদিকে ঘেঁষবে না। তা ছাড়া জানেন তো প্রভাতদা হচ্ছে ভবানীপুরের পুরনো পলিটিক্যাল মস্তান। ওঁর গায়ে হাত দেয় এরকম বুকের পাটা কজনের আছে। তবে হ্যাঁ, আপনি ওঁর গল্প ছেপেছেন। আপনাকে কি রেহাই দেবে?'

এ আবার কী কথা। গল্প ছেপে শেষকালে মারধোর খেতে হবে? প্রথমেই বলেছিলাম, পূজা-সংখ্যা বাজারে বেরুলে হাজার ঝামেলা। কিন্তু এরকম মারপিটের ঝামেলায় পড়তে হবে আমি তা কস্মিনকালেও কল্পনা করি নি।

পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দুঃসংবাদ যিনি এনেছিলেন, সেই আমাদের বিশুদা, অর্থাৎ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা কিঞ্চিৎ এখানে না বললে বৈঠকের পরিচয়ই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কালীঘাট পাড়ার সদানন্দ রোডের দোতলায় একখানি ঘরে ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকেন, কিন্তু সেই ঘরখানির স্থানমাহাত্ম্য কালীঘাটের মন্দিরের চেয়েও কিছু কম নয়। কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর উল্টো দিকের গলি দিয়ে ঢুকে সদানন্দ রোডে পড়েই আপনি হাঁক দিন—বিশুদা বাড়ি আছেন ?

সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন দোতলার বারান্দায় হাস্যোদ্ভাসিত একটি মুখ সাদর আহ্বান জানিয়ে বলছেন—'চলে আসুন, ওপরে চলে আসুন।'

রেলিং-বিহীন সংকীর্ণ সিঁড়ি সন্তর্পণে অতিক্রম করে দোতলার ঘরে ঢুকেই দেখবেন মেঝেতে ঘর-জোড়া ফরাশ পাতা, সেখানে আমারই মত আধ ডজন সাহিত্যোৎসাহী বন্ধু শুয়ে বসে আছেন। আপনিও একটা বালিশকে তাকিয়ার মত বগলদাবা করে শুয়ে পড়ে ডান পায়ের উপর বাঁ তুলে নিশ্চিন্ত হয়ে নাচাতে থাকুন আর সাহিত্যের রাজা উজির মারুন, কেউ কিছু মনে করবে না। চা আর তেল-মুড়ি হাত বাড়ালেই হাজির।

কালীঘাটের এই পাণ্ডাটির কাছে সকলকেই আসতে হয়, বিশেষ করে লেখকদের।

কোথাও কোন আঘাত পেয়ে মন মুষড়ে আছে, চল বিশুদার কাছে। এক লেখকের সঙ্গে অপর লেখকের মনোমালিন্য হয়েছে, বিশুদার মিশন যে করেই হোক ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলতেই হবে। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্যসংগ্রামে বিশুদা বিধ্বস্ত, কিন্তু পরাজিত উনি হবেন না। তাই কোন লেখক বিরূপ সমালোচনায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লে বিশুদা উত্তেজিত কণ্ঠে তাকে এই বলে তিরস্কার করবেন—'তা বলে কি হার মানতে হবে? বাধা যত আসবে তাকে দ্বিগুন জোরে ফেরাতে হবে আরও লিখে। তবে লেখাটা যেন সিনসিয়র হয়।'

বিশুদার এক কথায় মনের গ্লানি দূর হয়ে গেল। এক মুহূর্ত আগে যে লেখক ভেবেছিল লেখা ছেড়েই দেবে, এখন সে দ্বিগুণ উৎসাহে বিশুদার সঙ্গে শুরু করে দিল নতুন উপন্যাসের প্লট নিয়ে আলোচনা।

বিশুদা আমাদের বয়সী হলে কি হবে, প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক মহলে ঘোরা-ফেরা, মেলা-মেশার ব্যাপারে উনি আমাদের সকলের অগ্রণী। আমরা সেই সুবাদে ওঁকে সবাই 'দাদা' বলে ডাকি। শরৎচন্দ্রের রসচক্র নামে যে সাহিত্যিক আড্ডা ছিল, যার গল্প আমরা দূর থেকেই শুধু শুনে এসেছি, সেই বিখ্যাত 'রসচক্রে'র বিশুদা ছিলেন একজন নিয়মিত চক্রী। সেই আমল থেকে হালফিলের তরুণতম লেখকদের বিশুদা হচ্ছেন ফ্রেণ্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড। বিশুদা সাহেব কোম্পানীর ব্যাঙ্কে দশটা-পাঁচটা টাকা আনা পাই হিসেব করেন, অবসর সময়ে করেন সাহিত্য চর্চা। অর্থাৎ লেখক বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া। বন্ধুরা কে কোথায় লিখল, সে লেখা সম্বন্ধে বিশুদার মতামত না পাওয়া পর্যন্ত লেখকদের মনেও শান্তি নেই। কোন সাময়িক পত্রে কোন সাহিত্যিক বন্ধুর লেখা বেরোনো মাত্র বিশুদার তা পড়া চাই এবং লেখকদের বাড়ি গিয়ে তাকে প্রচুর উৎসাহ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

বিপত্নীক হবার পর বিশুদা কিছুদিন মনমরা হয়ে গেলেন। বৈঠকে আসেন, চুপচাপ বসে থাকেন, আবার এক সময়ে কাজের অছিলায় উঠে চলে যান।

বিশুদাকে চেপে ধরলাম, গল্প লিখতে হবে।

শুনে বিশুদা বললে—'আমিও তাই ভাবছি। জানেন বাড়িতে ফিরে গেলে মন টেকে না। একটা কিছু নেশায় মনটাকে ডুবিয়ে রাখতে চাই। বড় নেশায় আসক্তি নেই, উপায়ও নেই। সুতরাং লেখার নেশায় ডুবে থাকলে কেমন হয়? আমি বললাম—'সে তো উত্তম প্রস্তাব। আপনি এত ভাল গল্প বলেন, অথচ লেখেন না। একি কম দুঃখের কথা।'

সেই ঝোঁকেই বিশুদা পর পর দুটো অসাধারণ গল্প লিখেছিলেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত কেরানী জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা নিয়ে। অন্তরের গভীর অনুভূতি দিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা দুটি গল্পই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেই খানেই ইতি, আর কলম ধরলেন না। জিজ্ঞেস করলে বলেন—'বেশ তো আছি। আপনার পত্রিকায় লেখকের ভিড় বাড়িয়ে আপনাকে দেশত্যাগী করতে চাইনে।'

বিশুদা কথা রেখেছিলেন, কলম আর ধরেন নি। কিন্তু সাহিত্যিকদের যেকোন অনুষ্ঠানে বিশুদার স্থান সর্বাগ্রে। আমরা তাই ঠাট্টা করে আজও ওঁকে বলে থাকি—'না লিখে সাহিত্যিক'।

'রসচক্রে'র আড্ডায় তা-বড় সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বিশুদা প্রায়ই আমাদের বৈঠকে রসিয়ে গল্প জমাতেন, যেন এইমাত্র সেই আড্ডা থেকে উঠে এসেছেন। বিশুদা বললেন—

'এক রবিবার ঠিক হল 'রসচক্র'র তরফ থেকে কবি গিরিজাকুমার বসুকে মানপত্র দেওয়া হবে।'

বৈঠকে একজন বললে—'এ কি সেই বিখ্যাত ল্যাবেঞ্চুস কবি গিরিজা কুমার ?'

বিশুদা খেঁকিয়ে উঠলেন—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তিনিই। প্রস্তাবটা উত্থাপন করলেন শরৎবাবু নিজেই। আমরা কয়েকজন আপত্তি জানিয়ে বললাম—তা হয় না শরৎদা। কালীদা, যতীনদা, নরেনদা থাকতে আগেই গিরিজাদাকে দেওয়াটা একটু দৃষ্টিকটু হয় না কি ?'

আমাদের আপত্তি শরৎদা কানেই তুললেন না। শুধু বললেন—'ওরা মানপত্রের জন্য ব্যস্ত নয়। তাছাড়া ওদের মানপত্র দেবে দেশবাসী। কিন্তু গিরিজার কথা স্বতন্ত্র। বেচারী সারাজীবন ধরে ওর বউকে উপলক্ষ্য করে কয়েক হাজার প্রেমের কবিতা লিখল, অথচ তোমরা কেউ ওকে আমলই দিলে না। তাই ওর মনে একটা ক্ষোভ আছে।'

একথার পর আর আপত্তি চলে না, সবাই মেনে নিলুম। বিশ্বপতি চৌধুরী মানপত্র দেবেন, পরামর্শ টা শরৎবাবুই দিলেন।

বিশুদার গল্পে বাধা দিয়ে বৈঠকের সব্যসাচী লেখক টিপ্পনী কেটে বললেন—'এটা কি রকম হল বিশুদা ? শরৎবাবু, কালিদাস রায়, যতীন বাগচী, নরেন্দ্র দেব এঁরা আপনার গল্পের তোড়ে 'দাদা' হয়ে গেলেন ?'

বিশুদা রেগে বললেন—'ওই তো আপনাদের দোষ। কিছুই না জেনে মন্তব্য করবেন। 'রসচক্রে'র বৈঠকে বসবার কল্কে তো পেলেন না। পেলে বুঝতেন রসচক্রের ওইটিই ছিল রীতি। বয়োজ্যেষ্ঠরা ওখানে সবাই 'দাদা', সমবয়সী আর কনিষ্ঠদের সঙ্গে তাদের তুই-তোকারি সম্পর্ক।'

'তাই বলুন।' সব্যসাচী লেখক টেবিলে টোকা মেরে, তবলার বোল্ তুলতে তুলতে বললেন—'কোন দিন শুনব রসচক্রের সভ্যদের মুখে রবীন্দ্রনাথ,

বঙ্কিমচন্দ্র, মায় বিদ্যাসাগর পর্যন্ত 'দাদা' বনে গেছেন। শুধু কাঁধে হাত দেওয়াটাই বাকি।'

আমাদের এই সব্যসাচী লেখকের খোঁচা-দেওয়া স্বভাবটা আর বদলাতে পারলাম না। জমে-ওঠা গল্পকে কাঁচিয়ে দিয়ে মজা দেখা। আমরা সবাই বিশুদাকে তাতিয়ে দিয়ে বললাম—'চালিয়ে যান বিশুদা। ওর কথায় কান দেবেন না।'

এক গাল হেসে বিশুদা বললেন—'ওর কথায় কোন দিন কান দিই নাকি! যত্তোসব—ও, কি যেন বলছিলুম? সেই মানপত্রের কথা। ঠিক হল যতীনদা, তোমাদের যতীন বাগচী গো, তাঁর বাড়িতেই পরবর্তী রবিবার সকালে মানপত্র দেওয়া হবে।

পরের রবিবার বেলা নয়টার মধ্যে রসচক্রের সভ্যরা একে একে যতীন বাগচীর বাড়িতে জমায়ত হয়েছেন, শরৎদাও যথাসময়ে উপস্থিত। কিন্তু মানপত্র আনার ভার যার উপরে দেওয়া হয়েছিল সেই বিশ্বপতি চৌধুরীর দেখা নেই।

এদিকে গিলে-হাতা আদ্দির পাঞ্জাবি আর ধাক্কা-দেওয়া শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি পরে ষাট বছরের যুবা কবি গিরিজাকুমার বসু ঘর আলো করে বসে আছেন।

শরৎদা বললেন, 'মানপত্র যখন আসতে দেরি হচ্ছে ততক্ষণে মালা-চন্দন ওকে পরিয়ে দাও।'

দুটি মেয়ে এসে গোড়ে মালা আর শ্বেতচন্দন পরিয়ে দিতেই শরৎদা বললেন—'হ্যাঁ, এতক্ষণে গিরিজাকে বর-বর দেখাচ্ছে।'

বিশুদার কথায় আবার বাধা দিয়ে সব্যসাচী লেখক বলে উঠলেন—'শরৎবাবু গিরিজাবাবুকে বর্বর বলে গাল দিলেন আর গিরিজাবাবু তা বিনা প্রতিবাদে হজম করলেন?'

বিশুদা বললেন—'রসচক্রের সভ্যরা রসিকতা বুঝতেন। আপনার মত তাঁরা বেরসিক ছিলেন না। যাক্, যে-কথা বলছিলাম। এদিকে বেলা বাড়ছে, বিশ্বপতিবাবুর দেখা নেই। সবাই ব্যস্ত আর উদগ্রীব, কখন বিশ্বপতিবাবু আসবেন। শরৎদা কিন্তু নির্বিকার। শুধু বললেন, 'বিশ্বপতির জন্য ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ওর আসতে একটু দেরি হবেই।'

বিশুদা থামলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে বললেন—

'এবার এক রাউণ্ড চা হয়ে যাক। বকর বকর করে গলাটা শুকিয়ে গেছে।'

ঘরের এক কোণে অমর এক মনে কতকগুলি লেখার পাণ্ডুলিপি ফাইলে গুছিয়ে রাখছিল। বোঝা গেল কান সে খাড়া রেখেছিল গল্পের দিকে। বিশুদার মুখ থেকে চায়ের কথা বেরোতে না বেরোতেই হন্তদন্ত হয়ে টী-পট নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। যেখানে এসে বিশুদা চায়ের জন্য গল্প থামিয়েছেন, সেখানে অধিক বিরতি বোধ হয় ওরও মনঃপূত নয়।

বৈঠকের তরুণ কবি আর ধৈর্য ধরে থাকতে না পেরে বললেন—'তারপর কী হল বিশুদা?'

বিশুদা বললেন—'কি আর হবে। বিশ্বপতিবাবু না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

বুঝলাম বেচারী অমরকে বিশুদা বঞ্চিত করতে চান না। শুধু বললেন—'আপনারা তমাললতা বসুর কবিতা পড়েছেন?'

বৈঠকের তরুণ কবি বললেন—'পড়েছি কিছু কিশোর বয়সে। কিন্তু কি পড়েছি আজ জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারব না। তবু এটুকু মনে পড়ে প্রেমের কবিতাই লিখতেন বেশী, যা ওই বয়সে মন্দ লাগত না।'

বিশুদা বললেন—'এই দম্পতি সারা জীবন ধরে প্রেমালাপ করেছেন কবিতায় এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সেই প্রেমালাপ শেষে প্রলাপ হয়ে উঠেছিল।'

বিশুদার এই কথায় আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম—'যাই বলুন, তরুণ বয়সে এই কবি-দম্পতির কবিতা কিন্তু আমার ভালই লাগত। যে-বয়সটায় একটুকু কথা আর একটুকু ছোঁয়া নিয়ে মনে মনে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যার কল্পনা করতে ভাল লাগত সে-বয়সে ওঁদের লেখা মিষ্টি প্রেমের কবিতার একটা মোহ ছিল বইকি!'

'ওই জন্যেই তো বলা হয় ল্যাবেঞ্চুস কবি।'

অমর বিশুদার সামনে চায়ের কাপটা রাখতেই চুমুক মেরে আবার বললেন—'যাক্, বিশ্বপতিবাবু এসে গেছেন। ট্যাক্সি থেকে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নামলেন, হাতে খবরের কাগজে রোল্ করা একটা বিরাট জিনিস, অনুমান করলাম মানপত্রই হবে।

শরৎদা বললেন—'কি হে বিশ্বপতি, এত দেরি করলে যে?'

বিশ্বপতিবাবু বললেন—'আপনি যে-ধরনের মানপত্রের কথা বলেছিলেন কলকাতায় কোথাও খুঁজে পাই না। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনারা সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, তাও বুঝতে পারছি। শেষকালে খালি হাতে ফিরব? তাই মরিয়া হয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম ধাপার মাঠে। তাই দেরি হয়ে গেল।'

আমরা সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি আর ভাবছি একটা মানপত্রর সঙ্গে ধাপার মাঠ পর্যন্ত ছোটার কি সম্পর্ক।

শরৎদা বললেন—'তাহলে আর অপেক্ষা করা নয়, বেলা অনেক হল। ফটোগ্রাফারও সেই ন-টা থেকে বসে আছে ফটো তুলবার জন্যে। বিশ্বপতি, মানপত্রটা তুমিই গিরিজার হাতে তুলে দাও।'

বিশ্বপতিবাবু একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন—'আপনি উপস্থিত থাকতে আমি দেব?'

শরৎদা বললেন—'একই কথা। তাছাড়া রসচক্রর তরফ থেকে তোমাকেই তো এ-ভার দেওয়া হয়েছে।'

গিরিজাকুমার বসু গলায় মালা দিয়ে বসে আছেন আর প্রবল উত্তেজনায় শীতকালেই কপালে কালো-কালো ঘাম দেখা দিয়েছে। বিশ্বপতিবাবু গিরিজাবাবুর সামনে জোড়হস্তে নিবেদনের ভঙ্গিতে খবরের কাগজে মোড়া সুতো দিয়ে বাঁধা মানপত্রটি রাখলেন।

শরৎদা বললেন—'ওহে বিশ্বপতি, কাগজের মোড়কটা খুলে মানপত্রটা ওর হাতে তুলে দাও।'

একটু ইতস্তত করে বিশ্বপতিবাবু কাগজের মোড়কটা খুলে ফেললেন, বেরিয়ে পড়ল দুহাত মাপের একটা মানকচুর পাতা।

গিরিজাবাবু এক লাফে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। গলার মালা ফেললেন ছিঁড়ে। শরৎবাবুর দিকে বিক্ষুব্ধ দৃষ্টি হেনে বললেন—'বুঝতে পেরেছি শরৎদা। আমাকে নিয়ে এই যে ধ্যাষ্টামোটা হল তার মূলে রয়েছেন আপনি।'

শরৎদা চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব এনে বললেন—'আমি কি করে জানব। বিশ্বপতির উপর ভার ছিল মানপত্র আনবার, কথাটা ও রেখেছে।'

'আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। আমি চললুম।'

শরৎদা বললেন—'তার আগে তোমার সঙ্গে অন্তত ফটোগ্রাফটা তুলে রাখা যাক। ফটোগ্রাফারকে তাই সকাল থেকে বসিয়ে রাখা হয়েছে।'

শরৎদার এই কথায় কাজ হল। শরৎবাবুর ওপর যতই রাগ হোক না কেন। ওঁর সঙ্গে একটা ছবি তুলে রাখার লোভ কার না আছে। গিরিজাবাবু রাজী হতেই ওঁকে মাঝখানে রেখে সবাই মিলে ছবি তোলা হল। গিরিজাবাবুর মাথার পিছনে অতি সন্তর্পণে যে মানকচুর পাতাটা তুলে ধরা হয়েছিল গিরিজাবাবু তা জানতে পেরেও না জানার ভান করেছিলেন।

বিশুদা এবার থামলেন। আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলাম সেই ফটোগ্রাফটা কিভাবে সংগ্রহ করা যায়।

বিশুদা বললেন—'দুঃখের কথা আর বলেন কেন। সেই ফটোগ্রাফ সংগ্রহের চেষ্টা আমরা কি কম করেছি। কবি-পত্নী তমাললতা বসু গিরিজাবাবুর কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে হুকুম দিলেন—যতটাকা লাগে এক্ষুনি গিয়ে ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে নেগেটিভটা কিনে আনতে। এবং গিরিজবাবু তা করেও ছিলেন। পরে সে নেগেটিভের আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।'

প্রশ্ন দেখা দিল শরৎচন্দ্র গিরিজাবাবুকে নিয়ে এরকম রসিকতা করলেন কেন।

বিশুদা বললেন—'আমরা শরৎদাকে এই প্রশ্নই করেছিলাম। শরৎদা বললেন—গিরিজা রোজ সকালে তাড়া তাড়া কবিতা এনে আমাকে শোনাতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সারা সকালটাই মাটি।'

অমৃত সমান রসচক্রের কথা থামতেই আমি বললাম—'বিশুদা এবার আরেক দফা চামৃত হয়ে যাক্। অনেকক্ষণ তো গাঁজাখুরী গল্প চালালেন।'

বিশুদা ফোঁস করে উঠলেন। বললেন—'আপনারা বড়ই বেরসিক। আজকাল ভেজালের যুগে কোন জিনিসটা খাঁটি? গল্পে কিছু ভেজাল যদি এসেই থাকে দোষ কি।'

'দোষ নেই। তবে গিরিজাবাবুকে নিয়ে শরৎবাবু এরকম নির্মম রসিকতা কেন করলেন সেইটাই বুঝতে পারছি না।'

বিশুদা বললেন—'কী করে বুঝবেন। গিরিজাবাবুর পাল্লায় কোনোদিন তো পড়েন নি। তাছাড়া এ আর কি শুনলেন? শরৎদা রবীন্দ্রনাথকে একবার কী রকম জব্দ করেছিলেন সে ঘটনাটা বলি—

'পথের দাবী' বই বাজেয়াপ্ত হবার পর বন্ধুদের পরামর্শে শরৎদা রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে সাহিত্যের উপর ইংরাজ সরকারের এই অন্যায়

হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দিতে। রবীন্দ্রনাথ শরৎদার এই অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি এবং কেন পারেন নি তা এক দীর্ঘপত্রে রবীন্দ্রনাথ শরৎদাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পণ্ডিচেরীর দিলীপকুমার রায় যখন লোকমুখে শুনলেন যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অনুরোধ রাখেন নি, ছুটে চলে এলেন শরৎদার কাছে। শরৎদাকে একটু উস্কে দেবার বাসনায় সান্ত্বনার সুরে বললেন—কবি আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করে আপনার খুবই ক্ষতি করলেন।

শরৎদা মুচকি হেসে বললেন—ওহে মণ্টু, কবি আমার আর কী এমন ক্ষতি করলেন। আমি ওঁর যা ক্ষতি করেছি জীবনে তা উনি ভুলতে পারবেন না। গিরিজাকুমার বসুর সঙ্গে কবির আলাপ করিয়ে দিয়েছি।

॥ ১২ ॥

শনিবার বিকেলে দপ্তরে বসে একটি সদ্য পাওয়া পাণ্ডুলিপির পাতার উপর মুগ্ধদৃষ্টি রেখে ঘাড় গুঁজে বসে আছি। আড্ডাধারী বন্ধুরা একে-একে হাজির হয়েছেন, সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার তন্ময়তা ভঙ্গ করবার জন্য আড্ডার সব্যসাচী লেখক বললেন—

'রাবীন্দ্রিক ধাঁচের হাতের লেখার পাণ্ডুলিপি কি না, তাই এত মনোযোগ। আমাদের দিকে আর চোখ তুলে তাকাবার ফুরসত হচ্ছে না।'

আড্ডার গাল্পিক লেখক বললেন—'রাবীন্দ্রিক হাতের লেখার প্রতি আশ্রমিকদের কেমন যেন একটা দুর্বলতা আছে। কোন পাণ্ডুলিপি যদি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার ধাঁচে হয়, তাহলে আর তা পড়ে দেখারও প্রয়োজন হয় না। সে-লেখা সরাসরি প্রেস-এ চলে যায়। রবীন্দ্রনাথের মত হাতের লেখা যখন, তখন লেখার হাত থাকতেই হবে।'

আমাকে একটু কটাক্ষ করেই সব্যসাচী লেখক বললেন—'ওঁর ভাবটা হচ্ছে প্রহ্লাদের মত। হাতে খড়ির সময় 'ক' লিখতে গিয়ে কৃষ্ণ বলে কেঁদে আকুল।'

তরুণ কবি বললেন—'আপনারা কী বলতে চান। এই পত্রিকায় মাঝে-

মাঝে আমার কবিতা প্রকাশিত হয়, সেটা কি শুধুই আমার রাবীন্দ্রিক হাতের লেখার জন্যে ? রচনার গুণে নয় ?'

সব্যসাচী লেখক সুযোগ পেলেই তরুণ কবিকে একটু বেকায়দায় না ফেলে ছাড়েন না। বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি।'

'ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি! তার মানে ?' কবির কণ্ঠে একটু উষ্মার আভাস।

'হাতের লেখা পঞ্চাশ আর দুর্বোধ্যতা পঞ্চাশ।'

এই বাক-বিতণ্ডা থেকে তরুণ কবিকে উদ্ধার করা প্রয়োজন, আর প্রয়োজন এই অভিযোগ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের। পাণ্ডুলিপি একপাশে সরিয়ে রেখে বললাম—'পরীক্ষার্থী ছাত্র আর যশঃপ্রার্থী লেখকদের হাতের লেখা পরীক্ষক ও পত্রিকা সম্পাদকের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে বই কি! তা বলে ভাল রচনা হাতের লেখার দোষে পরীক্ষায় কম নম্বর পেলেও পত্রিকার সম্পাদক বাতিল করে দেবেন, এমনটা কদাচিৎ ঘটে।'

সব্যসাচী লেখক বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—'হাতের লেখার দোষে যে ভাল লেখা সম্পাদকের দপ্তর থেকে বাতিল হয়ে যায় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার আছে।'

আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলাম নতুন কিছু খবর শোনার লোভে।

সব্যসাচী লেখক বললেন—'১৯৩৬ সালের কথা। 'নবশক্তি' পত্রিকা তখন পার্ক সার্কাস থেকে বেরোয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র নামে সম্পাদক, পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব একা অদ্বৈত মল্লবর্মণের ঘাড়ে। আমি মাঝে-মাঝে লেখা নিয়ে যাই। মিষ্টভাষী এই ক্ষীণকায় মানুষটির বিনয়নম্র স্বভাব আমাকে খুবই আকর্ষণ করত। কিন্তু যখনই গিয়েছি, দেখেছি কাজের চাপে অত্যন্ত বিব্রত। এক হাতে তাঁকে সব কিছুই করতে হয়। জমিয়ে বসে গল্প করার ইচ্ছে উভয়ের থাকা সত্ত্বেও দু-চার কথার পর বিদায় নিয়ে চলে আসতাম। কিছুদিন বাদে অফিসের পর বিকেলে 'নবশক্তি'র কার্যালয়ে গিয়ে দেখি অদ্বৈত-বাবু নেই। তার জায়গায় বসে আছেন একটি নব্য ছোকরা। পরনে মিহি খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধের উপর পরিপাটি ভাঁজে ইস্ত্রি করা একটি কালো-পাড়ের মাদ্রাজী সাদা চাদর। ঘরে ঢুকতেই নব্য ছোকরা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই ?

—অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

তিনি এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে গেছেন। কিছু প্রয়োজন আছে ?

আপনারাই বলুন। এ-রকম কাঠখোট্টা মেজাজের লোকের কাছে প্রয়োজনের কথা বলবার প্রবৃত্তি হয়? খামটা পকেটেই ছিল পকেটেই থেকে গেল। তবু একটু অন্তরঙ্গতা দেখবার জন্য বললুম—একটু জল খাওয়াতে পারেন?

—অপেক্ষা করতে হবে। বেয়ারাটা কাগজ নিয়ে ডাকঘরে গেছে, এই এল বলে।

মনে মনে ভাবলুম, ভদ্রতার খাতিরে অন্তত দু-চারটা কথা বলবেন।

কিন্তু ছোকরা সাজ-পোশাকে খদ্দর-মার্কা হলে হবে কি, আমার দিকে দ্বিতীয়বার ফিরেও তাকাল না। টেবিলের উপর ডান হাতের কাছে এক বাণ্ডিল খালি খাম, বাঁ দিকে একতাড়া খাম ভর্তি ডাকে-আসা গল্প-প্রবন্ধ। বাঁ দিক থেকে একটা খাম তুলে আলোর দিকে মেলে ধরে খালি অংশটুকু ফড়াৎ করে একটানে ছিঁড়ে ফেললেন। বেরিয়ে এল একটি কবিতা। কবিতার নাম ও লেখকের নামের উপর একবার চোখ বুলিয়েই বলে উঠলেন—'আহা, কী কবিতার নাম। সুমিতাকে। সুমিতাকে নিয়েই যদি কবিতা লিখবি সেটা সুমিতার হাতেই দিয়ে এলে পারতিস। আমাদের জ্বালানো কেন।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের খালি খামের বাণ্ডিল থেকে আরেকটা খাম তুলে তার মধ্যে কবিতাটা ভরে খস্ খস্ করে লেখকের নাম-ঠিকানা লিখে ফেললেন।

আবার বাঁ দিকের খামে হাত। আবার ফড়াৎ শব্দে ছেঁড়া। এবার বেরিয়ে এল একটি গল্প। সঙ্গে সঙ্গে স্বগতোক্তি হল—'যেমন হাতের লেখা, তেমনি গল্পের আকার, তেমনি লেখকের নাম।'

ডান হাতের খাম উঠে এল। গল্পটি তার মধ্যে কবরস্থ হতেই আমি উঠে পড়লাম। চোখের সামনে লেখার উপর এমন কসাইগিরি আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়! ভদ্রলোকের তখন ভ্রূক্ষেপ নেই যে একজন আগন্তুক জল খেতে চেয়ে না খেয়েই বেরিয়ে যাচ্ছেন। দরজার চৌকাঠ পার হয়ে রাস্তার সিঁড়িতে পা দেবার আগে আমার এই নিঃশব্দে চলে যাওয়াটা ওঁর নজরে পড়েছে কি না জানবার জন্যে পিছন ফিরে তাকালাম। তিনি তখনও আপন মনে ছিঁড়ছেন আর ভরছেন, ছিঁড়ছেন আর ভরছেন। যেমন আসা তেমনি যাওয়া।

এ পর্যন্ত বলেই সাব্যসাচী লেখক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মুচকি হাসতে লাগলেন। ভাবখানা, বুঝ সাধু যে-জান সন্ধান।

সন্ধান জানবার আগেই কথার মোড় ফেরাবার উদ্দেশ্যে আমি বললাম-'আপনার অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে নিয়ে এর বিপরীত নজীরও আমি দেখাতে পারি। সুবোধ ঘোষের উদাহরণ দিয়েই বলি। সুবোধবাবুর হাতের লেখা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে, তাঁর হাতের লেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে পাঠোদ্ধার সহজসাধ্য নয়। সুবোধবাবুর প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠানো হল। কম্পোজ করতে গিয়ে লাইনো অপারেটার হিমসিম। কাজের স্পীড গেল কমে, এক ঘণ্টার কাজ দুঘণ্টা সময় লাগে। প্রুফ যখন এল তা সংশোধন করতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত, করেকশন করা মানে নতুন কম্পোজের সামিল।

একদিন দুপুরে দপ্তরে বসে আছি। তখন আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগ আর 'দেশ'-এর দপ্তর ছিল একই ঘরে, পাশাপাশি টেবিলে। সুবোধবাবু তখন রবিবাসরীয় বিভাগে কাজ করেন, তিনিও বসে আছেন। এমন সময় প্রেস থেকে লাইনো বিভাগের ইন-চার্জ একটা পাণ্ডুলিপি হাতে ঘরে এসে উপস্থিত।

ঘরে ঢুকেই তিনি বোমার মত ফেটে পড়লেন—'এই লেখকের লেখা এত দুর্বোধ্য যে, কোন অপারেটর কম্পোজ করতে চায় না। এই লেখককে কেন আপনারা বলেন না, আরেকটু ধরে ধরে সুস্পষ্ট করে লিখতে'—এই বলে সুবোধবাবুর উপন্যাসের কপি শূন্যে তুলে ধরলেন।

আমি তো হতবাক্। আরক্তিম মুখে সুবোধবাবু আমার দিকে তাকিয়ে। সুবোধবাবুর লেখক-খ্যাতি তখন ব্যাপক ছিল না এবং লাইনো বিভাগের লোকেদের তখন জানবার কথাও নয় কে সুবোধ ঘোষ।

এই অস্বস্তিকর অবস্থার যবনিকা টানবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি সুবোধবাবুর দিকে দেখিয়ে বললাম—'এই যে, এই ইনিই লেখক. এঁরিই নাম সুবোধ ঘোষ।'

সঙ্গে সঙ্গে অপারেটর ভদ্রলোক লজ্জায় কাঁচুমাচু। এক গাল হেসে কিন্তু কিন্তু করে বললেন—'এই বুঝেছেন কি না, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি—'

অপারেটরকে সঙ্কোচ থেকে উদ্ধারকল্পে বললাম—'আমাদের কাগজের সম্পাদক বঙ্কিমবাবুর হাতের লেখা যদি কম্পোজ করতে পারেন তাহলে সুবোধ-বাবুর হাতের লেখা কেন পারবেন না?'

—'বঙ্কিমবাবু বহু বছর ধরে লিখছেন, পুরনো অপারেটাররা ওর লেখার ধাঁচ এতদিনে বুঝে ফেলেছে।'

অমি বললাম—'সুবোধবাবুও বহু বহু বছর ধরেই লিখবেন। ততদিনে ওঁর হাতের লেখার ধাঁচও আপনার অপারেটাররা বুঝে ফেলবে।'

এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে সুবোধবাবু যখন আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক, নিয়মিত সম্পাদকীয় লেখেন তখন প্রেস-এর একজন লইনো অপারেটার কী কারণে খবর না দিয়েই ডিউটি থেকে ডুব মারে। পরদিন ডিউটিতে আসামাত্র সেই লাইনো-ইনচার্জ ভদ্রলোক খুব খানিকটা বকাবকি করে বললেন—'ফের যদি এরকম হয় তাহলে তোমার চাকরি থাকবে না বলে দিচ্ছি।'

উত্তরে সে লোকটি গম্ভীর হয়ে বললে—'সুবোধবাবুর যতদিন এখানে চাকরি আছে ততদিন আমার চাকরি মারে কে।'

বহু বছর পরে এই লাইনো ইনচার্জ পূজা সংখ্যায় সুবোধবাবুর একটি গল্প শেষ মুহূর্তে পেয়ে অলৌকিক কার্যক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে-গল্প বারান্তরে আপনাদের বলব।

বৈঠকের গাল্পিক সাহিত্যিক গল্প শুনতে এবং গল্প বলতে খুবই ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর একটা অভ্যাস হচ্ছে টু দি পয়েন্ট থাকা। অর্থাৎ যে-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার শুরু সে-প্রসঙ্গ যদি গল্পের তোড়ে ডালপালা বিস্তার করতে করতে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাবার চেষ্টা করে তাকে আবার মূল কাণ্ডে ফিরিয়ে আনা। তাই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বললেন—'যে কথা শুরুতে হচ্ছিল সেই কথাই হোক। রাবীন্দ্রিক হাতের লেখার যে বিরাট পাণ্ডুলিপিটার উপর আপনি এতক্ষণ হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন সে-বস্তুটি কী জানতে পারি?'

'ভ্রমণ-কাহিনী।'

আমার কথা শুনে সব্যসাচী সাহিত্যিক গাল্পিক-সাহিত্যিককে একটু ভরসা দেবার সুরে বললেন—

'যাক্, বেঁচে গেলেন। উপন্যাস তো নয়। উপন্যাস হলেই ভয়—আবার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল।'

আমি বললাম—'না-ই বা হল উপন্যাস। এ-লেখার জাতি-পাঁতি স্বতন্ত্র। উপন্যাস এর ধারে কাছে লাগে না।'

দশ জোড়া বড় বড় চোখে একরাশ বিস্ময়ভরা প্রশ্ন জেগে উঠল—'লেখকটি কে ?'

—'আপনারা চিনবেন না। সৈয়দ দা।'

আবার প্রশ্ন—'সৈয়দ দা, তিনি আবার কে ?'

আমি বললুম—'ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। সেই সুবাদে আমার সৈয়দ দা।'

সব্যসাচী লেখক বললেন—'তাহলে তো আর কিছু বলা যাবে না। একে রাবীন্দ্রিক হস্তাক্ষর তদুপরি শান্তিনিকেতনিক। এ-লেখা তো অবশ্য প্রকাশিতব্য।'

আমি বললাম—'আগামী সপ্তাহ থেকেই লেখাটি প্রকাশিত হবে। আপনারাই তখন বিচার করবেন লেখাটি প্রকাশিতব্য কিনা। তবে এটুকু আপনাদের বলে রাখছি, এই এক বই লিখেই ইনি বাংলা সাহিত্যে পাঠকচিত্ত জয় করবেন।'

গাল্পিক বন্ধু বললেন—'আচ্ছা, বেশ কিছুকাল আগে পরিচয় পত্রিকায় ভাষাতত্ত্ব নিয়ে এঁর একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম মনে পড়ছে। তিনি কি ইনি ?'

আমি বললাম—'আপনি ঠিকই ধরেছেন তিনিই ইনি। সেখানে তিনি পণ্ডিত। কিন্তু এ লেখায় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সাহিত্যরসের অপূর্ব যোগাযোগ দেখতে পাবেন।'

এই এক লেখাতেই বাংলা সাহিত্যজগতে সৈয়দ মুজতবা আলীর আসন পাকা হয়ে গেল। আজ তিনি সর্বশ্রেণীর পাঠকদের প্রিয় লেখক। তাঁর নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি আনাতোল ফ্রাঁসের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, If you wish to travel more, travel light.—তোমার লেখাকে তুমি যদি সর্বত্রগামী করতে চাও, হালকা হয়ে লেখ, পণ্ডিতী ফলিও না।

আলোচনা প্রসঙ্গে বৈঠকে সেদিন কথা উঠল সাম্প্রতিক কালে প্রথম প্রকাশিত লেখায় কোন্ কোন্ লেখক স্বনামধন্য হয়েছেন।

বৈঠকের গাল্পিক বন্ধু আলোচনার বিষয় একটু গুরুগম্ভীর হয়ে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন—এই বুঝি তর্কবিতর্ক শুরু হল, সেই সঙ্গে গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—যে-যাই বলুন বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' নিয়ে

আর্বিভাব একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। সেই সঙ্গে যিনি তাঁকে আবিষ্কার করেছিলেন, 'বিচিত্রা'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

ভবিষ্যতে বাংলা দেশে সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথের কোন রচনাই যদি স্মরণীয় হয়ে না থাকে তবু তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন দুটি লেখকের আবিষ্কর্তারূপে।

একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরজন বিভূতিভূষণ। আর এই বিভূতিভূষণের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটা খুবই কৌতুককর।'

এইটুকু বলেই গাল্পিক বন্ধু থামলেন। এটা তাঁর বরাবরের স্বভাব। শ্রোতাদের একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে এনেই বিরতি! আমাদের প্রতিক্রিয়াটা উপভোগ করবার জন্যই বোধ হয় একটা কর্ণরোচক গল্পের সূত্রপাত করেই থেমে গেলেন।

আমরা সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলাম—'থামলেন কেন, ঘটনাটা বলুন!'

কোন উত্তর নেই। নির্বিকার চিত্তে পকেট থেকে আস্তে আস্তে নস্যির কৌটা বার করলেন। কৌটার ঢাকনিটার উপর পাকা তবলচীর মত তর্জনী দিয়ে দুবার টোকা মারলেন। সন্তর্পণে ঢাকনা খোলা হল, দু-আঙুলে নস্যির টিপটি বাগিয়ে নিয়ে ঢাকনাটা বন্ধ করতে করতে বললেন—'চা কোথায়?'

আমি বললাম—'সে আর আপনাকে বলতে হবে না। পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করতে দেখেই আমার বেয়ারা অমর কেটলি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছে। এতদিন বৈঠকে আড্ডা দিচ্ছেন, ওর কি আর আপনাদের চিনতে বাকি আছে?'

ইত্যবসরে চা এসে গেল। টেবিলের উপর রাখা কাপটার উপর উপুড় হয়ে সশব্দে চুমুক মেরেই একটা তৃপ্তির ধ্বনি ছাড়লেন।

কলকাতা বেতারে রবিবারের শিশুমহলের প্রারম্ভে পরিচালিকা তাঁর শ্রোতাদের উদ্দেশে যখন বলেন—'তোমরা সব ভাল আছ তো?' তখন পাখিপড়ার মত শেখানো একদল কচিকণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসে—'হ্যাঁ—'

চায়ের কাপে দ্বিতীয়বার চুমুক মেরেই আমাদের গাল্পিক বন্ধু যখন বললেন—'তা হলে গল্পটা শুরু করি?' আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম—হ্যাঁ—'

গল্প শুরু হল।

বাঙালীটোলা জানেন তো? ভাগলপুরের বাঙালীটোলা? সেই বাঙালীটোলার গাঙ্গুলীরা হচ্ছে সেখানকার বিখ্যাত বনেদী পরিবার, শরৎচন্দ্রের মামাবাড়ি। শরৎচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল ওই মামাবাড়িতে। আমাদের উপেনদা ওই গাঙ্গুলী পরিবারের ছেলে। কলকাতা থেকে আইন পাস করে উপেনদা এলেন ভাগলপুরে ওকালতি ব্যবসার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কলকাতা অধ্যয়নকালেই সাহিত্যের নেশায় তিনি মশগুল; 'ভারতবর্ষ', 'সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরিয়েছে, কিছু সাহিত্যিক খ্যাতিও তিনি অর্জন করেছেন।

কাবুলীওয়ালা যেমন হিংয়ের ঝুলি বাড়িতে রেখে এলেও তার গা দিয়ে হিং-এর গন্ধ বেরোয়, উপেনদা সাহিত্যের পাট কলকাতায় চুকিয়ে দিয়ে অর্থ উপার্জনের আশায় ভাগলপুরে ওকালতি করতে এসেও একটি সাহিত্যের আড্ডা জমিয়ে তুললেন। মানুষটি একে সাহিত্য-পাগল, তায় মজলিসী। রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় একটা জমাটি আড্ডা বসত। গান-বাজনার সঙ্গে মজলিসী গল্প, সেই সঙ্গে চলত সাহিত্য আলোচনা।

ভাগলপুরে বহুকাল থেকেই সাহিত্যের আবহাওয়া আপনা থেকেই গড়ে উঠেছিল। উপেনদার আড্ডায় সাহিত্যোৎসাহী অনেক বাঙালীই রবাহূত আসতেন-যেতেন, কেউ কিছু মনে করতেন না।

সেই সময় একটি অপরিচিত বাঙালী যুবকের উপেনদার আড্ডায় ছিল নিত্য যাওয়া-আসা! পরনে গোড়ালি ছুঁই-ছুঁই খাটো ধুতি, গায়ে ইস্ত্রি-বিহীন নিজহাতে কাচা মার্কিন কাপড়ের পাঞ্জাবি। এক হাতে লণ্ঠন, অপর হাতে লাঠি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আড্ডার এক কোণে সবার পিছনে সবার অগোচরে চুপচাপ বসে থাকেন, আড্ডা শেষ হলে যেমন নিঃশব্দে আসেন, তেমনি নিঃশব্দে চলে যান। মানুষটি যে কে, সে পরিচয় নেবার প্রয়োজন কখনও ঘটে নি। আড্ডায় আসেন যান এইটিই তো একমাত্র পরিচয়। পূর্বপরিচয়ের প্রয়োজন কি।

শরতের পর শীত পার হয়ে বসন্তকালও চলে গেল, এল গ্রীষ্ম। ভাগলপুরের গ্রীষ্ম তো জানেন, যতক্ষণ রোদ ততক্ষণ বাইরে বেরনো যায় না. সন্ধ্যের পর লোকে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কোর্ট বন্ধ। উপেনদা সারাদিন ঘরে বসে নতুন উপন্যাস লিখছেন, সন্ধ্যে হলেই আড্ডার জন্য উন্মুখ হয়ে বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় দেখা দিল ধুলো উড়িয়ে

প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়। উপেনদার মন খারাপ। এই ঝড়ের মধ্যে আজ আর কি কেউ আসবে? তবু প্রতিদিনের অভ্যাসমত বৈঠকখানা-ঘরে বসে আছেন, ঝড়ের জন্য সেদিন দরজা জানলা বন্ধ। বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে, ঝড়ের দাপট কিছু কম, দু-চার ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে যেন। দরজাটা খুলে বাইরের রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন দূর থেকে একটি লণ্ঠনের আলো তাঁরই বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে একটা ছায়ামূর্তি। যাক একজনকে অন্তত পাওয়া গেল, দুদণ্ড রসালাপ করে সন্ধ্যেটা তাহলে ভালই কাটবে।

ছায়ামূর্তি যখন কায়া নিয়ে তাঁর ঘরের বারান্দায় হাজির হল, উপেনদা যেন একটু দমে গেলেন। মানুষটিকে পাঁচ ছয় মাস ধরে রোজই তাঁর বৈঠকখানায় দেখছেন বটে কিন্তু যেমন গম্ভীর তেমনি লাজুক। কথা খুবই কম বলেন, যেটুকু বলেন একেবারে রসকষহীন। এর সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনাই বা কী হবে, রঙ্গরসের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

উপেনদার স্বভাব হচ্ছে সব মানুষের মধ্যেই গল্প বা উপন্যাসের চরিত্র খুঁজে বেড়ানো। মনে মনে ভেবে নিলেন এই নির্বাক মানুষটির জীবনে এমন কিছু উপাদান আছে যা তাঁর উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজনে লাগবে। সেই উদ্দেশ্যেই আগন্তুক নিকটবর্তী হতেই তাকে সাদর অভ্যর্থনায় ঘরে ডেকে তুললেন।

ঘরে ঢুকেই মানুষটি হাতের ছাতা লাঠি ও লণ্ঠন দেয়ালের ধারে রেখে ঘরের কোণার সেই নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন, যেখানে তিনি রোজই এসে বসেন।

প্রবল আপত্তি জানিয়ে উপেনদা বললেন—'আপনি অত দূরে গিয়ে বসলেন কেন, সামনের চেয়ারটায় বসুন।'

আগন্তুক সলজ্জ কণ্ঠে বললেন—'আজ্ঞে আরও অনেকেই তো আসবেন, ওদের জায়গায় আমার বসাটা কি ঠিক হবে?'

অভয় দিয়ে উপেনদা বললেন—'আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে আজ আর কেউ আসবে না। আপনি এগিয়ে এসে বসুন।'

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে উপেনদার সামনের টেবিলটার বিপরীত দিকের চেয়ারে এসে বসতেই উপেনদা বললেন—'আমাদের আড্ডায় আপনার নিত্য

যাওয়া আসা অথচ আপনার পরিচয়টাই নেওয়া হয় নি। এই আড্ডায় পরিচয়ের তো প্রয়োজন হয় না, মুখচেনা হলেই চিরচেনা। তা—আপনার নামটা জানতে পারি ?'

—'আজ্ঞে আমার নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

—'এখানে কী করা হয় ?'

—'কলকাতা থেকেই এখানে এসেছি চাকরি নিয়ে।'

—'কলকাতা থেকে ভাগলপুরে এসেছেন চাকরি নিয়ে? কলকাতায় কি কিছু জুটল না ?'

প্রশ্নটার মধ্যে হয়তো উপেনদার নিজেরও কলকাতা ছেড়ে ভাগলপুরে ওকালতি করতে আসার জন্য একটা প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ মিশে ছিল। কলকাতার সাহিত্যজীবন ছেড়ে নিছক অর্থের অন্বেষণে ভাগলপুরে এসে মক্কেল নিয়ে পড়ে থাকাটায় ওঁর অন্তরের সায় ছিল না। সান্ত্বনার সুরে তাই আবার বললেন—

'কলকাতায় একটু চেষ্টা করলেই তো একটা-না-একটা কাজ জুটে যেত।'

—'আজ্ঞে, মাস্টারি একটা জুটেছিল কিন্তু পোষালো না। অগত্যা এখানে খেলাত ঘোষেদের জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের কাজ নিয়ে চলে এসেছি।'

—'খেলাত ঘোষের জমিদারি? সে তো অনেক দূর। এখান থেকে চার পাঁচ মাইল তো হবেই। তাছাড়া গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয় না ?'

—'হ্যাঁ, মাইল দু-তিন পথ জঙ্গল পার হতে হয়।'

একথা শুনে উপেনদা একেবারে থ হয়ে গেলেন। বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যেতে বললেন—

'এই জঙ্গলে রাস্তা পার হয়ে রোজ আপনি এখানে আসেন! আপনার ভয় করে না ? শুনেছি ওই জঙ্গলটায় হিংস্র জন্তুজানোয়ার থাকে, সাপখোপেরও অভাব নেই।'

বিভূতিবাবু একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললেন—'ভয় পাবার কী আছে? জন্তু জানোয়ার থাকলেই বা কি? ওদের আক্রমণ না করলে ওরাও আমাকে কিছু করবে না। তাছাড়া জঙ্গলের একটা মোহ আছে, মায়া আছে যা আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে। আর সাপখোপের কথা বলছেন? ওই যে দেখছেন লাঠি, ওটা যতক্ষণ হাতে থাকে ততক্ষণ আর কোন কিছুর ভয় আমার থাকে না।'

উপেনদা মনে মনে খুশী হয়ে উঠলেন একটি অদ্ভুত চরিত্রের মানুষকে পেয়ে। বললেন—

'আচ্ছা, প্রতিদিন আপনি এই দীর্ঘপথ হেঁটে আসেন, আড্ডায় এসে চুপচাপ বসে থাকেন তাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কেন? কিসের টানে?'

—'কিসের টানে? আপনাকে কী করে বোঝাব বলুন। ভাগলপুরে আসবার আগেই বাঙ্গালীটোলায় আপনাদের বাড়ির কথা অনেক শুনেছি। শুনেছি শরৎচন্দ্র এই বাড়িতেই মানুষ হয়েছিলেন, এইখানেই তাঁর সাহিত্য-সাধনার উৎস। তাছাড়া অনুরূপা দেবী, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অনেক নামকরা সাহিত্যিকই এই বাড়িতে সাহিত্যের আসর জমিয়েছেন। এ-বাড়ি তো আমার কাছে তীর্থক্ষেত্র। তার উপর রয়েছেন আপনি। আপনার বাড়ির সাহিত্যিক আড্ডার খবর আমি কলকাতা থেকে শুনে এসেছিলাম।'

যা আশা করে উপেনদা এই মানুষটির সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিলেন এখন দেখলেন এ-অন্য ধাতুতে গড়া। এর কথাবার্তার মধ্যে একটি শিল্পী-মন লুকিয়ে আছে তার খানিকটা আভাস যেন উপেনদার কাছে ফুটে উঠল। আগ্রহের সঙ্গে উপেনদা বললেন—

'আপনার গোপনে সাহিত্যচর্চার বাতিক আছে নাকি?'

'না এমন কিছু নয়, এই একটু আধটু—'

লাজুক মানুষ তাই বলতে সঙ্কোচ। উপেনদা তাই সাহস দিয়ে বললেন—

'আহা লজ্জার কি আছে। কবিতা-টবিতা নিশ্চয়ই দু-একটা লিখেছেন। আর যখন অরণ্যের নির্জনতায় আপনি দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন তখন আলবত কবিতা আপনি লিখেছেন। যদি এখনও না লিখে থাকেন, লিখতে হবে এবং আমাকে দেখাতেই হবে।'

এ-কথার পর বিভূতিবাবু বুকে বল সঞ্চয় করে বললেন—'অভয় যদি দেন, উৎসাহ যদি পাই, তাহলে আপনাকে একটা কথা নিবেদন করি।'

—'তাহলে অনুমান ঠিকই করেছি। নিশ্চয় কবিতা আপনি লিখেছেন এবং পকেটে করে নিয়েও এসেছেন দেখে শুনে দেবার জন্যে। লজ্জার কিছু নেই, এ-রকম অনেকেই আমার কাছে এসে তাদের লেখা করেক্ট করিয়ে নিয়ে যায়। চট্‌পট্ বার করুন, আমি পড়ে দেখতে চাই।'

—'আজ্ঞে কবিতা নয়। আমি একটা উপন্যাস লিখেছি।'

—'উপন্যাস? আ-আ-আপনি? লিখে ফেলেছেন?' বিস্ময়ে বিমূঢ় উপেনদা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন বিভূতিবাবুর দিকে।

রাত হয়ে গিয়েছে। বাইরের জমাট অন্ধকার বৃষ্টিভেজা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে মিশে ঘরের জানলা-দরজা দিয়ে এলোমেলো প্রবেশ করতে লাগল। ঘরের ভিতরে একটা থমথম আবহাওয়া। বিভূতিবাবু মাথা নিচু করে বসে আছেন—যেন মস্ত একটা অপরাধ করে ধরা পড়ে গিয়েছেন। ওদিকে উপেনদার চোখে মুখে তখনও বিস্ময়ের স্তব্ধতা, যেন এ-মানুষ কখনই অপরাধ করতে পারে না।

এই অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা দুজনকেই পীড়া দিচ্ছিল। অগত্যা উপেনদাই কথা বললেন—খানিকটা স্বগোতোক্তির মত।

—'হাতে খড়ি হল না, একেবারে উপন্যাস!'

এবার বিভূতিবাবুর অবাক হবার পালা। তিনি বললেন—'হাতে খড়ি? সে আবার কি।'

'হঁ্যা, হঁ্যা, হাতে খড়ি। এর আগে কোন পত্রিকায় আপনার কোন লেখা-টেখা কিছু বেরিয়েছে? যেমন, কোন কবিতা বা গল্প? নিদেন পক্ষে কোন প্রবন্ধ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে? হাতে খড়ি হল না, আপনি কি-না উপন্যাস লিখে ফেললেন? এই আমার কথা ধরুন না। সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলাম কবিতা লিখে। পরে গল্প-উপন্যাসে চলে গিয়েছি। আমি কেন। কে নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনা কবিতা। প্রকাশ করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। সেই তাঁর প্রথম হাতে খড়ি। রবীন্দ্রনাথের কথা আর নাই বললাম। এমন কি আমার ভাগ্নে শরৎচন্দ্র সেও প্রথম জীবনে কবিতা লিখেই সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিল।'

বিস্মিত হয়ে বিভূতিবাবু বললেন—'শরৎবাবু কবিতা লিখেছেন? কই এ কথা তো আগে কখনও শুনিনি।'

—'কোথেকে শুনবেন। এ-কথা আমি ছাড়া আর জানবেই বা কে। আজও শরতের লেখা একটা কবিতার প্রথম লাইন মনে আছে—"ফুলবনে লেগেছে আগুন"। ভাগলপুরের এই বাড়ি থেকেই আমাদের কৈশোর জীবনে একটা হাতে লেখা পত্রিকা বার করতাম। সেই পত্রিকায় এই

কবিতাটি ও লিখেছিল। তাই বলছিলাম দু-একটা ছোট খাটো লেখা এ-দিক ও-দিকে ছেপে নামটা একটু চালু করে নিয়ে উপন্যাসে নামা উচিত ছিল না কি?'

কৈফিয়ত দেবার স্বরে বিভূতিবাবু বললেন—'অনেকদিন ধরেই ভিতরে ভিতরে একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম আমার দেশের কথা, আমার গ্রামের কথা উপন্যাস আকারে লিখে যাব। গ্রামের ইস্কুলে মাস্টারি করতাম, অবসর ছিল, তাই লিখে ফেলেছি।'

'তা বেশ করেছেন। একা একা পড়ে আছেন, সময় তো কাটাতে হবে। তবে উপন্যাস লিখলেই তো হল না, কতগুলো নিয়ম-কানুন আছে। সেগুলো বজায় রেখেছেন কি? কত বড় উপন্যাস লিখেছেন?'

বিভূতিবাবু বললেন—'তা একটু বড়ই হবে, আমার হাতের লেখা বেশ ছোটই। তারই চারশ পাতা হয়েছে।'

'তা তো হবেই। একা-একা যখন আছেন তখন পাতার পর পাতা, দিস্তার পর দিস্তা, রিমের পর রিম লিখে যাওয়া ছাড়া আর কাজটা কি। আপনার উপন্যাসে পরিচ্ছেদ আছে তো?'

'তা আছে।'

'অঙ্ক মিলিয়েছেন?'

'অঙ্ক? উপন্যাস লেখার সঙ্গে অঙ্কের কি সম্পর্ক ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'অঙ্ক, মানে ম্যাথ্‌মেটিকস্‌। প্রথম পরিচ্ছেদে ঠিক যতগুলি শব্দ আছে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঠিক ততগুলিই শব্দ থাকবে। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম। গুনে দেখেছেন?'

'আজ্ঞে না, গুনে তো দেখি নি!'

'আমি এখানে আছি, আপনি আমার এখানে আজ ছ-মাসের উপর আসা-যাওয়া করছেন। একবার মুখ ফুটে জানালেন না? এখন সবই পণ্ডশ্রম। কবিতার যেমন একটা ছন্দ আছে, যতি আছে, মাত্রা আছে, উপন্যাসেরও তাই। একটা পরিচ্ছেদের সঙ্গে আর একটা পরিচ্ছেদের মাত্রা ঠিক রাখা চাই। তা না রাখলে উপন্যাস বেমানান হয়ে পড়ে। বেসামাল হয়ে যায়।'

হতাশ হয়ে বিভূতিবাবু বললেন—'তাহলে উপায়?'

—'উপায় একটা আছে। তার আগে আজকেই বাড়ি গিয়ে কোন

পরিচ্ছেদে কত শব্দ আছে গুনে ফেলুন। তারপর ছাঁটকাট করেই হোক অথবা বাড়িয়েই হোক এক পরিচ্ছেদের সঙ্গে আরেক পরিচ্ছেদের সামঞ্জস্য রাখতে হবে। একেবারে নিক্তির ওজনের ব্যাপার কিনা।'

এ-কথার পর বিভূতিবাবু বেশ দমে গেলেন। এতদিন ধরে এত পরিশ্রম করে অন্তরের সমস্ত বেদনা ঢেলে যে-উপন্যাস লিখলেন—শুধু অঙ্কের ভুলে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

উপেনদা ঝান্থ ঔপন্যাসিক। মানবচরিত্র নিয়ে তাঁর কারবার। বিভূতিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝে ফেললেন ওর মানসিক অবস্থা। উৎসাহ দিয়ে বললেন—

'এতে মুষড়ে পড়বার কিছু নেই। যতক্ষণ আমি আছি ভাই, তোমার লেখার লাগি কোন ভয় নাই। আপনি শুধু পরিচ্ছেদগুলির শব্দ আজ গুনে ফেলুন, আগামী কাল একটু বেলা-বেলি চলে আসবেন আড্ডার অন্যান্য বন্ধুরা হাজির হবার আগেই। তবে হ্যাঁ, উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা সঙ্গে আনা চাই। আমার একবার দেখা দরকার।'

এই আশ্বাসবাণীর পর বিভূতিবাবু যেন ভরাডুবির মুখে তক্তা খুঁজে পেলেন। এদিকে কথায় কথায় রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। মেঘান্ধকার রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতেও হবে বহুদূর। উপেনদার কাছে বিদায় চেয়ে পকেট থেকে দেশলাই বার করে লণ্ঠনটা জ্বালালেন, তারপর ছাতা ও লাঠি বগলদাবা করে ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে পথে নেমে পড়লেন। রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার সময় উপেনদা বললেন—

'কাল আসা চাই কিন্তু, লেখাটাও আনতে ভুলবেন না।'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিভূতিবাবু বিদায় নিলেন। বিভূতিবাবুর ছায়ামূর্তি আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—লণ্ঠনের আলোটার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে উপেনদা তখনও তাকিয়ে।

যে-আকাশে সূর্য-চন্দ্র বিরাজমান, সেই আকাশেই একদিন লণ্ঠনের এই ক্ষীণ আলো 'পথের পাঁচালী' নিয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দেখা দেবে—এ-কথা কি দূরে অপস্রিয়মাণ আলোকরশ্মির দিকে চোখ মেলে রেখে উপেনদা সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন ?

সে-রাত্রে বিভূতিবাবুর চোখে ঘুম নেই। শুধু উপন্যাসের পরিচ্ছেদের শব্দ-

রাজি গুনেই চলেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে ১৬শ শব্দ, দ্বিতীয়তে হাজার। তৃতীয় আর চতুর্থ প্রায় সমান, পঞ্চম খুব ছোট আর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ বিরাট বড়। শব্দ সংখ্যার আঙ্কিক হিসাব করতে করতে শেষ রাত্রে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন তাড়াতাড়ি জমিদারী সেরেস্তার কাজকর্ম চুকিয়ে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তপ্ত রোদ আর হাওয়ার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন বাঙালীটোলার পথে। হাতে সেই লণ্ঠন আর লাঠি, শুধু ছাতার বদলে কাগজে মোড়া কয়েকটি খাতা।

বৈঠকখানায় উপস্থিত হয়েই দেখেন উপেনদা ওঁরই প্রত্যাশায় প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। ঘরে প্রবেশ করতেই বললেন—'কই, খাতা এনেছেন!'

খবরের কাগজে-মোড়া বাণ্ডিলটা উপেনদার সামনে টেবিলের উপর রেখে লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে অন্যান্য দিনের মত ঘরের শেষ প্রান্তের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে উপেনদা বললেন—

'যা আশংকা করেছিলাম তাই। পরিচ্ছেদের মধ্যে তো শব্দসংখ্যার মিল নেই মনে হচ্ছে। ভাল করে গুনে দেখেছেন?'

'কাল সারারাত ধরে গুনেছি, আগাগোড়া গরমিল।'

গালে হাত দিয়ে উপেনদা স্তব্ধ হয়ে কী যেন চিন্তা করতে লাগলেন। কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। এমন সময় আড্ডার দু-তিনজন ঘরে প্রবেশ করতেই খাতাগুলি খবরের কাগজে মুড়ে টেবিলের ড্রয়ারে ভরে ফেলে বিভূতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—'আমার কাছে রইল। অবসর মত আমি একবার পড়ে দেখতে চাই।'

যথারীতি আড্ডা জমে উঠল। বিভূতিবাবু নীরব শ্রোতা হয়ে যেমন বসে থাকেন তেমনি বসে রইলেন। বৈঠক শেষে লণ্ঠন জ্বালিয়ে ধীর পদক্ষেপে ফিরে গেলেন ওঁর ডেরায়।

দিন আসে দিন যায়। উপেনদা সেই পাণ্ডুলিপির কথা কিছুই বলেন না, বিভূতিবাবুও আর জিজ্ঞাসা করেন না। এইভাবে মাস দুই কেটে যাবার পর বৈঠক ভাঙবার মুখে উপেনদা বিভূতিবাবুকে বললেন—'আপনি চলে যাবেন না, কথা আছে।'

বিভূতিবাবুর মন সংশয় দোলায় দুলে উঠল। কী জানি কি বলবেন! আসরের সবাই একে একে প্রস্থান করলে উপেনদা বিভূতিবাবুকে তাঁর টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে এসে বসতে বললেন। কাছে এসে বসতেই ড্রয়ার থেকে খাতাগুলি বার করে বললেন—'আমি আগাগোড়া পড়েছি। আপনার হবে। হবে কেন? হয়েছে।'

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিভূতিবাবুর মুখ। তবু দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করলেন—'কিন্তু অঙ্ক?'

—'অঙ্কে বেশ কিছু গরমিল অবশ্য আছে। তবে তাতে কিছু যায়-আসে না। ওটা আমি একটু কাটছাঁট করে ঠিক করে দেব। তাছাড়া সব লেখা কি অঙ্ক দিয়ে বিচার করলে চলে? না বিচার করা উচিত? ব্যতিক্রমও তো ঘটতে পারে। আচ্ছা, উপন্যাসটা আপনি কোথাও প্রকাশের কথা চিন্তা করেছেন কি?'

বিভূতিবাবু কিছুক্ষণ মাটির দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সেই-ভাবেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—

'কলকাতায় থাকতেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় দিয়েছিলাম। এখানে চাকরি নিয়ে চলে আসবার সময় খোঁজ নিতে গিয়ে ফেরত পেলাম।'

গুম্ হয়ে গেলেন উপেনদা। মজলিশী মেজাজের হাসিখুশী মানুষটা এক মুহূর্তে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ঘরের আবহাওয়াও যেন ভারী হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ নীরবতার পর উপেনদা গম্ভীর গলায় বললেন—'আপনি ভাববেন না। এই উপন্যাস প্রকাশের ব্যবস্থা আমিই করব। ধরে নিন, আপনি আপনার একমাত্র সন্তানকে আমার হাতে সমর্পণ করে গেলেন। এর ভার আজ থেকে আমিই নিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান।'

কৃতজ্ঞতায় বিভূতিবাবুর মন ভরে গেল। বিদায় নেবার সময় ধুলোভর্তি কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের কোণ মুছে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—'আমার এই লেখা প্রকাশ হোক আর নাই হোক, মনে আর কোন খেদ নেই।'

আরও মাস দুই পার হবার পর উপেনদা একদিন বিভূতিবাবুকে নিভৃতে ডেকে বললেন—'আমি ভাগলপুর ছেড়ে আবার কলকাতায় চলে যাচ্ছি। এ-কথা আড্ডার আর কাউকে বলবেন না, বাগড়া দেবে।'

বিভূতিবাবু অবাক হয়ে উপেনদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

উপেনদা হেসে বললেন—'অবাক হচ্ছেন তো? তবে শুনুন। কলকাতায় গিয়ে আমি একটা মাসিক পত্রিকা বার করছি।'

'আপনি? সে তো শুনেছি অনেক টাকার ব্যাপার।'

'টাকার ভাবনা আমার জামাইয়ের। বুঝেছেন, আমার জামাইয়ের কোলিয়ারী-টোলিয়ারী আছে। অনেক টাকা। ভজিয়ে-ভাজিয়ে তো এ-লাইনে নামতে রাজি করিয়েছি। এখন রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রকে একসঙ্গে নামাতে পারলেই কেল্লা ফতে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আপনার উপন্যাস আমিই ছাপব।'

সত্যি সত্যিই উপেনদা ভাগলপুরের পাট গুটিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়। তার কয়েক মাস পরেই মহা সমারোহে প্রকাশিত হল 'বিচিত্রা'। প্রকাশ বললে ভুল হবে, বলা উচিত আবির্ভাব। প্রথম সংখ্যা যেদিন বেরলো, তার আগের রাত্রে টালা-টু-টালিগঞ্জ—কলকাতার দেয়াল বিচিত্রার পোস্টারে ছেয়ে গেল। পত্রিকার কর্মকর্তারা ট্যাক্সি করে অধিক রাত পর্যন্ত সারা কলকাতা ঘুরে দেখলেন পোস্টার কেমন দেখতে লাগছে। সুতরাং খরচের বহরটা এই থেকেই অনুমান করে নিন। যাকে বলে এলাহি কারবার, ঢালোয়া ব্যাপার। সে ইতিহাস কারও অজানা নয়।

ওদিকে ভাগলপুরের নির্জনে বসে বিভূতিবাবু আশা নিয়ে মাস গুনছেন, উপন্যাস আর বেরোয় না। চিঠি লেখেন না, পাছে উপেনদা বিরক্ত হন। কিন্তু ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে।

কী একটা উপলক্ষ্যে বেশ কিছুদিনের ছুটি থাকায় বিভূতিবাবু কলকাতা যাওয়া স্থির করলেন।

ফড়িয়াপুকুর লেন-এর দোতালার একটি ঘরে জোর আড্ডা বসেছে। সোফা-সেটি-টিপয় সজ্জিত প্রকোষ্ঠে জন পাঁচেক স্যুটেড্-বুটেড্ ভদ্রলোক চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলে তর্ক করে চলেছেন সাহিত্যে শ্লীলতা আর অশ্লীলতা নিয়ে। সকলের মুখেই সিগারেট জ্বলছে, ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। সেণ্টার টেবিলে দামী ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের টিন, চায়ের কাপ ইতস্তত ছড়ানো। ঘরের এক কোণে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটি যুবক টেবিলের উপর একরাশ

প্রুফ নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করে চলেছেন, বিতর্কে বিগতস্পৃহ। ইনিই 'বেদে'র লেখক অচিন্ত্যকুমার।

এমন সময় দরজার সামনে এক ভদ্রলোক উঁকি মারতেই পাঁচ-জোড়া চোখ তার উপর পড়ল। এত বাঙালী সাহেব-সুবো দেখে আগন্তুক খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে দরজার ওপারেই দাঁড়িয়ে রইলেন, ঘরে আর ঢুকলেন না। আধময়লা ধুতি, তাও প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি। জুতোর চামড়া ব্ল্যাক না ব্রাউন কলকাতার পথের ধুলোয় চেনবার উপায় নেই। গায়ে পাঞ্জাবি, তার দু-চার জায়গায় রিপুকর্মের চিহ্ন প্রকট। হাতে রয়েছে চটের থলি।

ঘর থেকে কে-একজন তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বললেন—

'কী চান এখানে? আপনি কি এজেণ্ট? কোথাকার এজেণ্ট? আপনাকে কিন্তু দশ কপির বেশি পত্রিকা দিতে পারব না। ভয়ানক ডিমাণ্ড। যান্ ওই কোণের ভদ্রলোকের কাছে টাকা জমা দিন।'

'আমি এজেণ্ট নই।'

'তবে কি লেখক? কবিতা লিখেছেন? নাম ঠিকানা সমেত ওই কোণার ভদ্রলোকের কাছে জমা দিয়ে যান।'

'আমি লেখকও নই, কবিতা দিতেও আসি নি। আমি এসেছি পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে।'

'উপেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে? তিনি এখনও আসেন নি। আপনার যা দরকার কোণের ভদ্রলোকটিকে বলে গেলেই চলবে।' এক নিশ্বাসে কথাগুলি আগন্তুকের উপর ছুঁড়ে মেরে বক্তা আবার পূর্ব আলোচনার সূত্রে ফিরে গিয়ে বললেন—'যাই বলুন অমলবাবু, ডি. এইচ. লরেন্সকে নিয়ে একদল ছোকরা-লেখক যে-রকম মাতামাতি করছে—'

এমন সময় উপেনদা এসে হাজির। দরজার কাছে যে-লোকটি এতক্ষণ ফিরে যাব-কি-যাব না ইতস্তত করছিল তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে ঘরে টেনে এনে বললেন—

'কী খবর বিভূতিবাবু। কবে কলকাতায় এলেন? ভাগলপুরের সব খবর ভাল তো? বসুন, বসুন।'

সোফায় সমাসীন যে-ভদ্রলোক তাঁকে এজেণ্ট ঠাউরেছিলেন তাঁর পাশেই জায়গা ছিল বসবার। বিভূতিবাবু বসলেন না। দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন

—'আজই সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি, রাত্রেই গ্রামে চলে যাব। হাতে একটু সময় ছিল, তাই আপনার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।'

'তা এসে ভালই করেছেন। আপনাকে সুখবরটা দিই, আগামী সংখ্যা থেকেই আপনার উপন্যাস বেরোচ্ছে।'

এতক্ষণ যাঁরা তর্কে ঘর সরগরম করে রেখেছিলেন তাঁরা এবার একেবারে চুপ। বার বার তাঁরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন বিভূতিবাবুর পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা।

বিভূতিবাবু আর মুহূর্তমাত্র না দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। সেদিনের কলকাতা শহরের সন্ধ্যার আনন্দ তিনি কোনদিন ভোলেন নি। পরবর্তী জীবনে প্রায়ই আমাদের বলতেন—'ছাখ, কলকাতা শহর আমার কোনদিনই ভাল লাগে না। গ্রামে আর অরণ্যেই আমি শান্তি পাই। তবে হ্যাঁ, সেদিন সন্ধ্যায় 'বিচিত্রা' অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে কলকাতা শহরটাকেও আমি ভালবেসেছিলাম।'

একটানা গল্প বলে আমাদের বৈঠকের গাল্পিক বন্ধু থামলেন। 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশের কাহিনী তন্ময় হয়ে আমরা শুনছিলাম আর ভাবছিলাম বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য 'বিচিত্রা'-র মত পত্রিকাও উঠে গেল, উপেনদার মত সম্পাদকও আমরা আর পেলাম না। আর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়? বাংলা-সাহিত্যে বিভূতিভূষণের মত মানবদরদী ও প্রকৃতিপ্রেমী কথা-সাহিত্যিক কি আর দেখা দেবে?

গাল্পিক সাহিত্যিক ইত্যবসরে দম ভরে আরেক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন —পরের মাস থেকেই বিচিত্রায় 'পথের পাঁচালী' বের হতে লাগল। সাহিত্য-রসিক মহলে সাড়া পড়ে গেল—কে এই লেখক?

হঠাৎ একদিন শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস খোঁজখবর নিয়ে বিভূতিবাবুর কাছে এসে হাজির। নব্বই-টা টাকা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—'পথের পাঁচালী' বই আকারে আমি ছাপব।

অবাক হয়ে গেলেন বিভূতিবাবু। ন-ব্ব-ই-টা-কা!! এ-যে কল্পনাতীত।

এইটুকু বলেই গাল্পিক বন্ধু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। আমরা অধৈর্য হয়ে বললাম—'সে কী! উঠে পড়লেন যে? 'পথের পাঁচালী'র কাহিনী তো শুনলাম। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটনাটা তো বললেন না?'

দরজার দিকে চলতে চলতে গাল্পিক বন্ধু বললেন—'রাত কত

হল খেয়াল আছে? 'অতসী মামী' গল্প প্রকাশের ঘটনাটা আরেক দিন হবে।'

এতক্ষণে আমাদের হুঁশ হল। রাত সাড়ে ন-টা কখন বেজে গেছে টেরও পাই নি।

॥ ১৩ ॥

এতদিন ধরে আমাদের বৈঠকের পুরনো কাহিনীই আপনাদের শুনিয়ে এসেছি, এবার বলি হালফিলের একটা ঘটনা।

'আনন্দ পুরস্কার' কমিটি স্থির করলেন আনন্দবাজার পত্রিকার তরফ থেকে সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হবে স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে, যাঁর কথা ইতিপূর্বে আপনাদের শুনিয়েছি। 'দেশ' পত্রিকার তরফ থেকে প্রফুল্ল কুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হবে 'বনফুল'কে, তাঁর সাহিত্যকর্মে সামগ্রিক দানের কথা বিবেচনা করেই।

আনন্দ পুরস্কার কমিটির একজন প্রধান সদস্য বললেন—'বনফুলকে আনন্দ পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত করে সমীচীন কাজই হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছি আমি। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করেছি সাহিত্যিকদের সরকারী পুরস্কার দেওয়াটাকে বনফুল তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে আসছেন নানা সভা সমিতির বক্তৃতায়। সুতরাং আনন্দ পুরস্কারের এই সিদ্ধান্ত পত্রিকায় প্রকাশের আগে তাঁর একটা মৌখিক অনুমতি নিয়ে রাখা উচিত। যদি প্রত্যাখান করেন?'

অপর একজন সদস্য এ-কথার মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন—'আমাদের এই পুরস্কার তো সরকারী পুরস্কার নয়, নিতান্তই বেসরকারী। তা ছাড়া এই পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত লেখক, পত্রিকা প্রকাশের প্রথম আমল থেকে আজও লিখে আসছেন। তা ছাড়া যাঁর স্মৃতিবিজড়িত এই পুরস্কার তাঁর সঙ্গেও বনফুলের ছিল দীর্ঘদিনের প্রীতির সম্পর্ক। আমাদের তো মনে হয় না এ-পুরস্কার তিনি প্রত্যাখান করবেন।'

প্রধান সদস্য বললেন—'সবই তো বুঝলাম। তবু কথায় বলে সাবধানের মার নাই। তার সম্মতিটুকু জেনে নিয়ে ঘোষণা করলে দোষ কি?'

অন্যান্য সদস্যরা অত্যন্ত ভাবিত চিত্তে মাথা নেড়ে সায় দিলেন 'সেটা চিন্তার বিষয়। সম্মতি নিলে দোষটা কি?'

এক বাক্যে যখন স্থির হল সম্মতি নিয়েই ঘোষণা করা উচিত, তখন আমার উপর ভার পড়ল পরদিনই বনফুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর অনুমোদন আদায় করে আনা চাই। সম্প্রতি বনফুল কলকাতায় তাঁর ছেলের বাড়িতে আছেন, দু-একদিনের মধ্যেই ভাগলপুর চলে যাবেন।

বনফুলের সঙ্গে পত্রযোগে আমার পরিচয় বিশ বছরের কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না বললেই চলে। বর্মণ-স্ট্রীটের অফিসে থাকতে যখন 'স্থবির' উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশের কথা পাকাপাকি স্থির হলো তখন পাণ্ডুলিপি নিয়ে সে-অফিসে একবার এসেছিলেন, দু-চার মিনিটের মামুলী কথাবার্তার পর চলে গেলেন। এর পর দীর্ঘ বছর পার হয়ে গেছে। চিঠিপত্রেই আদান প্রদান চলে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ আর হয় নি।

সেদিন যখন সবাই কাজের ভারটা আমার উপর চাপিয়ে দিলেন, আমি মনে-মনে প্রমাদ গনলাম। প্রথমত বনফুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ কোন দিনই আমি পাই নি। বেশীরভাগ সময়েই তিনি থাকেন কলকাতার বাইরে ভাগলপুরে। মাঝে-মাঝে দু-চার দিনের জন্য কলকাতায় যখন আসেন তখন তাঁর কাছে যাবার পাঁয়তারা কষতে-কষতেই শুনি বনফুল ভাগলপুরে ফিরে গেছেন। তাছাড়া বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে আমার নিজেরই একটা সঙ্কোচ আছে, ভয়মিশ্রিত সঙ্কোচ। একে নামী ও মানী সাহিত্যিক, তদুপরি বয়সে অনেক বড়। কাছে না হয় গেলাম। কিন্তু আমার নিতান্ত নিম্নমধ্যবিত্ত বুদ্ধি আর বিদ্যা নিয়ে কী কথা বলব? কাজ তো করি যজ্ঞিবাড়ির পাচক ঠাকুরের। ভিয়েন চড়ানো আর পরিবেশন করা। দু-চার লাইন লিখবার ক্ষমতাও যদি থাকত সেই সুবাদে সাহিত্যিক-তকমা এঁটে লেখকমহলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘোরাফেরা করতে পারতাম। কিন্তু এখন উপায়? বনফুলের কাছে একলা যেতে ভরসা হয় না, যদি চিনতে না পারেন? শুনেছি কাগজের লোক আর পুস্তক প্রকাশকদের উপর নাকি ভীষণ খাপ্পা। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে গেলেই পাণ্ডারা যেমন নিমেষে প্রাণটা কণ্ঠাগত করে তোলে—কলকাতায় এলেই কাগজের লোকরা লেখার জন্য মাছির মত লেগে থাকে। আজকাল তাদের দেখলেই নাকি ব্লাডপ্রেশার চড়চড় করে বেড়ে যায়, মুখে যাচ্ছেতাই করেন। এ-হেন মেজাজী মানুষটার

কাছে একা-একা যাই কোন ভরসায়! অগত্যা উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈবাহিক সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হলাম। সুবলবাবু সম্প্রতি আনন্দ-বাজার পত্রিকায় কাজে যোগ দিয়েছেন। দীর্ঘকাল 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই কারণে বহু প্রবীণ সহিত্যিকের সঙ্গেই ওঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। আমার সঙ্গেও সুবলবাবুর পরিচয় দীর্ঘ দিনের, উপস্থিত সে পরিচয় অনুজের প্রতি জ্যেষ্ঠের স্নেহশীল সহৃদয়তার পর্যবসিত। আমার সঙ্গে সুবলবাবুর চরিত্রগত কিছু মিল আছে, আমরা উভয়েই পানদোষে দুষ্ট। আমাদের অফিসের উল্টোদিকে ছোট্ট একটা পানের দোকান আছে। অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে দোকানে গিয়ে জর্দা দিয়ে পান খাই। আমাকে দূর থেকে দেখলেই পানওয়ালা তরিবত করে আগে ভাগেই পান সেজে রাখে, এটা এখন ওর চিরাচরিত প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে।

পানের দোকানে আমাকে দেখলেই সুবলবাবুরও পান খাবার নেশা চাগিয়ে ওঠে। কাজে-অকাজে সবসময় সুবলবাবু একটু ব্যস্তবাগীশ লোক। পানের দোকানে পান খেতে এলেও ব্যস্ততার অন্ত নেই, যেন এখনই ট্রেন ধরতে হবে।

একদিন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সুবলবাবু হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে রাস্তা পার হয়ে আমার কাছে এসেই বললেন—'দোকানের জর্দা খেয়ো না, বেনারস থেকে তিন হেঁচকির পাতি জর্দা এনেছি, খেয়ে দেখ।'

তিন হেঁচকির জর্দা? সে আবার কি! পান-জর্দা বহুকাল ধরেই খেয়ে আসছি কিন্তু এরকম একটা উদ্ভট নাম তো কোনদিন শুনি নি।

আমাকে একটু বিস্মিত হতে দেখে সুবলবাবু পকেট থেকে একটা কৌটা বার করে বললেন।—'বেনারসে পাঁচ হেঁচকির জর্দাও আছে। সে-জর্দার পিক গিললে মিনিটে পাঁচবার হেঁচকি ওঠে। এটা অনেক মাইল্ড, মিনিটে মাত্র তিন বার হেঁচকি উঠবে। খেয়েই ছাখ না।'

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম—'খেতে রাজি আছি কিন্তু হেঁচকি তুলতে রাজি নই।'

এ কথার পর সুবলবাবু যেন একটু চটেই গেলেন। বিরক্তির সঙ্গে বললেন—'তোমার কথা শুনে কি মনে হয় জানো? পৃথিবীতে এক জাতের মানুষ আছে যারা মদ খায়, নেশা করে না। প্রেম করে, বিয়ে করে না।

ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যায়, জুয়া খেলে না। জেনে রেখো, এরা সাংঘাতিক মানুষ। কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক হচ্ছে যারা জর্দা খায়, হেঁচকি তোলে না।'

মানব চরিত্র সম্পর্কে সুবলবাবুর অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশী, কারণ উনি অনেক ঘাটের জল-খাওয়া লোক। তাই ওঁর কথায় প্রতিবাদ না করে বললাম—'আমাকে একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিতে হবে।'

'কী বিপদ ?'

'কাল দুপুরে বনফুলের কাছে আমাকে যেতে হবে, সঙ্গে আপনার থাকা চাই। আমাকে তো চেনেন না। শেষকালে যদি তাড়িয়ে দেন।'

অভয় দিয়ে সুবলবাবু বললেন—'ঠিক আছে, যাব তোমার সঙ্গে। বনফুল আমার বহুকালের পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি সঙ্গে যখন আছি তোমার কাজ হাসিল হবেই।'

পরদিন দুপুরে বেলা তিনটা নাগাদ সুবলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলাম জোড়াসাঁকোর দক্ষিণে সি আই টি বিল্ডিং-এ। বনফুল এখানে তাঁর বড় ছেলের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছেন। চারতলার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে দরজার কড়া নাড়তেই একটি কিশোরী কন্যা এসে দরজা খুলে দিল।

সুবলবাবু বললেন—'কী রে, তোর বাবা বাড়ি আছেন ?'

মেয়েটি বললে—'বাবা আছেন কিন্তু ঘুমুচ্ছেন।'

এ-কথার পর আমি সত্যিই ঘাবড়ে গেলাম। অসময়ে এসে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে যদি ওঁর মেজাজ বিগড়ে যায়।

সুবলবাবু সে-কথায় কিছুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে চৌকাট পার হয়েই ভিতরে ঢুকে বললেন—'ঘুমোচ্ছে তো কী হয়েছে। ডেকে তোল, বল সুবল কাকা এসেছে।'

ডেকে তুলতে হল না। গলার আওয়াজ শুনেই পাশের ঘর থেকে উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান এল—

'কে সুবল ? এস এস, আমি জেগেই ঘুমোচ্ছি।'

এই ছোট্ট কথাটির মধ্যে অন্তরঙ্গতার সুর যেন মিশে ছিল। সুবলবাবুর পিছনে আমিও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

দক্ষিণের জানলার ধারে একটি খাটে বিশাল-বপু বনফুল খালি গায়ে শুয়ে আছেন, পরনে লুঙ্গি। সুবলবাবু পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই আমি

প্রণাম করে নিজের নাম বললাম। উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন বনফুল। আমার হাত ধরে বিছানার পাশে বসিয়ে বললেন—

'আরে, তোমার চেহারা যে অনেক পাল্টে গেছে। বহু বছর আগে তোমাকে দেখেছিলাম পাতলা চেহারা, এখন মোটা হয়ে গেছ।'

এ কথার পর বনফুল সম্বন্ধে আমার ভয় কেটে গেল, ধারণাও বদলে গেল। বিছানায় শুয়েই তিনি আলাপ জুড়ে দিলেন, যেন কত কালের চেনা মানুষ আমি। বনফুলের বিশাল দেহের দরাজ হৃদয়ের অর্গল একে একে খুলে যেতে লাগল।

হঠাৎ আলাপ থামিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে গেলেন—'এই ছাখো, কথায় কথায় আসল কথাই ভুলে গেছি। কী খাবে বল ?'

আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম—'অসময়ে খাওয়ায় আমার উৎসাহ নেই। সুতরাং ওর জন্য ব্যস্ত হবেন না।'

অবাক হয়ে বললেন—'সে কি হে, সংবাদ পত্রের আপিসে তো শুনেছি এনি টাইম ইজ টী টাইম। এক পেয়ালা চা তো অন্তত খাবে।'

সুবলবাবু বললেন—'ও ব্যাপারে আমরা কখনও 'না' বলি না। তবে তা খাবার আগে যে জন্য আপনার কাছে এসেছি, সেটা বলে নেওয়াই ভাল।'

বনফুল বললেন—'তাই তো হে, কিছু একটা মতলব নিয়ে দুজনে আমার কাছে এসেছ, সেটা তো আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। তা মতলব টা কী শুনি ?'

আনন্দ পুরস্কারের বিষয়টা সবিস্তারে বুঝিয়ে বলার পর তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে বললাম—'এই পুরস্কার আপনাকে গ্রহণ করতে হবে এবং বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে সাহিত্যিকদের এক বিশেষ সমাবেশে উপস্থিত হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করতে হবে।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কী যেন ভাবলেন। আমি সশংকিত চিত্তে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি, এই বুঝি রক্তের চাপ বাড়ল। আমার সমস্ত উৎকণ্ঠা দূর করে দিয়ে বললেন—

'এ-পুরস্কার আমি গ্রহণ না করে কি পারি ? আমি তো ভাগলপুর চলে যাচ্ছি। কখন আসতে হবে আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ো, আমি নিশ্চয় আসব।'

এ-কথার পর সুবলবাবু বললেন, 'যাক, একটা দুর্ভাবনা ঘুচল। তাহলে এবার শুধু চা নয়, মিষ্টিও চাই।'

বনফুল সহাস্যে বললেন—'মিষ্টিমুখ না করিয়ে কি তোমাদের ছেড়ে দেব? যাও, তোমার বউদির কাছে খবরটা দাও আর তোমার মিষ্টির আবেদনটাও পেশ কর।'

সুবলবাবু পাশের ঘরে চলে যেতেই বনফুল আমাকে বললেন—'জানো, আনন্দবাজারের সুরেশবাবু ছিলেন সাহিত্যিকদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। শুধু আমার জীবনেরই একটি ছোট্ট ঘটনা শুনলেই বুঝতে পারবে যে সাহিত্যিকদের তিনি কতখানি ভালবাসতেন। আমার বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। ব্যাঙ্কে যা-কিছু সঞ্চয় ছিল তা প্রায় নিঃশেষ করেই বিয়ের বাজার করেছি। তখন এক সিনেমা কোম্পানী আমার একটা গল্প নিয়েছিল, কথা ছিল আমার মেয়ের বিবাহের আগেই দু-হাজার টাকা দিয়ে যাবে। তাদের কথার উপর নির্ভর করে আমি মেয়ের জন্যে একটা নেক্‌লেস্-এর অর্ডার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি, নির্দিষ্ট দিনে টাকাটা পেলেই নেকলেসটা নিয়ে আসব। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, যে-দিন দেবার কথা সেদিন তারা এসে অত্যন্ত কাতরভাবে জানালে যে টাকাটা যোগাড় করে উঠতে পারে নি আরও কিছু দিন দেরি হবে। আমার তখন অবস্থাটা বোঝ। চার দিন বাদে মেয়ের বিয়ে, নেকলেস-এর অর্ডার দিয়ে বসে আছি, সেদিনই কথা ছিল নিয়ে আসার। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। সে তো আজকের কথা নয়, বহু বছর আগের ঘটনা। তখন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে একসঙ্গে দু-হাজার টাকা বার করে দিতে পারে। তখন কলকাতায় সজনীই ছিল আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু যাকে আমার সুখ-দুঃখের কথা সবসময় অকপটেই বলে থাকি। সুবলও তা জানে। সজনী সব শুনে বললে—টাকার জন্যে মেয়েকে বিয়েতে নেকলেস দিতে পারবে না, সে কি হতে পারে? আমাদের সুরেশদা থাকতে তুমি ভাবছ কেন। তুমি নিজে সুরেশদার সঙ্গে দেখা করে সব বল, ব্যাবস্থা একটা কিছু হবেই।

সুরেশবাবু তখন থাকতেন দেশবন্ধু পার্কের উত্তরে। সজনীর কথামত পরদিন সকালেই চলে গেলাম ওঁর কাছে।

সব শুনে সুরেশবাবু বললেন—আপনার কত টাকা প্রয়োজন?

আমি বললাম প্রয়োজন আমার দু হাজার টাকার। আপনি যদি আমাকে এক হাজার অন্তত দিতে পারেন বাকি এক হাজার আমি আমার বইয়ের প্রকাশকদের কাছে থেকে চেয়েচিন্তে যোগাড় করে নিতে পারব।

সুরেশবাবু বললেন—কী দরকার আপনার টাকার জন্য আবার এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করার। দু-হাজার টাকায় আপনার হবে তো? প্রয়োজন হলে আরও কিছু নিয়ে রাখুন। মেয়ের বিয়ে, কখন কি দরকার হয়।

মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। দু-হাজার টাকাই আমার প্রয়োজন ছিল। তিনি আমাকে একটু বসতে বলে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন, কোথায় কার কাছে লোক পাঠিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ক্যাশ দু-হাজার টাকা এনে আমার হাতে দিলেন। টাকাটা দিলেন, কিন্তু কোনও রসিদ চাইলেন না। আমার মনে খটকা লাগল। টাকাটা যে আমি ধার হিসেবে নিয়েছি দান হিসেবে নয়, সেটা তো আমার জানিয়ে দেওয়া দরকার। আমি তাই ওঁকে বললাম—টাকাটার বদলে একটা হ্যাণ্ডনোট আপনাকে লিখে দিই।

এ-কথার উত্তরে সুরেশবাবু কি বললেন জানো? বললেন—বলাইবাবু, আপনার হাতই আমার হ্যাণ্ডনোট। যে-দিন খুশি লিখে শোধ দেবেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বনফুল। হয়তো সেদিনের সেই ঘটনা স্মৃতির সরোবরের স্তব্ধতাকে আন্দোলিত করেছে, আর্দ্র কণ্ঠে তিনি আবার বললেন—'সেদিনের ঘটনার পর আমি মনে মনে স্থির করে ফেললাম যে এমন একটা নতুন বিষয় নিয়ে লিখতে হবে যা বাংলা সাহিত্যে এর আগে আর কেউ লেখে নি এবং সেটাই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য কীর্তি। প্রস্তুতির জন্যে পড়াশুনোয় ডুবে রইলাম, বই কিনলাম প্রচুর। তারপর লিখলাম 'স্থাবর' উপন্যাস, যা দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। তোমার তো মনে থাকবার কথা।'

আমি বললাম—'মনে আছে বইকি। গুহা-মানবের আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে সেই উপন্যাস তো আমার হাত দিয়েই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু কথা ছিল স্থাবরের দ্বিতীয় খণ্ড আপনি লিখবেন। তার কি হল?'

একটু হেসে বললেন—'আশা ছাড়ি নি। ওঁ গণেশায় নমঃ করে খাতায় লেখা শুরুও করে দিয়েছি, এবার ফিরে গিয়ে লেখাই হবে আমার একমাত্র কাজ। ডাক্তারী থেকে তো প্রায় অবসর নিয়েছি, এখন আমার অফুরন্ত সময়।'

এমন সময় চা আর প্লেট ভরতি রসগোল্লা এসে হাজির। ভৃত্যের কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে নিজের চিনি-ছাড়া কাপটি নিয়ে বললেন—'আচ্ছা, তোমাদের কাগজে জ্যোতিষ নিয়ে কে লেখেন বল তো?'

নামটা বলতে চিনতে পারলেন বলে মনে হল না। শুধু বললেন—'রাশিফল তোমাদের কাগজে যে-ভাবে লেখা হয় তার অসুবিধা কি জানো? জ্যোতিষ সম্পর্কে পাঠকদের জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে না। যেমন ধর লেখা হলো ভৃগুর মতে বৃষ রাশিতে যাদের জন্ম এ-সপ্তাহে তাদের আর্থিক ক্ষতি ঘটবে। হাজার-হাজার পাঠকের বৃষ রাশিতে জন্ম। তাদের সকলের কি আর্থিক ক্ষতি ঘটে? অনেকের আর্থিক লাভও হয়ে থাকে। অর্থাৎ কিনা একের সঙ্গে আরের মিল হয় না। তাই বলছিলাম ও-ভাবে না লিখে প্রতি সপ্তাহে একটি রাশি নিয়ে গ্রহের অবস্থান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচনা থাকলে পাঠকরা নিজেরাই তার ফলাফল গণনা করে বার কারতে পারবে।'

জ্যোতিষ সম্পর্কে বনফুলের এতখানি উৎসাহ দেখে বিস্মিত হলাম। জ্যোতিষে আমার নিজেরই বিশ্বাস নেই। আমি তাই আমার জন্মলগ্ন জন্মরাশি নক্ষত্র ইত্যাদি কিছুই জানি না, জানবার আগ্রহও নেই। আগ্রহ ছিল না বলে বেঁচে গিয়েছি। যা হয়েছি তারই দুশ্চিন্তায় মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। তার উপর অতীতে যা হতে পারতাম আর ভবিষ্যতে যা হতে পারব সেই দুশ্চিন্তা যদি চাপে তাহলে পাগলা গারদে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ-রকম রাশি-নক্ষত্রের পাগল আমি দু-চারজন দেখেছি বলেই আমার এই ধারণা।

বনফুল নিজে ডাক্তার, তার উপর আজীবন বিজ্ঞানের ছাত্র। তাঁর যে এমন জ্যোতিষের ব্যামো আছে কী করে বিশ্বাস করি। তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনার লেখা পড়লে বোঝা যায় যে আপনার মন বিজ্ঞান-ভিত্তিক। আপনি কি মানবজীবনের ভূত ভবিষ্যতে বিশ্বাস করেন?'

বনফুল বললেন—'ত্যাখো, মানুষের জীবনে এমন অনেক অঘটন ঘটে—যুক্তি দিয়ে যার বিচার চলে না। আমারই জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটা কাহিনী তোমাকে বলি।

মনিহারীতে আমাদের বাড়িতে সাধু সন্ন্যাসীর যাতায়াত আগে ছিল। সেখানে আচমকা প্রায়ই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটত। কোথা থেকে আসেন কী তাঁর পরিচয়, কোথায় যাবেন তা জানবার কোন প্রয়োজন হত না। তাঁরা আসতেন, একদিন বা দুদিন আমাদের বাড়িতে থেকে চলে যেতেন। বহু অনুরোধ করলেও দু-একদিনের বেশী কিছুতেই তাঁরা থাকতেন না। এঁদের দেখলে মনে পড়ে যায় সন্ত কবিরের বিখ্যাত সেই উক্তি—বহতা পানি রমতা

সাধু। এমনি এক সাধুর আবির্ভাব ঘটেছিল আমাদের বাড়িতে আমাদের চরম বিপর্যয়ের সময়ে। তুমি যদি মনিহারীতে কখনও আমার বাড়িতে আস তাহলে দেখবে গঙ্গা আমার বাড়ির প্রায় গা ঘেঁষেই বয়ে চলেছে। কিন্তু আমি যে দিনের কথা বলছি তখন গঙ্গা ছিল বহু দূরে, আমার বাড়ি থেকে আধ-মাইলের ওপর দূর দিয়ে গঙ্গা বইত। হঠাৎ গঙ্গার পাড় ভাঙতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে মাস খানেকের মধ্যেই গঙ্গা একেবারে আমার বাড়ির খুব কাছে এসে পড়ল। আমার ভয় হলো যে আর দিন সাতেকের মধ্যে আমার বাড়ি গঙ্গা গর্ভে বিলীন হবে। আমাদের তখন মানসিক অবস্থা কি বোঝ। সেই সময়েই আমার পরিবারে দেখা দিল আরেক বিপদ। আমার এক ছোট ভাই, সেও ডাক্তার। তখনকার দিনে ছোট ডিস্ট্রিক টাউনে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে চক্রান্তের অন্ত ছিল না। আজও যে নেই তা নয়। হঠাৎ আমার ভাইয়ের নামে ট্রান্সফারের এক নোটিস এসে হাজির। আর এমন জায়গায় ট্রান্সফারের আদেশ এল যে সেখানে নতুন করে ঘর-সংসার পেতে চাকরি করা ওর পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ দিকে বাড়ি যায়, ওদিকে ভাইয়ের বদলি। এই ঘোর বিপদের সময় আমাদের বাড়িতে এক সাধু এসে হাজির। আমার এক আত্মীয় আমাকে পরামর্শ দিলে, সাধুকে এই আসন্ন বিপদের কথা খুলে বলতে। সাধুর কাছে আমার বিপদের কথা খুলে বললাম। চুপ করে সাধু সব শুনলেন, কোন প্রশ্ন করলেন না। ঝোলা থেকে পাসা খেলার ঘুঁটির মত তিনটে পিতলের পাশার ঘুঁটি বার করলেন, সেগুলির উপর কতকগুলি সংখ্যা লেখা। ঠিক যেমন ভাবে পাশার ঘুঁটি চালে, সেই তিনটি সেইভাবে মেঝেতে চাললেন। সংখ্যাগুলি যা দেখা দিল তা নিয়ে মনে মনে যেন কী হিসাব করলেন। খুব গম্ভীর আর চিন্তান্বিত মুখ সাধুর। তাহলে কি এ-বিপদ থেকে মুক্তির কোন আশাই নেই? কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম সাধুর মুখে উজ্জ্বল হাসি দেখে। আমার মুখের উপর প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে সাধু বললেন—'গঙ্গা মাঈ যহাঁতক আ পৌছি উহিঁই ঠহর গয়ী, ঔর আগে ন বঢ়েগী।'

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলাম—'মেরা ভাইয়া কো বদলি?'

সাধু আবার মেঝের উপর ঘুঁটি চেলে নম্বর গুনলেন। আবার সেই চিন্তান্বিত মুখ, আবার উদ্বেগ। এবারেও সাধুর মুখে সেই প্রসন্ন হাসি। তিনি বললেন—'ফিকৃর মত করো বেটা, তুমাহারা ভাইয়াকো বদলি ন হোগা।'

সাধু সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'উনি কি তিব্বতী সাধু ছিলেন ?'

বনফুল বললেন—ওঁর চোস্ত হিন্দী জবানী শুনে তিব্বতী বলে তো মনে হল না। কিন্তু তিব্বতী বলে তোমার ধারণা হল কেন ?'

আমি বললাম—'সম্প্রতি একটি ইংরেজী বইয়ে পেয়েছি এই ধরনের গণনা পদ্ধতির প্রচলন তিব্বতী জ্যোতিষীদের মধ্যেই বেশী।'

বনফুল বললেন—'এমনও হতে পারে যে কোন তিব্বতী গুরুর কাছ থেকেই উনি এই ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। আমি তো আগেই বলেছি যে এ-সব সাধুর পূর্বপরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য। যাক্, যে-কথা বলছিলাম। তারপর কি হল জান ? সত্যি সত্যি গঙ্গা আজ যেখানে রয়েছে সেদিন থেকে সেখানেই থেকে গেল। এত বছর পার হয়ে গিয়েছে, এক ইঞ্চি আর এগোয় নি। যদি কখনও মনিহারীতে আমার বাড়ি আস তুমি নিজেই দেখে বিস্মিত হবে।'

অবিশ্বাসীর মন নিয়েই আমি বললাম—'ও রকম কাকতালীয় ব্যাপার প্রায়ই হয়। ভৌগোলিক কারণেই গঙ্গা আপনার বাড়ি পর্যন্ত এসে তার গতি পালটেছে।'

বনফুল সাধুসন্ন্যাসীতে বিশ্বাসী হলে কি হবে। যুক্তিবাদী মনটা যাবে কোথায়। আমার কথাকে সরাসরি উড়িয়ে না দিয়ে বললেন—'মানলুম সে কথা। ওটা কাকতলীয় ব্যাপার হলেও হতে পারে। কিন্তু পরদিন সকালেই টেলিগ্রাম এল, ভাইয়ের বদলির অর্ডার ক্যানসেলড। এটাকেও কি তুমি কাকতলীয় বলে উড়িয়ে দিতে চাও ?'

এ-কথার পর মচকালেও ভাঙ্গি নি। তাই বললাম—'এ ঘটনার পিছনেও অন্য কোন কার্য-কারণ ছিল, অনুসন্ধান করলেই জানতে পারতেন।'

বনফুল বললেন—'তা-ও কি আর জানি নি, জেনেছি। ব্যাপারটা কি হয়েছিল শোন। ভাইয়ের বদলির আদেশ দিয়েছিলেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান। কিন্তু তখন এক সিভিল সার্জন ছিলেন বাঙালী। তাঁর সঙ্গে চেয়ারম্যানের তেমন বনিবনা ছিল না। তিনি বললেন, ডাক্তারকে বদলি করবার মালিক আমি, আপনি নন। আমি যখন কাউকে বদলি করতে বলব তখন আপনি তার ব্যবস্থা করবেন। তার আগে নয়। এখনই বদলি নাকচ করে টেলিগ্রাম করে দিন।

সেই টেলিগ্রাম এল কি না সাধুর গণনার পরের দিন সকালে। সাধুকে

আমি প্রণামী হিসেবে কিছু টাকা ও কাপড়চোপড় দিতে চাইলাম, কিছুতেই গ্রহণ করলেন না। বিকেলেই উনি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। সেদিনের পর আজ পর্যন্ত সেই সাধুর কোনও সন্ধান আমি পাই নি।'

এবার সত্যিই আমার অবাক হবার পালা। বনফুল আমার বিমূঢ় অবস্থা দেখে বললেন—'কি, আর যে তর্ক করছ না। শুনে অবাক হয়ে গেলে তো? এ আর কি শুনলে? এর চেয়েও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে।'

ধীরে ধীরে কী যেন একটা নেশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সেটা কি বনফুলের মুখে গল্প শোনার নেশা? না কি অলৌকিক ঘটনা শোনার নেশা যা যুক্তি আর বুদ্ধিকে আস্তে আস্তে অবশ করে ফেলে। আমি শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতেই বনফুল বললেন—

'বিহারের ভূমিকম্প যেবার হয়েছিল সে-সময় ভাগলপুরে আমি ছোট্ট একটা একতলা বাড়িতে থাকতাম। ছোট সংসার। স্ত্রী, একটি মেয়ে, একটি ছেলে। ছেলেটি তখন কোলের শিশু। সামনের ঘরে ছিল আমার ল্যাবরেটরি, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি সব থাকত। পিছনে থাকতাম আমরা। ভূমিকম্প যেদিন শুরু হল সেদিনটি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। দুপুরবেলা হঠাৎ শুরু হল প্রচণ্ড কম্পন। দরজা জানলা খাট টেবিলগুলোকে যেন কোন এক অদৃশ্য হাত আছড়ে ভাঙতে চাইছে। তৎক্ষণাৎ স্ত্রী, কন্যা আর শিশুপুত্রটিকে নিয়ে একেবারে যাকে বলে একবস্ত্রে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম সামনের ফাঁকা মাঠে। সেখানে কম্পনের তীব্রতা এত বেশী যে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই, আছড়ে ফেলে দেবে। তাই মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলাম সেই মাঠে, আর চোখের সামনে দেখলাম আমার বাড়িটা ফেটে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ল, একেবারে ভগ্নস্তূপে পরিণত হল। নতুন দামী যন্ত্রপাতি কিনে সবে প্যাথলজির লেবরেটরি করেছিলাম তা ইটের স্তূপে চাপা পড়েছে। আমার নতুন তৈরী লেবরেটরিটা গেল, সেইটিই আমার দুঃখ। আমার স্ত্রীর দুঃখ তাঁর গয়না থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় জিনিস ইটের তলায় হয়তো তছনছ হয়ে গেছে। সমস্ত ভাগলপুর শহরটাই মুহূর্তের মধ্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, চারিদিকে কান্নার রোল আর হাহাকার। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কোনরকমে রাতটা আমার এক পরিচিত বন্ধুর আস্তানায় কাটিয়ে পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়লাম কুলির সন্ধানে।

ভূমিকম্পের সময় যে-পাঞ্জাবিটা গায়ে ছিল তার পকেটে ছিল মাত্র দুটি টাকা। সেই দুটি টাকাই ছিল আমার শেষ সম্বল। পোস্টাফিস ভেঙেচুরে একাকার, উপায় ছিল না টাকাকড়ি তুলবার। টাকা যোগাড় করব কোথায়? সকলেরই তো এক অবস্থা, শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেই যথেষ্ট। সেই দুটি টাকার কড়ারে জন চার কুলি সংগ্রহ করলাম আমার বাড়ির সেই ভগ্নস্তূপ থেকে জিনিসপত্র উদ্ধারের জন্য। বাড়ির কাছেই ছিল একটা ছোট্ট ক্যালভার্ট। কুলিরা কাজ করছে, আমি ক্যালভার্টে বসে তদারক করছি। মাঘ মাসের শীত, হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। কনকনে সেই ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ের চামড়ায় ছুঁচের মত বিঁধছে। অনেক কষ্টে রক্তপরীক্ষার যন্ত্র মাইক্রসকোপ, আর কোলোরিমিটারটা অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা গেল কিন্তু মল-মূত্র পরীক্ষার ইলেকট্রিক সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রটা ভেঙে চুরমার। পাঁচ শ টাকা দিয়ে যন্ত্রটা নতুন আনিয়েছিলাম। চুপচাপ বসে আছি। দুপুর বেলা, রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। কুলিরা এক-এক করে জিনিসপত্র উদ্ধার করে আনছে আর আমি সেই ভাঙাচোরা জিনিসগুলোর দিকে শ্মশান-বৈরাগ্যের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছি।

হঠাৎ কোত্থেকে এক বেহেড্ মাতাল আমার কাছে এসে উপস্থিত। খালি গা, পরনে একটুকরো ছেঁড়া কাপড়। প্রায়-উলঙ্গই বলা চলে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া, কিন্তু তাতে যে তার কোনরকম কষ্ট হচ্ছে বোঝা গেল না। টলতে টলতে লোকটা আমার কাছে এগিয়ে এসে বিড়বিড় করে কী যে বলল, প্রথমে বুঝতেই পারলাম না। কথা জড়িয়ে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। অনেক কষ্টে ওর কথা যখন উদ্ধার করতে পারলাম তখন বুঝলাম ও আমার কাছে টাকা চায়, আরও মদ খাবে। আমার কাছে টাকা নেই বলাতে বিশ্বাস করল না। পাঞ্জাবির বাঁ হাতের পকেটটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—'তুমহারা জেব মে দোঠো রুপাইয়া হ্যয়, মুঝকো দেও, হাম শরাব পিউঙ্গা।' তাজ্জব ব্যাপার। লোকটা জানল কি করে যে আমার পকেটে দুটো টাকাই সম্বল। টাকা দুটো পকেট থেকে বার করে লোকটাকে দেখিয়ে বললাম যে, দুটো টাকাই আছে বটে কিন্তু তা আমাকে কুলিদের দিতে হবে। লোকটা টাকার জন্যে আর পীড়াপীড়ি না করে শুধু বললে—'অভী তুমকো বত্তিশ রুপাইয়া মিল যায় গা। তব মুঝকো দো রুপাইয়া জরুর দেনা পড়ে গা। হাম্ শরাব পিউঙ্গা।'

মাতালের কথা! কোথায় টাকা পাব, কে আমাকে দেবে। ওকে একেবারে হেসে উড়িয়ে না দিয়ে এক কথায় ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। লোকটা বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে টলায়মান অবস্থায় রাস্তার মোড় ঘুরে ভাঙাচোড়া বাড়ি ঘরের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

মিনিট দশ-ও পার হয় নি। দেখতে পেলাম স্টেশনের দিকের রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে আসছে। গাড়ির ছাতে বাক্স-বিছানা বাঁধা। গাড়িটা আমার বাড়ির সামনেই থেমে গেল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আমারই কাটিহারবাসী পরিচিত এক রুগীর পুত্র আর পুত্রবধূ। প্রণাম করে বললে—ডাক্তারবাবু, আপনার কাছেই আমরা এসেছি। যাচ্ছিলাম কাটিহারে, ভাগলপুরে এসে ট্রেন আর গেল না, লাইন খারাপ। কাল সকালের আগে লাইন ঠিক হবে না।

মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমার নিজের অবস্থা তখন শয়নং হট্ট মন্দিরে। এক রাত্রির এই অতিথি দম্পতিকে কোথায় আশ্রয় দিই। আমাকে চিন্তান্বিত দেখে ছেলেটি বললে—আমরা কিন্তু আশ্রয়ের জন্যে আপনার কাছে আসি নি। ট্রেন তো স্টেশনেই দাঁড়িয়ে আছে, ট্রেনেই থাকব সে বন্দোবস্ত করে এসেছি। ভাগলপুরে যখন কয়েক ঘণ্টা আটকা পড়েই গেছি তখন আমরা ভাবলাম আপনাকে দিয়ে আমাদের ব্লাড ও ইউরিনটা পরীক্ষা করিয়ে নিই। আমরা দুজনেই ডায়াবিটিসে ভুগছি, বাবা বহুদিন আগেই বলেছিলেন আপনাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে। আজ যখন এখানে আটকা পড়েই গেলাম তখন পরীক্ষাটা করিয়ে নেওয়াই স্থির করলাম।

হায় রে কপাল। পরীক্ষা যে করব সে-যন্ত্রপাতি তো ভেঙে চৌচির হয়ে ধুলোয় পড়াগড়ি খাচ্ছে। ছেলেটির বাবা ব্লাডপ্রেশারের রুগী, তার উপর নানা উপসর্গও আছে। বরাবরই আমার কাছে রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়ে নেন, আমার ডায়োগনসিস্-এর উপর তাঁর আস্থা আছে। কিন্তু তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর কী একজামীন করব? ভগ্নস্তূপের দিকে দেখিয়েই বললাম —দেখ আমার অবস্থা। রক্ত পরীক্ষার যন্ত্রটা কোন রকমে উদ্ধার পেয়েছে, কিন্তু অন্যটা একেবারেই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের কোন কাজেই লাগব না।

ছেলেটিও নাছোড় বান্দা।

বললে—তাহলে আমাদের রক্তটাই নিয়ে রাখুন।

হতাশ হয়ে আমি বললাম—তা না হয় নিয়ে রাখলুম। রেজাল্ট তো দু-এক দিনের মধ্যে জানাতে পারব না। লেবরেটরি আবার কোথাও খাড়া করতে সময় তো লাগবেই।

ছেলেটি বললে—তা লাগুক। অবিলম্বে রেজাল্ট জানার তাড়াহুড়ো আমাদেরও তেমন নেই, এক মাসের মধ্যে রেজাল্ট আপনার কাছ থেকে পেলাম তো ভালই না পেলে তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি আমাদের রক্তটা নিয়েই রাখুন।

বলব কি ভাই, সেই দুপুর রোদ্দুরে ধুলো বালি ঝেড়ে টেস্ট টিউব আর oxalate বার করে কোনক্রমে দুজনের রক্ত নিয়ে ব্যাগে ভরে রাখলাম। ওরাও ৩২৲ টাকা ভিজিট দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চেপে স্টেশনের দিকে চলে গেল।

বনফুল থামলেন। আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকালেন। অর্থাৎ এর কী ব্যাখ্যা তুমি করবে। আমি নিরুত্তর। সুবলবাবু বলে উঠলেন—'টাকাটা পেয়েই মাতালটাকে দুটো টাকা দিয়েছিলেন তো?'

বনফুল বললেন—'আর বল কেন ভাই। সেও এক দুর্ভোগ। কুলিদের কাজ দেখা পড়ে রইল, রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে বেড়িয়েছি সেই লোকটাকে। কোথাও তার আর দেখা পেলাম না।'

ভেবে দেখলাম এর পরে আর বনফুলের কাছে বসে থাকা নিরাপদ নয়। আমার মত ঘোর অবিশ্বাসীকে প্রায় পেড়ে ফেলেছেন। এখনও পালাতে পারলে আত্মরক্ষা করলেও করতে পারব। সেকথা বলতেই বনফুল বাধা দিয়ে বললেন—'উহুঁ, সেটি হচ্ছে না। তোমাকে সহজে ছাড়ছি নে। এটাকেও তুমি কাকতালীয় গোছের একটা কিছু যুক্তি দেখালেও দেখাতে পার। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক ঘটনা আমার নিজের চোখের সামনে ঘটেছে, সেটা অন্তত শুনতেই হবে।'

এর আগের দুটো ঘটনা আমার কাছে পাতিয়ালা পেগ-এর সামিল। একেবারে 'ভোম' মেরে গেছি। এর উপর যদি আরেকটা স্টিফ্ ডোজ পড়ে তাহলে একেবারে 'না' হয়ে যাব। কিন্তু এ ধরনের কাহিনীর একটা মজা হচ্ছে এই যে, শ্রোতাকে শেষ পর্যন্ত এ-নেশার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হয়, আমিও করে বসলাম।

বনফুল বললেন—'আমি তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। গরমের সময় দুপুরে আমাদের একমাত্র কাজ ছিল কলেজ ফাঁকি দিয়ে মির্জাপুর আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে প্যারাগন বলে যে শরবতের দোকান আছে সেখানে বসে আড্ডা দেওয়া আর ঘোলের শরবত খাওয়া। শরবতের দোকানের পাশেই ছিল একটা রোয়াক, সেখানে প্রায়ই দেখতাম একটা পাগল তার উস্কোখুস্কো চেহারা আর খোঁচাখোঁচা দাড়ি গোঁফ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। চেঁচামেচি সে কখনও করত না। তার কাজই ছিল রাস্তা দিয়ে যে-সব লোক যাতায়াত করত তাদের মুখের দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা।

এপ্রিলের শেষ, দুপুরে প্রচণ্ড গরম। রাস্তার পিচ গলে এমন অবস্থা যে জুতো আটকে যায়, হাঁটতে গেলে পা খুলে বেরিয়ে আসে। জনবিরল রাস্তা, কিন্তু পাগলটা ঠিক সেই রোয়াকে চুপচাপ বসে আছে। আমরা যথারীতি শরবতের দোকানে আসর জমিয়েছি।

হঠাৎ শুনি পাগলটা কাকে যেন প্রচণ্ড ধমকে বলছে—'খবরদার, ওদিকে এগোস্‌নি, ফিরে যা। ইনসিওর করেছিস্? না করে থাকলে এখুনি ফিরে গিয়ে কাছে পিঠে লাইফ-ইনসিওরের অফিসে গিয়ে এক্ষুনি ইনসিওর করিয়ে ফেল।'

পাগলটাকে প্রায়ই তো আমরা দেখি এবং চুপচাপ বসে থাকতেই দেখি। হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন? কৌতূহল হল। দোকান থেকে উঁকি মেরে দেখি রাস্তায় ফুটপাতে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন আর পাগলটা কিছুতেই তাকে মির্জাপুর স্ট্রীট দিয়ে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দিকে যেতে দেবে না। বারবার বলছে—ওদিকে খবরদার যাবি না। ফিরে যা।

পাগলের কথা তো। ও পাড়ার দু-একজন দোকানদার পাগলটাকে ধমকে দিলে, ভদ্রলোকও পাগলের পাগলামিতে কান না দিয়ে যে দিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই পা বাড়ালেন।

বেশীদূর যেতে হল না। রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট পর্যন্ত গেছেন, এমন সময় গলি থেকে ঝড়ের বেগে একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে এসে লোকটাকে চাপা দিল। হইহই চিৎকার শুনে আমরা ছুটে গেলাম, ভদ্রলোকের রক্তাক্ত দেহটা তুলে তখনি নিয়ে গেলাম মেডিক্যাল কলেজে। কলেজ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই সব শেষ। ফিরে এসে পাগলটাকে ধরেছিলাম।—'বল তুই কী করে বুঝলি লোকটা মারা যাবে।' কিছুই বলে না, গুম্ হয়ে বসে থাকে। অনেক

সাধাসাধির পর বলেছিল—'লোকটার মুখ দেখেই বুঝেছিলাম। তাকিয়ে দেখি সামনের রাস্তার মোড়টায় সাক্ষাৎ যম ওর জন্তে দাঁড়িয়ে আছে। বারণ করেছিলাম, শুনলে না। আমার কী।'

বনফুল থামলেন, আমি তখন বেঁহুশ হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। সুবলবাবু বললেন—'সেই পাগলটা কি তার পরেও ওখানে বসে থাকত ?'

বনফুল বললে—'সেটা আরেক রহস্য। তারপরদিন থেকে পাগলটাকে আর কোনদিন ও তল্লাটে দেখি নি।'

বনফুল আমার দিকে তাকিয়েই বললেন—'কি হে, কিছু বলছ না যে। এটাকেও কি তুমি কাকতালীয় বলবে ? তাহলে আরেকটা ঘটনা বলি শোন'—

এবার আমি প্রায় জোর করে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। বললাম—'বলাইদা, ঢের হয়েছে। আর নয়। পাঁচটা বাজে, অফিসে প্রচুর কাজ ফেলে এসেছি। এবারে চলি।'

বলতে বলতে ঘরের বাইরে এসে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছি, তখনও বনফুল চিৎকার করে বলছেন—'দু-চারদিনের ছুটি নিয়ে একবার ভাগলপুরে এস। অনেক ঘটনা তোমায় বলব'—আমি ততক্ষণে রাস্তায় নেমে ভাগলবা।

আপনারাই বলুন। এর পরেও কি ভাগলপুরে যাওয়াটা আমার পক্ষে উচিত হবে ?

১৪ ॥

সম্পাদককেও যে লেখকরা কখনও কখনও পাঠকের দরবারে আসামীর মত হাজির করিয়ে ছাড়েন তারই এক করুণ ও তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার একবার ঘটেছিল, যার উল্লেখ মাত্র করেছিলাম কয়েক মাস আগের এই বৈঠকে, যেদিন আড্ডার অন্যতম গপ্পবাজ সভ্য বিশুদা এসে বলেছিলেন প্রভাত দেব সরকারের পূজা সংখ্যার গল্প 'বিনিয়োগ' পড়ে জনৈক পাঠক লেখককে হাতের কাছে না পেয়ে তার দাদাকেই বেধড়ক পিটিয়েছে।

সেই সঙ্গে বিশুদা আমাকে দুশ্চিন্তায়ও ফেলে দিয়েছিলেন এই বলে যে, যে-হেতু গল্পটি আমিই প্রকাশ করেছি সেই হেতু উক্ত মারকুটে পাঠক নাকি আমাকেও রেহাই দেবে না।

লেখকদেরও বলিহারি! আজকাল কোনও কোনও গল্প-লেখকদের মধ্যে কিছুকাল যাবৎ একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে যে, বাস্তব জীবন ও চরিত্র নিয়ে গল্প লিখতে হবে, কোনরকম কল্পনার ভেজাল তাতে থাকবে না। যা ঘটেছে এবং যা দেখেছি হুবহু তাই নিয়েই হবে গল্প। আজকালকার পাঠকরা নাকি বাস্তব ঘটনাশ্রয়ী গল্প চায়, কল্পিত ঘটনায় তাদের অরুচি। আমার কিন্তু এতে আপত্তি ছিল না। আপত্তি হত না, যদি না এই বাস্তবধর্মী গল্প-প্রকাশের পরিণাম এমন মর্মান্তিক পরিহাসরূপে আমার জীবনে দেখা দিত।

বাস্তব ঘটনা নিয়ে লিখতে চান লিখুন, গল্প হলেই হল। এই গল্প হওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ এবং বাস্তব জীবনের কোনও একটি ঘটনাকে শিল্পকর্মে রূপ দেওয়াই হচ্ছে লেখকের কৃতিত্বের চরম সার্থকতা। প্রতিদিনই আমরা আমাদের চারিপাশে পরিচিত জনের জীবনে গল্পের মাল মসলা দেখতে পাই। রিয়ালিস্টিক সাহিত্যের মোহে পড়ে লেখক যদি মাল মসলাকে হুবহু লেখায় তুলে ধরেন তা কখনই গল্প হবে না, সেটা হবে রিপোর্টাজ। ফটো-গ্রাফ আর শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির যে প্রভেদ, রিপোর্টাজ আর গল্পেও সেই প্রভেদ। শিল্পী যখনই শহরের রাস্তার একটি ভিখারী বালিকার ছবি তুলির রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন তখনই সেই বালিকার অন্তর্নিহিত বেদনার একটি বিশেষ অভিব্যক্তিকে তিনি দর্শকের কাছে তুলে ধরার প্রয়াসী। সেই সঙ্গে শিল্পী তাঁর নিজের মনকেও সেই ছবির মধ্যে ঢেলে দেবার চেষ্টা করেন, তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া সেই ছবির প্রতি টানে ধরা পড়ে যায়। তাকেই বলে শিল্পকর্ম। গল্প রচনার ক্ষেত্রেও এই শিল্পকর্মই হচ্ছে প্রধান কথা।

আমার যে-অভিজ্ঞতার কথা আজ আপনাদের কাছে বলতে যাচ্ছি তা আমার জীবনে কখনই ঘটত না, যদি না, প্রভাত পূজা সংখ্যায় 'বিনিয়োগে'র মত রিয়ালিস্টিক গল্প না লিখত। সে-অভিজ্ঞতা বলার আগে 'বিনিয়োগ' গল্পের সারার্থ আপনাদের কাছে না বলে রাখলে আমার এই অভিজ্ঞতার কাহিনীর মধ্যে যে বেদনা নিহিত আছে তা আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন না। আমি চাই, আমার সেদিনের অভিজ্ঞতা আমার এই লেখার পাঠকদের সঙ্গে আরেকবার এক পংক্তিতে বসে সমান ভাগে ভাগ করে নিতে এবং সেই-

জন্যেই কিছুকাল আগে এ-প্রসঙ্গের একটু উল্লেখ করে আজ সবিস্তারে বলতে বসেছি।

প্রভাত দেব সরকারের বিনিয়োগ গল্পের দুটি প্রধান চরিত্রই হচ্ছে দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুধাংশু আর দিব্যেন্দু। দুজনেই মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। ছাত্রজীবনে সুধাংশু প্রায় প্রতিদিনই দিব্যেন্দুর বাড়ি যেত, আড্ডা চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিধবা মায়ের একমাত্র অবলম্বন ওই ছেলে দিব্যেন্দু ও মেয়ে সুনীতি। তাদের মানুষ করে তোলার জন্য আর্থিক সংকটের মধ্যেও মায়ের সংগ্রাম দিনের পর দিন সুধাংশু দেখেছে। দিব্যেন্দুর বোন সুনীতি বয়সে কচি খুকী হলে কী হবে, চেহারায় যেমন মাধুরী ছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী মাধুর্য সে ঢেলে দিত তার গানের গলায়। এই গান শোনবার লোভেই সুধাংশু ছাত্রজীবনে দিব্যেন্দুর বাড়ি কারণে-অকারণে গিয়ে আড্ডা জমিয়েছে।

কলেজের পাট চুকিয়ে দিয়ে চাকরির ধান্দায় কে-কোথায় ছড়িয়ে পড়ল, দুই বন্ধুর মধ্যে দীর্ঘকাল আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

বহু বছর বাদে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল সুধাংশুর সঙ্গে দিব্যেন্দুর। খবরের কাগজে সরকারী আফিসের একটা কেরানীর কাজের বিজ্ঞপ্তি দেখে সুধাংশু দরখাস্ত করেছিল। সেই দরখাস্তের কী হল না হল তারই একটু খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে হঠাৎ সেই অফিসের সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল দিব্যেন্দুর সঙ্গে। দিব্যেন্দুর চেহারা, চালচলন, সাজপোশাক সব পাল্টে গেছে, চেনবার উপায় নেই। একেবারে পাকা সাহেব। সুধাংশুকে প্রথমেই জানিয়ে দিলে ওরকম বাঙালী মার্কা ধুতি পাঞ্জাবি চেহারায় এ-অফিসে কেরানীর চাকরিও জোটে না। ইণ্টারভিউতেই আন্-স্মার্ট বলে নাকচ হয়ে যাবে। আরও জানিয়ে দিলে, যদিও সে সামান্য টাইপিস্টের চাকরি নিয়ে ঢুকেছিল, আজ সে বড় সাহেবের পি. এ.। আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দিলে অদূরে দরজায় লেখা আছে ডি. মুখার্জি, পি. এ.।

সুধাংশুর খোঁজ নিয়ে দিব্যেন্দু জানলে সে-এখন পাঁচ ছেলের বাবা, সামান্য মাইনের সরকারী চাকরি করে অন্যত্র। কিন্তু এ-চাকরিটা পেলে পরিশ্রম কিছুটা লাঘব হয়, তাছাড়া কাজটাও মনের মতন। সুধাংশুর যাতে চাকরিটা হয়ে যায় সে আশ্বাস দিয়ে দিব্যেন্দু বললে একদিন ওর বাড়িতে আসতে। আগের বাড়িতে নেই, নতুন বাড়িতে উঠে গেছে। বোন

সুনীতির বিয়ে দেবার জন্য খুবই চেষ্টা করছে, হাজার দশ-বারো টাকা খরচ করতেও প্রস্তুত। কিন্তু বাংলা দেশে উপযুক্ত পাত্র মেলা দুরূহ বলেই বিয়ে দিতে পারছে না। বোনের বিয়ে না দিতে পারলেও নিজে কিন্তু এক বড়লোকের মেয়েকে সম্প্রতি বিয়ে করেছে, সে-কথা সুধাংশুকে জানাতে ভোলে নি দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দুর লম্বা-চওড়া কথাবার্তা সুধাংশুর যেন ভাল লাগল না। মানুষটা যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। তবু চাকরির আশ্বাস পেয়ে খুশি মনেই সুধাংশু চলে এল, আসবার সময় কথা দিয়ে এল একদিন ওর বাড়ি যাবে।

কিছুদিন পর এক ছুটির দিন বিকালে সত্যি সত্যিই সুধাংশু রাস্তা আর বাড়ির নম্বর খুঁজে দিব্যেন্দুর বাড়িতে এসে হাজির। ওর অনুরোধে সুনীতির জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান যোগাড় করেছে সেটা তাকে জানিয়ে আসা দরকার আর সেই সঙ্গে চাকরিটারও একটু খোঁজ খবর।

কড়া নাড়তেই কিছুক্ষণ পরে একটি নারীমূর্তি দরজা খুলে দেখা দিল। সুধাংশু চিনতে পারল সুনীতিকে। বয়সের স্বাভাবিক সৌন্দর্য কেমন যেন ম্লান হয়ে গেছে—অনেক দিনের ফোটাফুল বৃন্তচ্যুত না হওয়ার মত। দিব্যেন্দুর কথা জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারল, শ্বশুরবাড়ি থেকে গাড়ি এসেছিল, দিব্যেন্দু বউকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেছে। মা গেছে কালীঘাটে, বাড়িতে একাই আছে সুনীতি।

সুধাংশু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি তা হলে একলা আছ?'

'একলাই তো থাকি।'

'আজকাল গানটান গাও না?'

'শুনবে কে?'

'কেন, নিজে।'

'সব জিনিস কি নিজের জন্য হয়?'

পর্দাতে আঁকা-ছবির মত স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুনীতি। সুধাংশুর কথা ফুরিয়ে গেছে। অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করবার ছিল, সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে। সুধাংশু যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

সুনীতিরও বোধ হয় কিছু বলবার নেই। সুধাংশু চলে যাবার সময় আলো নিবিয়ে সদর দরজা বন্ধ করতে করতে সুনীতি যেন নিজেকে

শুনিয়ে অস্ফুটে বললে, কেন মিথ্যে আপনারা চেষ্টা করছেন—আমি ভালই আছি।

সুধাংশু চমকে ফিরে তাকাল। অন্ধকারে আধভেজানো দরজার ফাঁকে দুটি সজল চোখ দেখা গেল মুহূর্তের জন্য। তার সুদীর্ঘ কুমারী জীবনের কোনও দুঃখের কথাই বোধ হয় সে বলতে চাইল। সুধাংশু সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চলে এল।

ছমাস পরে সুধাংশুর ইণ্টারভিউর ডাক এল। খুশি হলেও আর যেন চাকরিটার ওপর তেমন লোভ নেই সুধাংশুর। দিব্যেন্দুর অফিস, দু-বেলা হামবাগটার লম্বা লম্বা কথা শুনতে হবে।

তবু হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা ঠিক নয় ভেবে ইণ্টারভিউতে যাওয়াই স্থির করলে। বিদ্যে বুদ্ধি যখন তারও আছে তখন দিব্যেন্দুর মত উন্নতি সেও বা করতে পারবে না কেন?

নতুন অফিসের হাল-চাল জানবার জন্যে সুধাংশু সোজা দিব্যেন্দুর ঘরে উপস্থিত হল। কিন্তু দরজা খুলেই সুধাংশু পিছিয়ে এল, দিব্যেন্দুর জায়গায় অন্যলোক।

অপ্রস্তুতি কাটিয়ে উঠে মিঃ মুখার্জির কথা জিজ্ঞাসা করতেই ভদ্রলোক বেল বাজিয়ে চাপরাসীকে ডেকে বললেন—ডি পি-র ঘরে নিয়ে যাও।

বেরিয়ে চাপরাসীকে সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে, ডি পি কোন হ্যায়?

চাপরাসী বললে—বড় সাহাব আছেন, ডিরেক্টর সাহাব।

এতক্ষণে দিব্যেন্দুর নতুন পদের তাৎপর্য বুঝতে পারে সে। ডিরেকটার অব্ পারশোনেল্। দিব্যেন্দু করেছে কি? পাঁচ শো থেকে একেবারে বারো শো?

এবারে আমি 'বিনিয়োগ' গল্পের শেষ ক-টি লাইন লেখকের ভাষায় হুবহু তুলে দিচ্ছি যাতে মারপিটের উত্তেজক কারণটি কোথায় নিহিত তা আপনাদের ধরতে সুবিধা হয়।

সুধাংশু ভাবলে এখানে চাকরি করার চেয়ে সরে পড়াই যেন ভাল। ওই দিব্যেন্দু এ-অফিসের কর্তা, নিয়োগ-বদলির দণ্ডমুণ্ড।

বড় সাহেবের দরজার সামনে এসে সুধাংশু দাঁড়াল, বিদ্যুৎস্পৃটের মত একটা সন্দেহ তার মাথায় খেলে গেল—দিব্যেন্দুর এই পদোন্নতিতে নারী-রূপ-রস-সুরের কোন পরোক্ষ হাত নেই তো? মিস্টার শিবলিঙ্গম্ কি দিব্যেন্দুকে

এমনি সুনজরে দেখেছিল? কিসের বিনিময়ে এ-সমৃদ্ধি দিব্যেন্দুর? সে-দিন সুনীতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এর যেন আভাষ সুধাংশু পেয়েছিল! 'আপনারা মিথ্যে চেষ্টা করছেন, আমি ভালই আছি'—মানে কি?

ডিরেক্টর সাহেবের কামরার একটা পাল্লা ফাঁক করে চাপরাসীটা তখনও অপেক্ষা করে।

ঠিক এই মুহূর্তে বন্ধুকে সম্বর্ধনা করা উচিত হবে কি না ভেবে ঠিক না করতে পেরেই বোধ হয় সুধাংশু পা-পা পিছিয়ে যায়। ভয়ে।

গল্পের এইখানেই শেষ।

গল্পটা পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হবার আগে প্রভাত নিজেই প্রথম প্রুফ দেখে দিয়েছিল। মেক-আপ প্রুফ আমরাই দেখে দিয়েছি, পরের দিন সকালে প্রেস-এ ফর্মা ছাপতে যাবে। হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা টেলিফোনে প্রভাত বললে যে, সে প্রুফটা আরেকবার দেখতে চায়, দু-একটা শব্দ অদল-বদল করতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার একটু তাড়াতাড়ি বেরোবার তাড়া ছিল, তাই মেকআপ্ ম্যানকে বলে গেলাম প্রভাত এলে প্রুফটা ওকে আরেকবার দেখাতে।

পরদিন সকালে অফিসে গিয়ে দেখি ফর্মা যেমন-কে-তেমন পড়ে আছে, ছাপাখানায় যায় নি। মেক্-আপ ম্যান প্রভাতের দেখা প্রুফগুলি আমার টেবিলে হাজির করে বললে—'কী করে ফর্মা যাবে বলুন? সব গল্পটা তো আবার কম্পোজ করতে হবে।'

মানে? পেজ-প্রুফের উপর তাকিয়ে দেখি লেখক সুধাংশুর বন্ধুর নামটা বদলে আগাগোড়া 'দিব্যেন্দু' করে রেখেছে। গল্পের প্রতি লাইনেই সুধাংশুর বন্ধুর উল্লেখ, এবং তা বদলাতে গেলে সবটা পুনর্বার কম্পোজ করা ছাড়া উপায় নেই। লাইনো যন্ত্রের অনেক সুবিধার মধ্যে ওই-একটি মস্ত অসুবিধা হচ্ছে যে, লাইনের একটি কমা বা দাঁড়ি বদলাতে হলে পুরো লাইনটাই আবার কম্পোজ করতে হয়।

একবার ভাবলাম ফর্মা না আটকে রেখে যেমন আছে তেমনি ছেড়ে দিই।

কিন্তু আগাগোড়া রি-কম্পোজ হবে জেনেও প্রভাত যখন নামটা পালটেছে তখন নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণ আছে মনে করেই সংশোধন করতেই বলে দিলাম।

তখন কি আর জানতাম যে রিয়ালিষ্টিক গল্প লিখতে গিয়ে প্রভাত দিব্যেন্দুর চাকুরি ক্ষেত্র, তার বাড়ির পরিবেশ এমনকি তার পৈত্রিক নামটাও সে হুবহু রেখে দিয়েছে! শেষ মুহূর্তে শুভবুদ্ধির উদয় হতে শুধু নামটুকু পালটে দিয়ে আইনকে হয়তো ফাঁকি দিয়েছে কিন্তু যাকে নিয়ে গল্প তার কাছে তো ধরা পড়তেই হবে এবং আইন যে সে আবার নিজের হাতেই নিয়ে বসবে—গল্প লেখার নেশায় বোধ হয় সেদিন প্রভাতের সে হুঁশ ছিল না।

দিব্যেন্দুর আসল নামটা ওই একই কারণে আপনাদের কাছে আমি প্রকাশ করতে অপারগ, সুতরাং প্রভাতের দেওয়া নামেই আমি এ-কাহিনী বলছি।

পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হল মহালয়ার আগের দিন বিকেলে, মহালয়ার পরের দিন বিকেলে দুর্মুখ বিশুদা দুঃসংবাদ নিয়ে এসে আমার মধ্যেও ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। পরদিন সকালেই সাতদিনের ছুটি নিয়ে চলে গেলাম শান্তিনিকেতন, কাজ কি এসময় কলকাতায় থেকে।

সাত দিন পর কলকাতায় ফিরেই প্রথম খোঁজ করলাম প্রভাতের। কেন ও এ-গল্প লিখে ওর বন্ধুকে এমন বে-ইজ্জত করল, আর কেনই বা মাঝখান থেকে প্রভাতের নিরীহ দাদা মার খেল। তাছাড়া দিব্যেন্দু এখনও ক্ষেপে আছে কি-না সেটাও জানা দরকার। যণ্ডামার্কা চেহারা হলে কি হবে। শুনলাম প্রভাত একমাসের ছুটি নিয়ে তার পৈত্রিক ভিটে বজবজের কাছে মালা গ্রামে চলে গিয়েছে।

প্রভাতের মত দশাসই চেহারার মানুষটার মনেও কি মার খাবার ভয় ঢুকেছে? তা হলে আমি তো কোন ছার। রীতিমত চটে গেলাম প্রভাতের উপর। একবার সামনে পেলে হয়। অগত্যা ক্রোধটা মনে মনেই পুষে রেখে প্রভাতের পুনরভ্যুদয়ের দিন গুনছি।

দিব্যেন্দুকে আমি চিনি না। প্রভাতের অন্যান্য বাল্যবন্ধুদের মধ্যে যাঁদের সাহিত্যের নেশা আছে তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। দিব্যেন্দুর সঙ্গে আমার কোন পরিচয়ই নেই। গল্প পড়ে ওর চেহারার একটা আন্দাজ করে রেখেছিলাম, স্যুটেড-বুটেড টিপটপ সাহেব, হাতে সিগারেটের টিন। সুতরাং অফিসে যাওয়া-আসার পথে সাহেবী পোশাক-পরা যুবকদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি রেখেই চলা-ফেরা করতাম। বলা তো যায় না, জনারণ্যের মধ্যে থেকে হয়তো সাহেবী পোশাকধারী দিব্যেন্দু আমার ঘাড়ে অতর্কিতে লাফিয়ে পড়তে পারে।

একদিন দুপুরে অফিসে বসে আছি, টেলিফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো, কে কথা বলছেন?'

'আমি বিনয় ঘোষ।'

'কি খবর বিনয় বাবু, ভাল আছেন তো? কী ব্যাপার?'

গম্ভীর গলায় বিনয় বাবু বললেন—'ব্যাপার খুবই গুরুতর।'

বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রাবন্ধিক বিনয়বাবু আমাদের বহুকালের বন্ধু। এক সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়র উনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। ১৯৪০-৪১ সালের কথা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অফিসের পর আমরা দল বেঁধে আড্ডা দিয়েছি। সুবোধ ঘোষ, মন্মথনাথ সান্যাল, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য আর প্রভাত দেবসরকার ছিলেন আমাদের সেদিনের আড্ডার নিত্য সঙ্গী। একেকদিন একেকজনের আস্তানায় আমাদের আড্ডা বসত, গল্প বা প্রবন্ধ পাঠ হত, আর তাই নিয়ে চলতো চুল-চেরা আলোচনা, গভীর রাত পর্যন্ত। আমাদের মধ্যে বিনয় ঘোষ ছিলেন প্রভাতের পুরনো বন্ধু। এক পাড়ায় ওরা থাকত, এক কলেজেই পড়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে জনযুদ্ধের জোয়ারে আমাদের আড্ডার একদল ভেসে গেল অন্যদিকে। সাহিত্য ছেড়ে তখন আড্ডায় রাজনীতি নিয়ে শুরু হয়ে গেল তুমুল তর্ক-বিতর্ক, তার ফলে দেখা দিল মতান্তর। মতের পার্থক্য ক্রমশ এত ব্যাপক হয়ে পড়ল যে আড্ডাই গেল ভেঙ্গে, কে-কোথায় ছিটকে পড়ল।

মতান্তর ঘটলেও মনান্তর কখনও আমাদের মধ্যে ঘটে নি। রাস্তায় ঘাটে, সাহিত্যের সভাসমিতিতে দেখা হলে আমাদের পুরনো বন্ধুত্বের জের টেনেই ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করেছি। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক সত্তার মধ্যে সেদিন এমন একটা ব্যবধান তখন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যে, পুরনো আড্ডা আর দানা বাঁধতে পারে নি। রাজনীতির এমনই প্রভাব।

সেই বিনয় ঘোষ টেলিফোন করে বললেন—ব্যাপার গুরুতর।

প্রথমটা বুঝতেই পারি নি কী হল। জনযুদ্ধের রাজনীতি ততদিনে থিতিয়ে এসেছে, সে উন্মাদনাও আর নেই। তা হলে?

বিনয় ঘোষ বললেন—'আপনাদের পূজা সংখ্যায় প্রভাতের গল্প নিয়ে যে-কাণ্ড হয়েছে আপনি তা শুনেছেন?'

আমি বললাম—'সবই শুনেছি, আমি তো প্রভাতের অপেক্ষায় বসে আছি। সে তো মালা গ্রামে গা ঢাকা দিয়েছে।'

দুঃখভরা কণ্ঠে বিনয়বাবু বললেন—'তার ফলে কি কাণ্ড হয়েছে জানেন? উত্তেজনার বশে দিব্যেন্দু ওর অফিসের কর্মচারী প্রভাতের দাদাকে মেরেছে। এই নিয়ে সারা অফিসে হুলস্থুল।

দিব্যেন্দুর উপর ডিসিপ্লিনারী অ্যাকশন নিতে পারে। শুধু তাই নয়, আজ কিছুদিন ধরে ও অফিসে যাচ্ছে না, বাড়িতেও থাকে না, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, পাগলের মত অবস্থা। ওর বৃদ্ধা মা দিন-রাত কাঁদছেন, পরিবারে এই নিয়ে ভয়ানক অশান্তি। দিব্যেন্দু আমারও বন্ধু, আমি ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, যা হবার হয়ে গেছে। এর তো আর চারা নেই। কিন্তু কিছুতেই ওকে শান্ত করতে পারছি না। আশঙ্কা হচ্ছে সত্যি সত্যিই না পাগল হয়ে যায়।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে বিনয়বাবু থামলেন। আমি স্তম্ভিত। এর কি উত্তর দেব? কি প্রতিকার আমি করতে পারি। প্রভাতের রিয়ালিস্টিক গল্প লেখার যে এই পরিণাম হবে আমিই বা তা জানব কি করে?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিনয়বাবু আবার বললেন—'আমি বুঝতে পারছি আপনি খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু আপনার একটু সাহায্য আজ একান্তই প্রয়োজন।'

দিব্যেন্দুকে আমি চিনি না, জানি না। তবু বিনয়বাবুর মুখে ওর এই অবস্থার কথা শুনে ওর প্রতি সহানুভূতি হল, সমবেদনায় মন ভরে উঠল। আমি বললাম—'বলুন বিনয়বাবু, এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি।'

বিনয়বাবু বললেন—'আপনাকে শুধু ওদের বাড়িতে একবার যেতে হবে।'

'ওদের বাড়িতে? আমি যাব? বলেন কি! না বিনয়বাবু, তা হয় না। এ-রকম পরিস্থিতির সামনে গিয়ে দাঁড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আর যা কিছু বলুন, এ-অনুরোধ আমাকে করবেন না।'

দুঃখের সঙ্গেই বিনয়বাবু টেলিফোন ছেড়ে দিলেন। ছাড়বার আগে শুধু বললেন—'আপনি যখন নিতান্তই যেতে চান না তখন আর আপনাকে বিব্রত করব না। ওদের এই দুঃখের দিনে আপনি গেলে ওরা একটু সান্ত্বনা পেত। দেখি, আমি কি করতে পারি।'

বিনয়বাবুর টেলিফোন পাবার পর মন এত দমে গেল যে অফিসের কাজে আর উৎসাহ নেই, দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুম হল না।

পরদিন বিকেলে বিশুদা হন্তদন্ত হয়ে আমার অফিসে এসেই বললেন—'থানায় ডায়েরী করিয়েছেন?'

ডায়েরী! আমি থানায় ডায়েরী করতে যাব কোন দুঃখে। সে তো করবে প্রভাত। একেই তো বিনয় ঘোষের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হওয়ার পর থেকে মন-মেজাজ খিঁচড়ে আছে তার উপর বিশুদার গুলতাপ্পি। একটু রেগেই বললাম—

'দেখুন বিশুদা, এ-সব ইয়ার্কি আর ভাল লাগছে না।'

অভিমানের সুরেই বিশুদা বললেন—'ইয়াকি হল? যাক্ আমার আর কি। খবরটা শুনে আপনার জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম বলেই অফিসের পর লোকের ভিড় ঠেলে ছুটতে ছুটতে আসা।'

বিশুদার মুখে আবার কি খবর? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন—'আমার পাড়ার সেই ছেলেটা, যে প্রভাতের দাদার অফিসে কাজ করে, সে আজ সকালে এসে বলে গেল যে পকেটে মস্ত এক ছোরা নিয়ে সে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই বলছিলাম থানায় ডায়েরী করে রাখুন।'

বিশুদাকে আর এক ধাপ রাগাবার জন্যে হেসে বললাম—'যুদ্ধের সময়ের 'গুজবে কান দিবেন না' পোস্টারগুলো এখনো কলকাতার দেয়াল থেকে উঠে যায় নি। আপনার এ-কথায় তাই আর কান দিলাম না'।

বিশুদা ততোধিক গম্ভীর হয়ে বললেন—'কান দেওয়া-না-দেওয়া আপনার ইচ্ছা। কথাটা যে আপৎকালে গ্রাহ্য হবে না আমি তা জানতুম। আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম।'

মহৎ কর্তব্য সমাধা করে, অর্থাৎ আমার মনে আরও খানিকটা ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে বিশুদা কেটে পড়লেন। তবু ভরসা করে বলতে পারলাম না যে একই পাড়ায় যখন থাকি একসঙ্গে বাড়ি ফেরা যাক, যদি আমার মানসিক অবস্থা ওঁর কাছে ধরা পড়ে যায়।

পরদিন সকালে আমার বাড়ির তিনতলা ফ্ল্যাটের দক্ষিণ-ঘরের খাটের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছি। অগ্রহায়ণের শেষ, আসন্ন শীতের মিঠে রোদ্দুর জানালা দিয়ে পিঠে এসে পড়েছে। গৃহিণীকে এককাপ গরম চায়ের ফরমাশ দিয়ে পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে

মনোনিবেশ করেছি, এমন সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম। গৃহিণী এসে বললেন—'একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান, এঁকে আগে কখনও দেখি নি।'

'সাহেবী পোশাক-পরা কেউ নয় তো?'

'না, একেবারে খাঁটি বাঙ্গালী।'

'তা হলে পাঠিয়ে দাও।'

এই বলে আমি কৃষ্ণের কপট নিদ্রার মত অর্ধশায়িত অবস্থাতেই খবরের কাগজের কপট পাঠক সেজে দৈনিক পত্রিকাটা মুখের উপর মেলে ধরলাম। ভাবখানা যেন ঝানু সাংবাদিক আমি, সংবাদের নির্যাস নিতে বড়ই ব্যস্ত। আগন্তুক ঘরে ঢুকতেই আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়েই কাগজ ফেলে রেখে উঠে টান হয়ে বসলাম। ভদ্রলোককে আগে কখনও দেখি নি, কিন্তু মুখের সরল বিনম্র হাসিটির মধ্যে যে-আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিল আমাকে তা আকর্ষণ করল। পরনে মাল-কোঁচা-মারা ধুতি, গায়ে ঘি-রঙের পপ্‌লিন শার্ট, হাতের আস্তিন গোটানো। বয়েস অনুমান করলাম প্রাক্‌-তিরিশ হবে।

যুবকটি দাঁড়িয়েই ছিলেন। বসবার জন্য অনুরোধ করতে কুণ্ঠিতচিত্তে চেয়ারে বসে বললেন—'সকাল বেলায় আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, অপরাধ নেবেন না। না-এসেও আমার উপায় ছিল না, তাই বিনয় ঘোষের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আমিই চলে এলাম আপনার বাড়ি। আপনার অফিসে তো আর এ-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায় না।'

আমি শঙ্কিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনিই কি দিব্যেন্দু?'

'আজ্ঞে না, আমি তার ভগ্নিপতি। বছর দুই হল ওর বোনকে আমি বিয়ে করেছি। আমরা থাকি বাংলাদেশের বাইরে। আমার স্ত্রী শাশুড়ীর একমাত্র মেয়ে, তাই অনেক করে লিখেছিলেন পুজোর ছুটিতে কলকাতায় আসতে। এক মাসের ছুটি নিয়ে এসেই তো এই অশান্তির মধ্যে পড়ে গেছি। সবই তো শুনেছেন বিনয়বাবুর কাছে।'

'আমি সবই শুনেছি, শুনে খুব দুঃখও পেয়েছি। বিনয়বাবু আমাকে আপনাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনিই বলুন, এরকম একটা অবস্থা যেখানে, সেখানে কোন মুখ নিয়ে আমি তাঁদের কাছে উপস্থিত হব, কী-ই বা সান্ত্বনা তাঁদের দিতে পারি।'

ভদ্রলোক দু হাত জোড় করে অনুরোধ জানিয়ে বললেন—'তবু আপনাকে

একবার যেতে হবে সাগরবাবু, এ আমার একান্ত অনুরোধ আপনার কাছে। কেন বলছি জানেন ? আমি আমার শাশুড়ীকে শ্যালককে অনেক বুঝিয়েছি। একটা গল্পের মধ্যে কে-কি লিখেছে তা গায়ে মাখবার দরকার কি। তার শুধু এক কথা—আমার বোনকে নিয়ে, আমাকে নিয়ে প্রভাত যে জঘন্য ইঙ্গিত করেছে তার জ্বালা আমি সইতে পারছি না। আমি ওকে বলি, এসব গায়ে না মাখলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ওর না হয় বোন, আরে সে তো আমারও স্ত্রী। আমি তো ওর মতন উন্মাদ হয়ে যাই নি।'

ভদ্রলোকের কথায় আমি বিস্ময় বোধ করলাম। এ-ক্ষেত্রে এমন মানসিক স্থৈর্য আশাই করা যায় না। তবু কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করলাম—

'আচ্ছা, আপনার স্ত্রী এ-বিষয়ে কী বলেন ?'

'আমার স্ত্রী আমার চেয়েও বেশী নির্লজ্জ। গল্পটা পড়ে তো হেসেই বাঁচে না। সব সময় আমাকে ঠাট্টা করে বলে—কী গো, রামচন্দ্রের মত তুমিও বলবে না কি—সমাজরঞ্জন তরে সুনীতিরে বিসর্জন দিব।'

একথা বলেই ভদ্রলোক উচ্চৈঃস্বরে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন, আমিও যোগ দিলাম। হাসতে হাসতেই বললেন—'আমার স্ত্রী কিন্তু এই ব্যাপারটা খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছেন। খুব হাসি-খুশি মানুষ কি না।'

কথাটা বলেই ভদ্রলোক লজ্জায় পড়ে গেলেন। আমার সামনে স্ত্রীর প্রশংসায় প্রগলভ হয়ে পড়েছেন—এইটেই ওঁর সঙ্কোচ। আমি কিন্তু মনে মনে খুব খুশী হলাম এই ভেবে যে, প্রভাত 'বিনিয়োগ' গল্প লিখে এই দুটি মানুষের সুখী দাম্পত্যজীবনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি।

ভদ্রলোক এবার নিজের সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে সানুনয় কণ্ঠে বললেন—'অনেক বাজে কথা বলে আপনার সময় নষ্ট করলাম, অথচ যে-জন্যে আসা সেটাই বলা হল না। আপনাকে কিন্তু আমাদের ওখানে একবার যেতেই হবে। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার কোনরকম অসম্মান বা অপ্রস্তুতে পড়বার কোন কারণ ঘটবে না। আর কিছুর জন্যে নয়, আমার শাশুড়ীর কথা ভেবেই আপনাকে এই অনুরোধ করছি। ছেলের এই অবস্থা দেখে দিনরাত কান্নাকাটি করছেন. তাঁর কষ্টই আমাদের বড় বেশী বিচলিত করেছে। আপনি শুধু একবার গিয়ে দুটো সান্ত্বনার কথা বললেই উনি মনে অনেকখানি জোর পাবেন। আপনি কথা দিন আপনি আসবেন।'

ভদ্রলোকের অমায়িক কথাবার্তা ও ব্যবহারে আন্তরিকতার কোন কার্পণ্যই

ছিল না, আন্তরিকতা আপনা থেকেই গড়ে উঠেছিল। তাই আর দ্বিরুক্তি না করে কথা দিলাম। যতই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হোক, মুখোমুখি হয়ে দেখাই যাক না কি হয়।

আমি বললাম—'বলুন কবে যেতে হবে।'

খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন—'আপনার যেদিন সুবিধা আসুন। বিনয়বাবু আমাদের বাড়ি চেনেন, তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনাকে নিয়ে আসবেন।'

স্থির হল রবিবার সন্ধ্যা ছ'টায় ওঁদের বাড়ি যাব।

সে-সময় রবিবার আমাকে অফিসে যেতে হত। ছুটির দিনে অফিসে লোক জনের সমাগম কম হয় বলে সন্ধ্যার পর আটকা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং রবিবার দুপুরে বিনয়বাবু যেন অফিসে টেলিফোন করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেন।

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। মনে হল ওঁর মন থেকে মস্তবড় একটা বোঝা নেমে গেল। আমিও অনুভব করলাম যে আমারও মন যেন হালকা হয়ে গেছে। দুঃখের দিনে মানুষকে খুশী করতে পারার মধ্যে তৃপ্তি আছে, আমার দিক দিয়েও তো আমি কম লাভবান হই নি।

রবিবার দিন দুপুরে অফিসে একা বসে কাজ করছি, টেলিফোন বেজে উঠল। বিনয়বাবুর কণ্ঠস্বর।

—'আজ সন্ধ্যায় আসছেন তো?'

—'নিশ্চয় যাব। কিন্তু আপনার সঙ্গে কখন কোথায় দেখা হবে?'

বিনয় ঘোষ বললেন—'আমি তো হাজরা রোডের কাছেই থাকি আর আপনাকে এদিকেই আসতে হবে। কেন না ওদের বাড়ি এ-পাড়াতেই। সুতরাং আমি উজান বেয়ে আপনার অফিসে না গিয়ে সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আপনি হাজরা রোড আর রসা রোডের উত্তর-পূর্ব কোণের পানের দোকানটার সামনে আমাকে পাবেন। ওখান থেকে দু-মিনিটের রাস্তা।'

বিকালে বড়বাজার থেকে চার নম্বর বাসে চড়ে ঠিক ছটার সময় হাজরার মোড়ে নেমেই দেখি গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে বিনয় ঘোষ আমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আমাকে দেখতে পেয়ে বিনয়বাবু আশ্বস্ত হয়ে বললেন—'যাক, আপনি এসেছেন, আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এই একটু আগেই ওদের বাড়ি থেকে আসছি। ওদের বলে এসেছি যে আপনি ছ-টার সময় আসছেন, শুনে সবাই খুশী শুধু দিব্যেন্দুই একটু লজ্জা পাচ্ছিল আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমি বিশেষ করে বলে এসেছি ও যেন থাকে, বেরিয়ে না যায়।'

আমি বললাম—'সে কি, আমি আরও উল্টোটাই শুনেছি। সে নাকি পকেটে ছোরা নিয়ে হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার অপরাধ, প্রভাতের গল্প আমি ছেপেছি।'

বিনয়বাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন—'ছি ছি ছি, তা কখনও সম্ভব? দিব্যেন্দু উত্তেজনার বশে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে, তার জন্যে অনুশোচনার শেষ নেই। কোন লজ্জায় তাদের কাছে মুখ দেখাবে বলে অফিস যাওয়া বন্ধ করেছে, আর ঠিক একই কারণে সে আপনার সামনেও উপস্থিত হতে লজ্জা পাচ্ছে। তবু আমি অনেক করে বুঝিয়ে বলে এসেছি যে আপনি আমাদেরই একজন, আপনার কাছে লজ্জা পাবার কিছু নেই।'

হাজরা রোড ধরে পশ্চিম দিকে কথা বলতে বলতে আমরা এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ বাঁদিকের একটা রাস্তায় মোড় নিয়েই বিনয়বাবু বললেন—'আমরা এসে গিয়েছি, এই যে এই বাড়ি।'

রাস্তার উপরেই সদর দরজা, ছোট্ট একতলা বাড়ি। বিনয়বাবু কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল, হাসিমুখে সেই ভদ্রলোক আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। পরনে মালকোঁচা দেওয়া ধুতি, গায়ে আস্তিনগোটানো শার্ট। মুখে সেই সরল আন্তরিক হাসি।

রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছোট একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরের মাঝখানে একটা সাদা পর্দা টাঙানো, পর্দার এ-পাশে অর্থাৎ রাস্তার দিকে ছোট্ট একটি টেবিল আর খান দু-তিন চেয়ার পেতে বসবার ঘর করা হয়েছে। আসবাবপত্রর বাহুল্য কিছুই নেই, সাধারণ গৃহস্থঘরের প্রয়োজনীয় যে-টুকু সে-টুকুই আছে। বসবার ঘরের এক পাশে একটা কেরোসিন-কাঠের শেলফ-এ পকেটবুক এডিশানের কিছু ইংরিজী বই, কিছু বাংলা বইও আছে আর আছে একতাড়া পত্রপত্রিকা ও খবরের কাগজ।

মেয়েলী-হাতের ফুললতাপাতার নকশা তোলা টেবিলক্লথ তোরঙ্গ-ঢাকনি। দেয়ালে অমাবস্যা-পূর্ণিমা-একাদশী নির্দেশিত বাংলা ক্যালেণ্ডার।

ঘরে ঢুকেই বিনয়বাবু একটা চেয়ারে বসলেন, ওঁর গা ঘেঁষেই পাশের চেয়ারে আমি বসে পড়লাম। বিনয়বাবু বললেন—'কই, দিব্যেন্দুকে দেখছি না কেন? পালিয়েছে বুঝি।'

ভদ্রলোক বিনয়বাবুকে বললেন—'আপনিও বেরিয়েছেন, মিনিট পনেরো বাদে সিগারেট কিনবার নাম করে ও বেরিয়েছে। ফেরে কিনা সন্দেহ।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'ওকে আমি কত বললাম যে আপনার কাছে লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই, তবু বেরিয়ে গেল।'

ভদ্রলোকের কথা শেষ হতে না হতেই সাদা কাপড়ের পার্টিশনটা সরিয়ে একটি তরুণী আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, নিটোল স্বাস্থ্য, ধীর স্থির দুটি কালো চোখের চাহনিতে যেন স্বপ্ন মাখানো। চওড়া লাল-পাড়ের সাদা শাড়ি সাধারণ ভাবে পরা। মাথার মাঝখান থেকে ঘোমটাটি এমনভাবে টেনে আনা যেন লাল-পাড়ের ফ্রেম-এর মাঝে পটে আঁকা একখানি ছবি। দা-ভিঞ্চির 'মোনালিসা'-র হাসি আপনারা সবাই দেখেছেন। সে-হাসির অর্থ নিয়ে দুই শতাব্দী ধরে অনেক গবেষণাই রসিক সমালোচকরা করেছেন, আজও করছেন, তবু সে-হাসির রহস্য অজানাই থেকে গিয়েছে। আমার সামনে মূর্তিমতী যে নারী এসে দাঁড়ালেন তাঁর মুখের স্মিতসুন্দর হাসির ব্যাখ্যা করা আমার কলমের সাধ্য নয়। শুধু মনে হয়েছিল 'মোনালিসা'র সেই অপার রহস্যময়ী হাসির জীবন্তরূপ নিয়ে তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

বিস্ময়ের ঘোর কাটল যখন, তখন ভদ্রলোক বললেন—'এই হচ্ছে দিব্যেন্দুর বোন, আমার ইয়ে—'

ভদ্রমহিলা খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বললেন—'আহা, পরিচয় করিয়ে দেবার কি ছিরি।' স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'যাও তো, হাজরা পার্কে গিয়ে একবার খুঁজে এস। দাদা নিশ্চয় পার্কে বসে আছে।'

ভদ্রলোক দিব্যেন্দুর খোঁজে বেরিয়ে যেতেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'জানেন, দাদাকে নিয়েই আমাদের যত মুশকিল। বাড়ি থাকতে ভাল লাগে না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। রাত্রে ঘুমোতে পারে না, এই হিমের মধ্যে পার্কে গিয়ে বসে থাকে রাত বারোটা পর্যন্ত। শেষকালে এই ভদ্রলোককেই গিয়ে পার্ক থেকে দাদাকে ধরে আনতে হয়। আমি তো দাদাকে সব সময় বলছি—তুমি এবার বিয়ে কর, এসব ঝক্কি তোমার বউ

এসেই সামলাক। মা বুড়ো মানুষ, কেবল চিন্তা ছেলে বুঝি পাগল হয়ে গেল। আমার কর্তাটির কথা আর বলবেন না। বিশ্বকুঁড়ে। আপনার কাছে যেতে কি চায়? আমিই তো জোর করে সেদিন সকালে আপনার বাড়ি পাঠিয়েছিলাম। কি বিনয়দা, ঠিক কথা কি না বলুন।'

ভদ্রমহিলার স্বতঃস্ফূর্ত ও সপ্রতিভ কথাবার্তায় আমার আড়ষ্টতা কেটে গেছে। বিনয়বাবু কিছু বলবার আগেই আমি বললাম—'এটা ঠিক যে, উনি সেদিন সকালে আমার বাড়ি না গেলে এখানে আসার আমি কোন উৎসাহই পেতাম না। ওঁর একটা মস্ত গুণ, অল্প আলাপেই অচেনাকে চির-চেনা করে ফেলতে পারেন।'

ভদ্রমহিলা কপট কোপ প্রকাশ করে চোখ ঘুরিয়ে বললেন—'ইস্, গুণ না ছাই। আড্ডা পেলে বিশ্বসংসার ভুলে যান, আমি তো কোন ছার। এই নিয়ে আমার সঙ্গে নিত্যি খটাখটি লেগেই আছে।'

আমি বললাম—'ভাগ্যিস খটাখটি লাগে, তা না হলে জীবনটা আলুনি তরকারির মত স্বাদহীন হয়ে যেত।'

এই সময় ভদ্রলোক পার্ক থেকে একাই ফিরে এলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'কি, ওঁর কাছে আমার নিন্দে করা হচ্ছিল বুঝি।'

আমি বললুম—'তা নয়। সে দিন আমার বাড়িতে আপনি যেমন ওঁর গুণের প্রশংসা করছিলেন, উনিও আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

বিস্ময়ের ভান করে ভদ্রলোক বললেন—'তাই নাকি, এ যে আপনি নতুন খবর শোনালেন। আমি কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা ওঁর গঞ্জনা শুনতে শুনতে ঝালাপালা হয়ে গেছি। একেক সময় মনে হয়-দুত্তোর বলে লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

বিনয়বাবু বললেন—'থাক হয়েছে। তোমাকে আর লোটা-কম্বল নিয়ে বেরোতে হবে না। উপস্থিত মা-কে একবার ডেকে দাও।'

ভদ্রমহিলা বললেন—'মা ওঁর জন্যে চায়ের জল চাপিয়েছেন, আমি গিয়ে এক্ষুনি ওঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ভদ্রমহিলা পর্দার আড়ালে চলে যেতেই আমি প্রমাদ গুনলাম। একটা কঠিন পরীক্ষার সামনে মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হবে! মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই পর্দার ওপার থেকে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। ম্লান বিষণ্ণ মুখ, বেদনার ছাপ সারা চেহারায় পরিস্ফুট।

দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করতেই বৃদ্ধা বললেন—'বোস বাবা, বোস। তুমি তো বিনয়ের বন্ধু, আমার ছেলেরই মতন। কিন্তু আমার ছেলের এ কী হল! খায় না, ঘুমোয় না, কারুর সঙ্গে কথাও বলে না। আজ সাতদিন হয়ে গেল অফিস যাওয়া বন্ধ করেছে। ও যখন এতটুকু তখন এই দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমি বিধবা হই। কি দুঃখের দিন গেছে আমার। অনেক কষ্টে ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়েছি, চাকরিও করছে। ভাবলুম, দুঃখের দিন পার হল। হঠাৎ এ কি হল বল তো? কি হবে? চাকরি যদি যায়, আবার আমাকে পথে দাঁড়াতে হবে। ওই ছেলে ছাড়া আমার তো আর কোন সম্বল নেই।'

বলতে বলতে বৃদ্ধা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি, কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। বিনয় বাবুর দিকে চেয়ে দেখি উনি ঘাড় হেঁট করে মাটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললেন—'এই দেখ না। ছেলেকে কত করে বললাম থাকতে। বেরিয়ে গেল। কত রাত্রে ফিরবে কে জানে। এ রকম করলে ও-যে পাগল হয়ে যাবে।' কান্নায় বৃদ্ধার কথা রুদ্ধ হয়ে এল।

আমার স্নায়ুর উপর এতটা চাপ পড়বে আমি কল্পনা করি নি। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছিলাম প্রভাতকে, যে আমাকে আজ এমন একটা অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে এনে ফেলেছে। পরিচিত বন্ধুকে নিয়ে যদি বাস্তব গল্পই লিখতে গেল তবে পরিণতিতে এ-ভাবে কল্পনার কালি ঢালতে গেল কেন! এ অবস্থায় আর চুপ করে থাকা যায় না, কিছু একটা বলতেই হয়। কিন্তু আমার দিক থেকে বলবার-কীই বা থাকতে পারে। তবু এই বৃদ্ধার ব্যাথাতুর অন্তরে যদি কিছু সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারি এই আশায় আমি বললাল—'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এ-নিয়ে আর দুঃখ করে লাভ কি। আমার দিক থেকে এটুকু অন্তত বলতে পারি যে, আমাদের পত্রিকায় যে-গল্প প্রকাশিত হয়েছে তার সত্যতা সম্বন্ধে আমি বিন্দু-বিসর্গ জানতাম না। আজ আমি আপনাদের মতই বেদনা বোধ করছি, কিন্তু এখন তো আর প্রতিকারের কোন পথ নেই। আপনাদের কর্তব্য এই গল্প নিয়ে যা-কিছু ঘটেছে তা মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলা। আপনারা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবার চেষ্টা করুন, দেখবেন আপনার ছেলেও

আগের মতনই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। আমার শুধু একটি অনুরোধ, আপনার ছেলেকে বলবেন যেন এক মাসের একটা ছুটির দরখাস্ত করে দেয় আর যে ঘটনা ওর অফিসে ঘটেছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠিও যেন দেয়। তাহলে আমার বিশ্বাস চাকরি সম্পর্কে আর কোন গোলযোগ হবে না।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে একটা দমবন্ধ আবহাওয়া থেকে যেন মুক্তি পেলাম। বৃদ্ধার চোখ দিয়ে তখনও অঝোরে জল ঝরছে, থান ধুতির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন—'বাবা, সবই তো বুঝি কিন্তু মন মানে না। আমার ছেলেকে যদি তুমি একটু বুঝিয়ে বলতে পারতে ভাল হত।'

বিনয়বাবু বৃদ্ধাকে ভরসা দিয়ে বললেন—'আপনি ভাববেন না। দিব্যেন্দুকে আমিই বুঝিয়ে দরখাস্ত দুটো কালই পাঠাবার ব্যবস্থা করব।'

এমন সময় সেই মেয়েটি দু হাতে দু কাপ চা এনে মায়ের সামনে ধরে বললেন—'মা, চা-টা ওঁদের এগিয়ে দাও।'

ছোট একটি কাপে চা, পিরিচে দুটি বিস্কুট বসানো। মেয়ের হাত থেকে কাপটা নিয়ে যে-আঁচলে চোখ মুছছিলেন সেই আঁচলেই পিরিচের তলাটা মুছে আমার সামনে ফুলের নকৃশা তোলা টেবিলক্লথটার উপর রাখলেন। চায়ের প্রতি তখন আমার একটা বিবমিষা দেখা দিয়েছে। মনে হচ্ছিল এ তো চা নয়, এক পেয়ালা চোখের জল যেন আমার সামনে ধরে দেওয়া হলো। কিন্তু বৃদ্ধার এই সস্নেহ আতিথেয়তা আমি সেদিন উপেক্ষা করতে পারি নি। গলা দিয়ে চা নামতে না চাইলেও তা নিঃশেষ করে বিদায় চাইলাম। বৃদ্ধা বললেন—'আরও একটু বোস বাবা, আমার ছেলে হয়তো এখুনি এসে যাবে।'

বিনয়বাবু আমার মানসিক অবস্থাটা অনুমান করে আমাকে উদ্ধার করলেন, বললেন—'রাত হয়ে এসেছে, ওঁকে আর আটকে রাখা ঠিক নয়। আমি বরঞ্চ এখন থেকে যাই, দিব্যেন্দুকে যা বলবার আমিই বুঝিয়ে বলব।'

সদর দরজা খুলে যখন বাইরে এসেছি, বিনয়বাবু আর দিব্যেন্দুর ভগ্নিপতি রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গে এলেন। রাস্তায় নেমে দিব্যেন্দুর বোনকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় চাইলাম। প্রতি নমস্কার করে প্রসন্ন হাসির আভা ছড়িয়ে বললেন—'বাড়ি তো চিনে গেলেন, আবার আসবেন।'

আমি বললাম—'যদি কখনও আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, জানাবেন, নিশ্চয়ই আসব।'

হাঁটতে হাঁটতে হাজরার মোড় পর্যন্ত এসে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। টালিগঞ্জের কত ট্রাম এসে চলে গেল আমার হুঁশ নেই। আমি শুধু ভাবছিলাম সেই বৃদ্ধার কথা, দিব্যেন্দুর কথা, ওর ভগ্নিপতির কথা। আর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেই হাস্যোজ্জ্বল একটি মুখ, পরনে লাল পাড় ঢাকাই শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর।

কিছুদিন বাদে মালা গ্রাম থেকে প্রভাত কলকাতায় ফিরে এল। খবর পেয়ে ডেকে পাঠালাম ওকে আমার বাড়িতে। ওর গল্প নিয়ে যা-ঘটেছে তা খুলে বলার পর ওকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম এমন গল্প সে কেন লিখল। কোন উত্তর নেই। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর সে যা বলল তা আরেক বিরাট কাহিনী, সে কাহিনী আপনাদের বলতে আমি চাই নে। তাছাড়া তার সঙ্গে সাহিত্যের কোনও সম্পর্ক নেই বলেই এ-ক্ষেত্রে তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

এই ঘটনার পর কালস্রোতে অনেকগুলি বছর পার হয়ে গেছে। পুরনো দিনের অনেক ঘটনাই স্মৃতির অন্তরালে আজ অবলুপ্ত। হাজরা রোডের একটি সন্ধ্যার সেই মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতাও হয়তো মন থেকে চিরকালের জন্য মুছে যেত, কিন্তু তা যায় নি একটি মর্মান্তিক খবরে।

বড় বাজারের বর্মণ স্ট্রীট ছেড়ে আমাদের অফিস উঠে এসেছে চৌরঙ্গী পাড়ায়। একদিন দুপুরে নিরিবিলি অফিসে বসে কাজ করছি, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। বিনয় ঘোষের কণ্ঠস্বর। বললেন—'একটা দুঃসংবাদ আপনাকে দিই, দিব্যেন্দুর বোনটি মারা গেছে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ছবির মত ভেসে উঠল একটি হাসিখুশি মুখ, ঢাকাই শাড়ির চওড়া লাল পাড় নিটোল দুটি গাল ছুঁয়ে আছে, কপালে সিঁদুরের টিপ। রিসিভারটা কানে ধরা ছিল, দুদিক থেকেই কোন কথা নেই। খানিক বাদে ওপাশ থেকে 'খট' করে আওয়াজ হতেই সম্বিৎ ফিরে এল, বিনয় বাবু ততক্ষণে টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছেন।

দিব্যেন্দুর বাড়ির কারুর সঙ্গেই আর কোনদিন আমার দেখা হয় নি, দিব্যেন্দু আজও আমার অপরিচিত। আমার এই কাহিনী এইখানে শেষ

করার আগে পাঠকদের কাছে একটি অনুরোধ জানিয়ে রাখি। যদি আপনাদের কারুর সঙ্গে দিব্যেন্দুর অথবা তার ভগ্নিপতির কখনও কোনদিন দেখা হয় তাকে আমার অন্তরের গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জানিয়ে দিয়ে শুধু এই কথাটুকু বলে দেবেন, আমি ওদের আজও ভুলি নি, কোনদিনও ভুলব না।

॥ ১৫ ॥

আমাদের জলধরদা, 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক জলধর সেনের কথাই বলছি, তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি বাঙালী ভদ্রলোক। তাই, খাওয়া-দাওয়ার নেমন্তন্ন এলে ভদ্রতা রক্ষার জন্যই তাঁকে যেতে হত, এ-কাজটাকে উনি কর্তব্য বলেই মনে করতেন। আসলে জলধরদা আর সব বিষয়েই নির্লোভ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একটিমাত্র দুর্বলতা ছিল, তিনি ছিলেন সত্যিকারের ভোজনবিলাসী। তাঁর এই দুর্বলতার পরিচয় তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার পাঠক ও লেখক মহলে অজানা ছিল না। যশোপ্রার্থী লেখকরা তাই ছেলের অন্নপ্রাশন, বোনের পাকা দেখা, মেয়ের জন্মদিন ইত্যাদি নানা উপলক্ষে জলধরদাকে আমন্ত্রণ জানাতেন, তাঁদের কোন সামাজিক অনুষ্ঠানই জলধরদাকে বাদ দিয়ে হত না; হলে এবং লোক পরম্পরায় সে-খবর যদি জলধরদার কানে আসত, তিনি মর্মান্তিক আঘাত পেতেন, ক্ষুণ্ণও হতেন। লেখকমহলের যে-কোন পারিবারিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে তাই জলধরদার ছিল নিত্য আনাগোনা।

সম্পাদকরূপে জলধরদার একটি মস্ত গুণ ছিল, যা সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের পত্রিকা-সম্পাদকদের মধ্যে কদাচ দেখা যেত। যে-কোন নেমন্তন্ন-বাড়ি থেকে ওঁকে আমন্ত্রণ জানালে উনি কিছুতেই 'না' বলতে পারতেন না, পাছে ফিরিয়ে দিলে ওরা মনে দুঃখ পায়।

'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দবাবু পারতপক্ষে কোন নেমন্তন্ন-বাড়িতে যেতেন না। কর্তব্যবোধে গেলেও আহারাদি করতেন না। সে-বিষয়ে উনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়ম-নিষ্ঠ মানুষ। আর প্রমথ চৌধুরী? সামাজিক

ক্রিয়াকর্মে যাওয়া তো দূরের কথা, সভাসমিতিতে সভাপতি সেজে বক্তৃতা দেওয়া পর্যন্ত ছিল ওঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।

জলধরদা এ-ব্যাপারে ছিলেন আশ্চর্য ব্যতিক্রম। একদিনে যদি একাধিক নেমন্তন্ন থাকে—উনি কোনোটাতেই গরহাজির থাকতেন না এবং প্রত্যেকটিতেই সমপরিমাণ আগ্রহ নিয়েই আহারাদি করতেন। নেমন্তন্ন রক্ষা করে যখন উনি বাড়ি ফিরতেন তখন দেখা যেত তাঁর উদরের সঙ্গে গলাবন্ধ কোটের বুক-পকেটটাও ফুলে ঢোল। কোনও বাড়ি থেকে ছোটগল্প, কোনও বাড়ি থেকে প্রবন্ধ, কিন্তু বেশীরভাগ রচনাই থাকত কবিযশোপ্রার্থীদের কবিতা।

এক বাড়িতে প্রচুর আহারাদির পর বিদায় নেবার সময় বাড়ির কর্তা একটি কবিতা এনে জলধরদার হাতে দিয়ে বললেন—

'আমার মেয়ে পদ্যটদ্য লেখে এবং ভালই লেখে। আপনি পড়ে দেখুন, আপনারও ভালই লাগবে। প্রবাসী-ট্রবাসী কাগজে পাঠালেই ছেপে দেবে। তবে আমার মেয়ের ইচ্ছে আপনার পত্রিকাতেই এটা যেন ছাপা হয়।'

উল্লসিত হয়ে উঠলেন জলধরদা। যেন কী অমূল্য বস্তু হাতে পেলেন। আগ্রহের সঙ্গে লেখাটি হাতে নিয়েই উনি উচ্চৈঃস্বরে পড়তে শুরু করে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ডান পা দিয়ে মাটিতে তাল ঠুকতে লাগলেন, ছন্দ ঠিক আছে কিনা পরখ করবার জন্যে। পড়া শেষ হতেই প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন জলধরদা।

—'অপূর্ব! অপূর্ব হয়েছে কবিতাটি। ছন্দে, ভাবে, ভাষায় অনবদ্য। লিখে যাও মা, লিখে যাও। এ ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা, থামতে নেই লিখে যাও।'

বলতে বলতে কবিতাটি ভাঁজ করে বুক পকেটে রাখলেন, পকেটটা আরেকটু ফুলে উঠল। জলধরদার ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারটা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোনদিন তিনি এর-জন্য লেশমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করতেন না।

এর উল্টো ঘটনাও ঘটেছে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার এক গ্রাহকের পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিয়মভঙ্গে আমন্ত্রিত হয়ে জলধরদা গেলেন। আরও বহু পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। প্রচুর পরিমাণে আহারাদির পর জলধরদা পরিচিতজনদের সঙ্গে শিষ্টালাপ করছেন এমন সময় মুণ্ডিত মস্তকে পরলোকগত পিতার একমাত্র পুত্র এসে বিনীতভাবে জলধরদাকে বললেন—'খাওয়া-দাওয়ায় আপনার কোন অসুবিধা হয় নি তো? আমি একা মানুষ,

ঠিক মত আপনাদের দেখাশুনো করতে পারি নি। কোন ত্রুটি ঘটলে, মার্জনা করবেন।'

ছেলেটিকে বুকের কাছে টেনে এনে জলধরদা স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন—'পিতৃদেবের পারলৌকিক কাজে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই তুমি রাখ নি। কিন্তু আমি এতক্ষণ বসে বসে ভাবছিলুম বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেল, অথচ কিছুই তো দিলে না আমাকে।'

ছেলেটি অপ্রস্তুত। তাই তো! জলধরবাবু নিশ্চয় ভুল করেছেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন আর ব্রাহ্মণ-বিদায়ের কোন ব্যবস্থাই তো সে করে নি। একটু ইতস্তত করে ছেলেটি বললে—'আমার বাবা আপনার সম্পাদিত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ছিলেন। প্রথম সংখ্যা থেকেই 'ভারতবর্ষ'র তিনি গ্রাহক এবং তা তিনি সযত্নে বাঁধিয়ে রেখেছেন। সেই কারণেই আমার বাবার পারলৌকিক কাজে আপনার উপস্থিতিই আমাদের একান্ত কাম্য ছিল। আপনি এসেছেন, আমরা ধন্য।'

জলধরদা ছেলেটিকে আর বিব্রত অবস্থায় ফেলে না রেখে সহাস্যে বললেন—'আমি তা জানি। তবে কি জানো, এ-ধরনের অনুষ্ঠানে যখনই আমার ডাক পড়ে তখনই বাড়ি ফেরার সময় কিছু-না-কিছু আমাকে নিয়ে ফিরতেই হয়—এই যেমন গল্প প্রবন্ধ বা কবিতা। একমাত্র এখানেই তার ব্যতিক্রম দেখে আশ্চর্য হয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।'

কথাটা জলধরদা সেদিন সরল চিত্তেই বলেছিলেন, আশপাশের লোকেরা কিন্তু কথাটা একটা মস্ত রসিকতা মনে করে হেসে উঠেছিল। আমি জানি এবং আজ মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারছি যে, জলধরদার সেদিনের এই কথায় কি শানিত বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল।

এ-কাহিনী শুনে আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, পকেটভর্তি যে-সব লেখা তিনি নিয়ে আসতেন তার সবই কি পত্রিকায় ছাপা হত?

না। তা হত না। এ-বিষয়ে জলধরদার কতকগুলো পদ্ধতি ছিল অভিনব। উদাহরণস্বরূপ ধরুন সেই মেয়ের লেখা কবিতা, যা তার বাবা জলধরদার হাতে তুলে দিয়েছিল। বেশ কয়েকমাস অপেক্ষা করার পর মেয়ের বাবা একদিন সকালে জলধরদার বাড়ি গিয়ে হাজির।

কন্যার কবিতাটির কথা জিজ্ঞাসা করতেই জলধরদা সলজ্জ হয়ে বললেন—

'আর বলেন কেন। সেদিন আপনার বাড়ি থেকে ফিরে এসে কোটটা আলনায় রেখেছিলাম। পরদিন খোঁজ করতে গিয়ে দেখি সেটা ধোপাবাড়ি চলে গেছে।'

এই সময়ে একটু থেমে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জলধরদা বললেন—'যতদিন গৃহিণী ছিলেন ততদিন পান থেকে চুনটি খসবার জো ছিল না। আর এখন? বাড়ি তো নয়, সরাইখানা!'

এ-কথার পর আর কোন মেয়ের বাপ চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে মেয়ের কবিতার জন্য দরবার করে!

জলধরদার দ্বিতীয় পদ্ধতির কথা এ-বৈঠকে বহুকাল আগেই বলেছি, 'ভারতবর্ষ' অফিসে লেখার খোঁজে গিয়ে প্রশ্নকারীই বিব্রত হয়ে চলে আসতেন এই জন্যে যে, জলধরদা কানে খুবই কম শুনতে পেতেন।

নেমন্তন্নবাড়ি থেকে নিয়ে-আসা রচনার পরিণতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর যদি কেউ চিঠি লিখে জানতে চাইতেন, তার উত্তরে তিনি লিখতেন—'প্রেসে দিয়াছি, যথাসময়ে উহা পত্রস্থ হইবে।'

যথারীতি সে-লেখা পত্রস্থ হত না। জলধরদার ভাষায় যথাসময়ের ব্যাপ্তি যে অনন্তকাল এবং 'প্রেস' যে অবাঞ্ছিত কাগজের ঝুড়ি তা দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর পত্রলেখক উপলব্ধি করতে পারতেন।

বাংলার অন্যতম সাহিত্য-পত্রিকা 'প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। যে-লেখায় সাহিত্যিক কোন মূল্য নেই তা তাঁর হাত দিয়ে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। যতই খাতির থাকুক, যে-লেখা তাঁর পছন্দ হয় নি তা তিনি সোজাসুজি জানিয়ে দিতেন, কোন লেখককে মিথ্যা স্তোক দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতেন না। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। তাঁর জীবনের একটি ঘটনা আপনাদের বলি।

একবার এক সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে তাঁকে কাশী যেতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি। তিনি স্থির করলেন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করবেন। পুণ্যালোভাতুর ছিলেন কি না জানি না। কিন্তু মণিকর্ণিকার ঘাটে দাঁড়িয়ে কাশীর গঙ্গা দেখলে যে-কোন ব্যক্তির মনেই অবগাহনের বাসনা জন্মায়।

একদিন ভোরবেলায় কাউকে না জানিয়ে স্নানার্থী হয়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে এসে উপস্থিত। দশাশ্বমেধ ঘাটের তুলনায় মণিকর্ণিকার ঘাট অপেক্ষাকৃত জনবিরল। লোকচক্ষুর অগোচরে স্নান করতে আসার কারণও ছিল। রামানন্দবাবু সম্পর্কে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, উনি কট্টর ব্রাহ্ম। হিন্দুসমাজের প্রধান তীর্থক্ষেত্রে ওঁর এই গঙ্গাস্নান নিয়ে পাছে কোন রকম কদর্থ হয় এই কারণে একাই চুপচাপ স্নান করতে এসেছেন। জলে নেমে কিছু-দূর মাত্র গিয়েছেন, হঠাৎ দেখলেন পায়ের তলায় মাটি নেই। আশ্বিনের ভরা গঙ্গার কুটিল আবর্ত তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে নিচের দিকে। আর উপায় নেই, এবার মৃত্যু অবধারিত। হঠাৎ অনুভব করলেন দুই অদৃশ্য বলিষ্ঠ বাহু তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। মুহূর্তের মধ্যে জলের উপর ভেসে উঠে বুক ভরে দম নিলেন। বুঝতে পারলেন, এ মৃত্যুর করাল গ্রাস নয়। একটি যুবক তাঁর অসহায় দেহটাকে নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় সাঁতরে চলেছে ঘাটের দিকে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি ফিরে আসতে পারলেন। ঘাটে এসে বিদায় নেবার সময় কৃতজ্ঞচিত্তে যুবকটিকে রামানন্দবাবু বললেন—'আজ নিশ্চিত মৃত্যু থেকে তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ, বল আমি তোমার জন্য কী করতে পারি।'

ছেলেটি বললে—'এ আর কি এমন কাজ করেছি যার জন্যে আপনি এত সঙ্কোচ বোধ করছেন। আপনারা কাশীর গঙ্গায় ডুব দিয়ে পুণ্য করেন, আমরা পুণ্য করি ডুবে যাওয়া মানুষদের ডাঙায় তুলে।'

রামানন্দবাবু বললেন—'তা কি হয়? তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, প্রতিদানে আমারও তো একটা কর্তব্য আছে। বল, তোমার জন্য কী আমি করতে পারি।'

যুবকটি এবার যেন একটু রুষ্ট হয়েই বললে—'ভারি তো একটা তুচ্ছ জীবনকে ডুবজল থেকে ডাঙ্গায় টেনে তুলেছি। তার জন্য পুরস্কার নিতে হবে? আমাকে কি আপনি পুরীর স্বর্গদ্বারের নুলিয়া ঠাওরেছেন?'

রামানন্দবাবু এবার একটু থমকে গেলেন। তবু বললেন—'আমার জীবনটা তুচ্ছ হতে পারে। কিন্তু আজকের এই ঘটনাটা আমার কাছে তুচ্ছ নয়। অন্তত তোমার পরিচয়টা জানতে পারি কি?'

যুবকটি এবার গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বললে—'আমরা হচ্ছি কাশীর ঝাণ্ডা ছেলে। জল থেকে টেনে তোলার কাজ আমাদের হরবখত করতে হয়। বলব কি মশাই, কলকাতার লোকগুলো কাশীর গঙ্গাকে ভাবে কালীঘাটের বুড়িগঙ্গা।

প্রায়ই ডোবে আর আমাদের চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলতে হয়। বাড়ফাট্টাইয়ের আর জায়গা পায় না।'

রামানন্দবাবু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'ওই যে কথাটা বললে তার অর্থ তো বুঝলাম না।'

'বাড়ফাট্টাই ? রোয়াব মশাই, রোয়াব। কলকাতার রক্‌বাজদের ভাষায়।'

আরও অবাক হয়ে রামানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'রোয়াব কথাটারই বা অর্থ কি।'

যুবকটি এবার একটু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে—'ও, আপনি দেখছি কিসসু জানেন না। কোলকাতার নন বুঝি ?'

রামানন্দবাবু বললেন—'এখন আমি কলকাতারই লোক। যে-বয়সে ও-সব ভাষা জানবার বুঝবার ও শিখবার কথা সে বয়েসটা আমার কেটেছে এলাহাবাদে।'

'তাই বলুন। তবে আর এ-সব কথা জানবেন কোত্থেকে। বাঙালরা যাকে বলে ফুটানি, ঘটিরা যাকে বলে রোয়াব কাশীতে তাকেই বলে বাড়ফাট্টাই।'

আর কালক্ষেপ না করে কোটের পকেট থেকে নোটবুক তুলে এনে এক পাতায় শব্দ দুটি টুকে নিলেন। উদ্দেশ্য বোধ হয় আভিধানিক রাজশেখর বসু অথবা ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি চাটুজ্যের কাছ থেকে শব্দ দুটির উৎপত্তিগত অর্থ জেনে নেওয়া। অপর পাতায় নিজের নাম ও প্রবাসী কার্যালয়ের ঠিকানা লিখে পাতাটা ছিঁড়ে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন—'আমার নাম ঠিকানা দেওয়া রইল। ভবিষ্যতে যদি কোন দিন আমি তোমার কোন প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।'

•

এই ঘটনার পর মাস ছয় পার হয়ে গেছে। একদিন দুপুরে প্রবাসী অফিসের দোতলার ঘরে বসে রামানন্দবাবু গভীর মনোনিবেশ সহকারে কড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখছেন। বিষয় হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। টেবিলের উপর সেন্সাস রিপোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়র ইত্যাদি ইতস্তত ছড়ানো। এমন সময় একটি যুবাকণ্ঠের আওয়াজ কানে এল—'আসতে পারি স্যার ?'

লেখার প্যাড থেকে চোখ তুলে দেখলেন একটি বলিষ্ঠদেহ যুবক দরজার চৌকাঠটার ওপারে দাঁড়িয়ে।

যুবকটি বিনয়জড়িত হাসি হেসে বললে—'চিনতে পারলেন স্যার? সেই কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাট?'

'বিলক্ষণ, চিনতে পারব না? গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিলাম, তুমিই তো আমাকে উদ্ধার করেছিলে। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এস এস, ভিতরে এস।' উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন রামানন্দবাবু।

সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে টেবিলের পাসে ছেলেটি সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রইল, চেয়ারে বসতে বলা সত্ত্বেও বসল না।

রামানন্দবাবু বললেন—'আমি খুব খুশী হয়েছি তুমি এসেছ। এবার বল আমি তোমার জন্য কী করতে পারি।'

যুবকটি যেমন সন্তর্পণে ঘরে ঢুকেছিল ততোধিক সন্তর্পণে বুক পকেট থেকে একটি ভাঁজ করা কাগজ বার করে রামানন্দবাবুর হাতে দিল।

রামানন্দবাবু ভাবলেন নিশ্চয় চাকরির দরখাস্ত, একটা রেকমেণ্ডেশন বা ক্যার‍্যাক্টার সার্টিফিকেট চায়। এ আর এমন কি কাজ, প্রয়োজন হলে সঙ্গে করে নিয়েও যেতে পারি। এ-কথা ভাবতে-ভাবতে কাগজের ভাঁজ খুলেই চম্‌কে উঠলেন। বলা ভালো আঁতকে উঠলেন, যেমন ওঠে পায়ের কাছে আচমকা সাপ দেখলে। সেই হর্ষোৎফুল্ল মুখ নিমেষের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অপটু হস্তাক্ষরে লিখিত একটি কবিতা, নাম—'এক নৌকোয় তুমি আর আমি।'

গম্ভীরমুখে আদ্যোপান্ত কবিতাটি পড়লেন। পড়ার পর ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। অবশেষে করুণকণ্ঠে বললেন—'এ-কবিতা তো ছাপতে পারব না। তার চেয়ে যে-গঙ্গা থেকে আমাকে তুমি উদ্ধার করেছিলে সেই গঙ্গায় আবার আমাকে ফেলে দিয়ে এস!'

'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক জলধর সেন ও 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামে প্রচলিত দুটি গল্প আপনাদের শোনালাম। এ-ঘটনা সত্যি কি না আমার জানা নেই। শোনা-গল্পই আপনাদের কাছে বললাম। সত্যি যদি না-ও হয় ক্ষতি নেই। বাংলার সাময়িক পত্রিকার দুই দিক্‌পাল সম্পাদকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরাই এ কাহিনীর উদ্দেশ্য।

শনিবার দিন দপ্তরে এসেছি একটু বেলা করেই। তার একটা কারণও ছিল। শুক্রবার সারারাত জেগে গান শুনেছি। আলাউদ্দীন সংগীত সমাজের তিন রাত্রিব্যাপী জলসার প্রথম রাত্রি কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছি বেলা আটটায়। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করেই দপ্তরে এসেছি, কোনরকমে তাড়াহুড়ো করে কাজকর্ম সেরেই ছুটতে হবে রূপবাণী চিত্রগৃহে, আবার অহোরাত্র জাগরণ। বড় বড় ওস্তাদদের আসর, না শুনতে পেলে জীবনটাই যেন বৃথা। রামপুর থেকে এসেছেন অশীতিপর বৃদ্ধ ওস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ। এক সময়ে তাঁর কণ্ঠের খেয়াল গান শুনবার জন্য লোকে পাগল হত। আজ বৃদ্ধের কণ্ঠে সাতটি স্বর সাতটি পোষা পাখির মত আর খেলা করে না। যৌবনের সতেজ কণ্ঠের সে দাপট নাই, সাপট তানের সেই ফুলঝুরি-বাহার আজ স্তিমিত। হলক আর গমক তান দমের অভাবে তিন সপ্তক পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে পারে না। তা না পারুক, তবু মরা হাতির দামও লাখ টাকা। গত সন্ধ্যায় ঢিমা লয়ে শুধ্ কল্যাণের খেয়াল যখন ধরলেন তখন চমকে উঠেছি রাগের বিস্তার আর তার চলন শুনে। মনে হল কতকালের হারানো সম্পদ যেন ফিরে পেলাম। নবীন যুবা কাশীনাথের দলে বুড়া বরজলাল শ্রোতাদের হাততালি কুড়োতে না পারলেও তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন লয় ঠিক রেখে বড় তালের খেয়াল কি ভাবে পথ কেটে এগিয়ে চলে উদারা থেকে মুদারায়, আবার মুদারা থেকে তারায়।

দপ্তরের কাজের ফাঁকে-ফাঁকে মনে পড়েছিল বৃদ্ধ খাঁ সাহেবের সেই বেদনাক্লিষ্ট মুখ যখন তারার গান্ধারে স্বরকে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড় করাবার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না।

বিকেল হয়ে এসেছে, বৈঠকের বন্ধুরা একে-একে আবির্ভূত হলেন। এসেছেন সব্যসাচী লেখক, গাল্পিক কথা-সাহিত্যিক, তরুণ কবি। আর এসেছেন আমাদের না-লিখে-সাহিত্যিক বিশুদা।

ঘরে ঢুকেই বিশুদা বললেন—'এ কি, আজ যে টেবিল পরিষ্কার, তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে বুঝি?'

বললাম সংগীত সম্মেলনের কথা। আজ আবার আলাউদ্দিন খাঁ ও আলী আকবরের যুগলবন্ধ সরোদ তারপর গোলাম আলীর গান। সুতরাং যেতেই হবে এবং গতকালের মত রাতও জাগতে হবে।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বিশুদা বললে—'কি করে যে রাতের পর রাত জেগে আপনারা কাওলাতি গান শোনেন বুঝে পাই না।'

বৈঠকে সেদিন উপস্থিত ছিলেন আরেকজন কথা-সাহিত্যিক, ইন্‌স্যুরেন্স অফিসের বড় চাকুরে। তিনি বললেন—

'আর বলেন কেন। লক্ষ্ণৌ-এ আমি এক ওস্তাদের পাল্লায় পড়েছিলাম। গিয়েছি মোটর অ্যাকসিডেন্টের একটা কেস্ নিয়ে। যে-হোটেলে উঠেছিলাম সেই হোটেলেই আছেন বরোদার ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ। আর আছেন তো আছেন, একেবারে আমার পাশের কামরাতেই।'

ভারত বিখ্যাত ওস্তাদের পাশের কামরায় থাকার সৌভাগ্যে ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক। আমি বললাম—

'শুনেছি খাঁ সাহেব রোজ সকালে তিন-চার ঘণ্টা রেওয়াজ করেন আর সে নাকি অপূর্ব। আপনি তো মশাই ভাগ্যবান।'

বিরক্তির সঙ্গে বললেন—'রাখুন মশাই। আমি আমার কাজকর্মের ধান্দায় সকাল নটার মধ্যেই বেরিয়ে যেতাম, ফিরতাম সন্ধ্যায়। উনি বেরিয়ে যেতেন সন্ধ্যায় আর ফিরতেন সকাল নটায়। আমার সঙ্গে দেখা হবেই বা কখন আর রেওয়াজই বা শুনব কখন? কিন্তু একদিন উনি মধ্যরাত্রে কখন ফিরেছেন জানি না। সকালে নটার মধ্যেই আমার বেরোবার প্রচণ্ড তাড়া, সেদিনই লক্ষ্ণৌ-এর কাজ চুকিয়ে কলকাতায় ফিরতে হবে। পাশাপাশি দুটো কামরার একটা ছিল কমন বাথরুম। তাড়াতাড়ি তোয়ালে-সাবান নিয়ে বাথরুমে ঢুকেই ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে হল। জল চৌকির উপর খালি গায়ে লুঙ্গি পরে এক বৃদ্ধ বসে, আরেকটা লোক তার গায়ে তৈল মর্দনে ব্যস্ত। চানের ঘরে ঢুকতেই বৃদ্ধ হাত নেড়ে এমন এক ধমক দিলেন যে পালিয়ে আসার পথ পাই না। লোকটা তো আচ্ছা অভদ্র! তখুনি চলে গেলাম ম্যানেজারের কাছে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন—সে কি মশায়, উনিই তো ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ। আমি বললাম—হতে পারে উনি মস্তবড় ওস্তাদ, কিন্তু আমাকে

ধমক দেবার তার কি অধিকার আছে। ম্যানেজার হেসে বললেন—ওটা ধমক নয়, গমক। গমক তান ছেড়েছিলেন। আপনি তো সকাল-সকাল রোজ বেরিয়ে যান। সারারাত বাইরে কাটিয়ে সকালে ফিরে এসে বাথরুমে উনি ঘণ্টা দুই তেল মালিশ করান, সেই সঙ্গে চলে রেওয়াজ।'

এ-কথায় সবাই হেসে উঠল। আমিই শুধু দুঃখ জানিয়ে বললাম—'আপনি সত্যিই দুর্ভাগা। এতবড় একজন ওস্তাদকে কাছে পেয়ে হেলায় হারালেন ?'

সব্যসাচী লেখক সুযোগ পেয়ে টিপ্পনী কেটে বললেন—'শাস্ত্রে কি আর সাধে তিনবার দিব্যি গেলে বলেছে—আরসিকেষু রসস্য নিবেদনং মা কুরু, মা কুরু, মা কুরু।'

গাল্পিক কথা-সাহিত্যিক এবার মুখ খুললেন। এক সময়ে বাপ-মাকে লুকিয়ে সংগীত চর্চা করেছেন, নিধুবাবুর টপ্পার কাজ আজও ওঁর গলায় অনায়াসে খেলে যায়; লক্ষ্ণৌ-ফেরত সাহিত্যিকের পক্ষ নিয়ে বললেন—'ওঁর আর দোষ কি। গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ওস্তাদদের ভয় পেতেন। শুনেছি একবার বরানগরে প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এসে উঠেছেন। দিলীপকুমার রায় রবীন্দ্রনাথকে ধরে পড়লেন—বরোদা থেকে এক বিখ্যাত ওস্তাদ কলকাতায় এসেছেন, নাম ফৈয়াজ খাঁ। তাঁর গান শুনতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব শুনেই আতঙ্কিত। কিন্তু দিলীপ রায় ছাড়বার পাত্র নন। গান শোনাবেনই। রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন—'মণ্টু, তুমি যখন বলছ তখন গান শোনাই যাক্। কিন্তু তোমার ঐ ওস্তাদটি থামতে জানেন তো ?'

আমি বললাম—'সে ঘটনা আমার জানা। বরানগরে একদিন সকালে দিলীপ রায় উদ্যোগী হয়ে ফৈয়াজ খাঁর গানের আসর বসালেন। পুরো একঘণ্টা ভৈরবীতে খেয়াল গাইবার পর যখন ঠুংরি ধরলেন 'বাজু বন্দ খুল খুল যায়' তখন রবীন্দ্রনাথের চোখ মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বেলা বারোটা বেজে গেছে, খাবার সময় উত্তীর্ণ, রবীন্দ্রনাথের হুঁশ নেই। ফৈয়াজ খাঁও তখন এতবড় একজন সমজদার গুণী শ্রোতাকে পেয়ে মেতে উঠেছেন। দরদী কণ্ঠে অন্তরের সমস্ত আবেগ উজাড় করে যখন একটি কলি নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছেন 'সাঁবরিয়া নে যাদু ডারা' তখন রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ শিরশ্চালন দেখেই বোঝা গিয়েছিল যে ভৈরবীর বেদনা-মধুর সুরের মূর্ছনা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে।

সেদিন সকালে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর গান শুনে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে যে প্রসংশা করেছিলেন তা পরদিন সব খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল।'

সব্যসাচী লেখক বললেন—'ফৈয়াজ খাঁ-র গান শোনার সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নি। কিন্তু আরেক ওস্তাদের গান শোনার একটা ঘটনা বলি। বহুকাল আগে পূরবী সিনেমায় নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলনের অধিবেশন চলছে। বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে রবিবার সকালের অধিবেশনে গান শুনতে গেলাম। সেদিনের প্রধান আকর্ষণ ছিল জ্ঞান গোঁসাই-এর গান।

জ্ঞান গোঁসাই স্টেজ-এ এসে যখন বসলেন সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘরোয়া পরিবেশ দেখা দিল। শিষ্য শাগরেদ পরিবৃত হয়ে মাঝখানে বসে পরিচিত জনদের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হল, কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে জৌনপুরীতে গান ধরলেন 'ফুলবনকো মৈ তো'। ঠেকা চলেছে—তবলায় ধা ধিন্ ধিন্ না। পিছন থেকে দু-দুটো তানপুরা ছাড়ছে সুর, অপর পাশে সম ফাঁক তাল লক্ষ্য রেখে হারমোনিয়াম বাজিয়ে চলেছে অপর এক শিষ্য। জ্ঞানবাবুর দরাজ ও বলিষ্ঠ কণ্ঠের গানে গমগম করছে আসর। সবেমাত্র একটা কঠিন তান তুলে সমে এসে ছেড়েছেন, এমন সময় ওঁর বিশেষ পরিচিত এক ব্যক্তি স্টেজের উপর এসে বসলেন। ভদ্রলোককে নজরে পড়া মাত্র জ্ঞানবাবু হাতজোড় করে মুখে হাসি এনে ঘাড়টা ডানদিকে কাত করলেন, অর্থাৎ 'ভালো তো ?'

আগন্তুকও তদ্রূপ ভঙ্গিতেই জানিয়ে দিলেন 'ভালো আছি'।

তবলায় ঠেকা তখন ফাঁক দেখিয়ে সমের কাছাকাছি প্রায় এসে পড়েছে। এক ঝটকায় মুখটা আগন্তুকের দিক থেকে তবলচীর দিকে ফিরিয়ে ডান হাতে শূন্যে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় মেরে বলে উঠলেন—'হাঃ'। বুঝলাম তবলচীকে সমের মুখে জানান দিলেন যে, উনি তালে ঠিক।'

গাইয়ে-বাজিয়েদের মেজাজ শরীফ না থাকলে আসর বরবাদ হয়ে যায়। এ-অভিজ্ঞতা আমার কিছু আছে, কারণ গান-বাজনার মহ্ফিল-এর খবর পেলেই রবাহূত গিয়ে আসরের এক কোণায় আসন নেওয়া আমার বহুদিনের অভ্যেস। আমি তাই বললাম—

'গান-বাজনার আসরে ওস্তাদদের মেজাজ খুশ্ না থাকলে গান জমে না। সেইজন্যে সব আসরেই একদল সমঝদার থাকেন যাঁদের কাজই হচ্ছে মাথা নেড়ে ওস্তাদদের তারিফ করা। ওস্তাদ যদি একটা সূক্ষ্ম কাজ করলেন

অমনি পার্শ্বচর শ্রোতাদের মধ্যে হইহই রব উঠল—কেয়া বাত্, কেয়া বাত্।' 'তুনে তো গজব কর দিয়া!' 'মাহ্শাল্লা।' 'হায় হায়'। এ ছাড়া ওস্তাদের সামনেই তাঁরা এমন প্রশস্তি শুরু করে দিলেন যেন জীবনে আর কখনও এরকম গান তাঁরা শোনেন নি। প্রত্যেকটি তারিফকে সেলাম জানিয়ে ওস্তাদরা সম্মানিত করেন। এটাই মহ্ফিল-এর প্রচলিত রীতি।

'ওস্তাদদের মেজাজের কথা বলছিলাম। একবার কলকাতার এক সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বেনারসের বিগতযৌবনা এক বিখ্যাত ঠুংরি-গাইয়ে বাইজীকে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর সঙ্গে লিখিত চুক্তি হল রেলভাড়া আর হোটেল খরচ সমেত হাজার টাকা, অলিখিত চুক্তি ছিল আসরে গান গাইতে বসার আগে এক পাইণ্ট স্কচ হুইস্‌কি। উদ্যোক্তারা লিখিত চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন কিন্তু তালেগোলে অলিখিত চুক্তির কথাটা গিয়েছিলেন বেমালুম ভুলে। বিখ্যাত বাইজীর গান শোনার লোভে সেদিন প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য। যথাসময়ে বাইজীকে হোটেল থেকে নিয়ে আসা হল, মাইক্রোফোন-এ ঘোষণা হয়ে গেল—কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি আসরে গান গাইবেন। গ্রীনরুমে বসে তানপুরা বাঁধা হল, তবলা বাঁধা হল, শারেঙ্গী বাঁধা হল। এবার আসরে গিয়ে বসলেই হয়। হঠাৎ বাইজী বেঁকে বসলেন—'ম্যয় তো গাঁউঙ্গী নহী।' এদিকে অধীর আগ্রহে শ্রোতা অপেক্ষা করছে, ওদিকে বাইজীর ঐ এক কথা 'গাঁউঙ্গী নহী'। এমন সময় উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজনের মনে পড়ে গেল অলিখিত শর্তের কথা। কপাল চাপড়ে বলে উঠলেন, এই র‍্যা, নটা বেজে গেছে, এখন তো কোন দোকানও খোলা পাব না যে দৌড়ে গিয়ে কিনে আনব। এখন উপায়? উপায় একটা হল। সম্মেলনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। বাইজীর আসরে আসতে দেরি হচ্ছে কেন খোঁজ নেবার জন্যে গ্রীনরুমে গিয়ে শুনলেন বাইজীর মেজাজ নেই, মেজাজের বন্দোবস্ত না হলে উনি গাইবেন না। প্রেসিডেণ্ট বললেন—'ইয়ে বাত? মুঝে কিঁউ নেহি বোলা?' সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারকে ডেকে বাড়ি পাঠিয়ে এক বোতল মেজাজ আনিয়ে ফেললেন। বোতলটা হাতে দিতেই বাইজীর মুখে হাসি ফুটল। সোডা আর গেলাসের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বললেন—'কোই জরুরত নহী।' বোতলের ছিপিটা অভ্যস্ত পাকা হাতে খুলে ঢক্‌ঢক্ করে গলায় ঢাললেন। আধ বোতল যখন নিঃশেষ, বোতলে আবার ছিপি আঁটলেন। হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে আয়না বার করে

চোখের কাজল আর গালের রঙ ঠিক আছে কিনা দেখে নিলেন, রুমাল বার করে কপালের ঘাম আলতো ভাবে মুছে নিয়ে বললেন—'বোলিয়ে কৌনসা গানা গাউঁ। গজল ইয়া ঠুংরি'। উদ্যোক্তারা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন, বাইজীর মেজাজ শরীফ। ওদিকে প্রেক্ষাগৃহে জনতা বিলম্বে অধৈর্য। ঘোষণা হল এবারে উনি আসরে এসে বসছেন। প্রথমে গাইবেন গজল, পরে ঠুংরি। হর্ষোৎফুল্ল শ্রোতাদের ঘন ঘন করতালির মধ্যে নীলাম্বরী শাড়ি পরে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে, আসরে এসে প্রথমে ধরলেন গজল—

"জিন্দগী ইউঁভী গুজরহী যাতি
কেঁ্যা তেরা রাহ্ গুজর ইয়াদি আয়া।"

গাল্পিক সাহিত্যিক এই সময় বললেন—'গানটার প্রথম দুই কলির সুরের একটু আন্দাজ দিতে পারেন?'

গানের আরম্ভের সুর আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। গুনগুন করে গেয়ে শোনাতেই বিশুদা বললেন—'গানের অর্থটিও তো জানা দরকার।'

বললাম—'অর্থ অতি সহজ। জীবন তো এভাবেও কোনমতে কেটে যেতো, তবু কেন তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল?'

সব্যসাচী লেখক কানের কাছে মুখ এনে চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—'বাইজীর বয়েসটা জানতে পারি?'

আমি বললুম—'বাইজীর বয়েস পঞ্চাশোর্ধে। কিন্তু যৌবনকালে যে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তা আজও তাঁর দেহসৌষ্ঠব, গায়ের রং আর চোখমুখের নিখুঁত গড়নেই বোঝা যায়। গজল শেষ করে ঠুংরি ধরলেন—'পিয়া তেরা তিরসি নজরিয়া লাগে শ্যাম।'

হইহই করে উঠলো পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতৃমণ্ডলী, আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। বেনারসী 'লচাও ঠুংরি'র কাটা-কাটা সূক্ষ্ম কাজ, যেন থোকা থেকে একটি-একটি করে আঙুর তুলে এনে রস নিঙড়ে ঢেলে দিচ্ছেন। আর কী অপরূপ গায়ন ভঙ্গিমা। কোলের কাছে তানপুরাটি সোজা দাঁড়িয়ে। চারটি তারের উপর ডান হাতের চাঁপার কলির মত মধ্যমা আর তর্জনী যেন নেচে বেড়াচ্ছে। বাঁ হাতটি কখনও কানের উপর চেপে ধরে সুর যাচাই করে নিচ্ছেন, আবার কখনও সামনে বিস্তৃত করে সমের মুখে পঞ্চমে সুর তুলে একটু ঝোঁক দিয়ে গেয়ে উঠছেন 'লাগে শ্যাম!' 'নজরিয়া' কথাটি নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যখন ছোট ছোট তান তুলে নানাবিধ নক্‌শার আলপনা

আঁকছিলেন তখন তাঁর কাজল-মাখা খঞ্জনসদৃশ চঞ্চল আঁখিতারায় যৌবনের বহু-অভ্যস্ত তির্যক চাহনি সংযমের বাঁধ ভেঙে নেচে উঠছিল। সুরের মায়াজাল আর মদভরনয়নার মোহিনী শক্তি অগণিত শ্রোতাকে আবেশে বিভোর করে ফেলেছে।

গান শেষ হতেই করতালির শব্দে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে। শ্রোতাদের ঘন-ঘন অনুরোধ, আরেকটা গান শুনতে চাই। বাইজী কিন্তু আর গাইলেন না। শ্রোতাদের কাছে নিবেদনের ভঙ্গিতে ছোট্ট একটি নমস্কার জানিয়ে তানপুরাটি আলগোছে সামনে শুইয়ে রেখে ধীরপদক্ষেপে স্টেজ ছেড়ে উঠে গেলেন গ্রীনরুমে। অর্ধনিঃশেষিত পানীয়র বোতলটা তখনও রাখা ছিল। একবার শুধু আড়চোখে সেদিকে তাকালেন। আর তার প্রয়োজন নেই। তারপর নিঃশব্দে বাইরে চলে এলেন অপেক্ষমান গাড়ির কাছে। তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে সেখানে প্রচুর ভিড় কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। জীবনে বহু প্রসংশা, বহু তারিফ বহু সমাদর তিনি পেয়েছেন, আজ তিনি সে-মোহের অনেক উর্ধ্বে। গাড়ি ছাড়বার সময় উদ্যোক্তাদের নমস্কার জানিয়ে শুধু বললেন—ম্যয় চলতী হুঁ, ফির মিলুঙ্গী।

গাড়ির চারপাশের মুগ্ধ জনতার এক প্রান্তে আমিও এসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। গাড়ি চলে যেতেই বাইজীর কণ্ঠে প্রথম গাওয়া গজলের দুটি কলি আমার অন্তরে গুঞ্জরিত হয়ে উঠল—জিন্দগী ইউভী গুজরহী যাতি, কেঁয়া তেরা রাহ্‌গুজর ইয়াদি আয়া। সে-কেন দেখা দিল রে, না দেখা ছিল রে ভাল।'

বিশুদা বললেন—'অব সমঝ লিয়া। এতক্ষণে বোঝা গেল কেন আপনি গান-বাজনার আসর পেলে আর সবকিছু ফেলে ছুটে যান।'

অরসিককে কি করে বোঝাব যে সংগীতের আস্বাদ ঈশ্বরাস্বাদের সামিল। বিশুদার কথার প্রতিবাদ না করে শুধু বললাম—'যে কোন ভালো গায়কের গান শুনতে পাওয়াটাই সৌভাগ্য। সংসারের শত কর্মে বিক্ষুব্ধ চিত্তকে তিন-চারঘণ্টার জন্য এমন একটা সুরলোকে পৌঁছে দেয় যেখানে সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে, সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে। সেই সময়টুকু রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় আপনার মনে হবে—'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।'

সব্যসাচী লেখক টিপ্পনী কেটে বললেন—'অর্থাৎ সুর ও সুরা কথা দুটির শব্দগত মিল যতটা অর্থগত মিলও ততটাই।'

আমি বললুম—'শব্দগত মিল থাকলেও এ-দুইয়ের ক্রিয়ার পার্থক্য অনেক। সুরের অমৃত যতই পান করুন তৃষ্ণা ততই যাবে বেড়ে। সুরা মাত্রাধিক হলেই মাতাল হতে হয়।'

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আমার ছাত্রজীবনে শান্তিনিকেতনের শাস্ত্রীয় সংগীতগুরু রণজিৎ সিং-এর কথা। রণজিৎ সিং ছিলেন বহরমপুরের লোক। তাঁর বাপ-ঠাকুরদা ছিলেন রাজস্থানী, গান বাজনা শিক্ষকতার কাজ নিয়ে বহরমপুরে এসে তাঁরা স্থায়ীভাবে সেখানেই বসবাস করেছিলেন। বাংলা দেশে বিষ্ণুপুর যেমন ধ্রুপদের জন্য বিখ্যাত, বহরমপুর ছিল খেয়াল ও ঠুংরির জন্য প্রসিদ্ধ। মুর্শিদাবাদের নবাব ও কাশিমবাজারের মহারাজা ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতের বড় পৃষ্ঠপোষক, এক সময়ে বহু গুণী ওস্তাদের সমাগম ছিল এই দুই দরবারে। রণজিৎ সিং-এর পূর্বপুরুষ কাশিমবাজারের মহারাজার আমন্ত্রণেই বহরমপুরে এসেছিলেন। এস্রাজ ও সেতার বাজনায় এই পরিবার ছিলেন বহরমপুরে বিখ্যাত।

শান্তিনিকেতনে ছাত্ররা যাতে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা করে সেদিকে রবীন্দ্রনাথের ছিল কড়া নজর। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ছাত্রদের মনে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের ভিত পাকা না হলে রাগরাগিণী ও তাল লয়ের বোধ জাগবে না। কিন্তু আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এটাও জানতেন যে, বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যদি তাঁর রচিত গান ভবিষ্যতে কোনদিন একান্তভাবে চর্চা করতে চায় তাহলেও হিন্দুস্থানী সংগীতের উপর বেশ কিছুটা দখল তাদের থাকা প্রয়োজন। কেননা রবীন্দ্রসংগীতের পূর্ণ রস উপভোগ করতে হলে চাই সংস্কৃতিবান রুচিশীল মন আর হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগরাগিণীবোধ।

এই কারণে ছোটবেলা থেকেই আমরা শান্তিনিকেতনে দেখেছি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীকে। তিনি ছিলেন একাধারে সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং হিন্দুস্থানী সংগীত শাস্ত্রে পারঙ্গম। বাল্যকালে ওঁর কাছে আমরা বসন্তবাহারের সুরে গান শিখেছি—'ক্যায়সে নিকসে চাঁদনী' ইমন-কল্যাণে—'তুঁহি ভজ ভজ রে', আশাবরীতে—'উন সন যায়কা হোরী' ইত্যাদি গান। ভীমরাও শাস্ত্রীরই উদ্যোগে সেই সময় হিন্দুস্থানী সংগীতের স্বরলিপি-সমেত দুটি চটি সংকলনগ্রন্থ শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে বাংলা হরফে ছেপে প্রকাশিত হয়েছিল। বই দুটির নাম ছিল 'সংগীত পরিচয়' ও 'সংগীত

দর্পণ'। সে-বই ছিল শান্তিনিকেতনের সংগীত শিক্ষার্থী ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের অঙ্গীভূত। বিভিন্ন রাগরাগিণীর উপর প্রচলিত বিখ্যাত হিন্দী গানগুলি অতি সযত্নে সংগ্রহ করে এই সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় আজ ভীমরাও শাস্ত্রী বেঁচে নেই, বই দুটিও বহুকাল ধরে পাওয়া যায় না, গানগুলিও হারিয়ে গিয়েছে।

ছাত্রসংখ্যা যখন ক্রমশই বাড়তে লাগল তখন ভীমরাও শাস্ত্রীর পক্ষে আর একা গান শেখানো সম্ভব হয়ে উঠছিল না। রবীন্দ্রনাথ তখন এমন একজন গুণী ওস্তাদের সন্ধান করছিলেন যিনি গান তো শেখাবেনই সেই সঙ্গে এস্রাজ, সেতার, তবলাও শেখাতে পারবেন। সৌভাগ্যক্রমে পেয়েও গেলেন। রবীন্দ্রনাথের পরম সুহৃদ কাশিমবাজারের মহারাজা প্রমথ চৌধুরীর কাছে খবর পেয়ে রণজিৎ সিংকে পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনে।

এক পুজোর ছুটির পর রণজিৎ সিং এসে উঠলেন লাইব্রেরী-ঘরের পিছনে খড়ের চালা বাড়ির একটা ঘরে। বয়স পঞ্চাশের উপর, সুতীক্ষ্ণ নাকের নীচে একজোড়া গোঁফ ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে থার্ড ব্রাকেটের মত ঝুলে পড়েছে। বাঁ-পাটা পঙ্গু, লাঠি ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে চলেন। অপূর্ব এস্রাজ বাজাতেন রণজিৎ সিংজী। সেতার ও তবলায় সমান দক্ষতা তাঁর ছিল কিন্তু গানের গলা ছিল কিছুটা কর্কশ। গান শেখানোর পদ্ধতি তিনি ভালই জানতেন। রণজিৎ সিংজীর আরেকটি গুণের পরিচয় পেয়েছিলাম বেশ কিছুদিন পরে। তিনি ছিলেন দক্ষ কারিগর। সেতার এস্রাজ ঘরে বসে নিজের হাতে বানাতেন। অবসর সময়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছেন, শিরীষ কাগজ দিয়ে কাঠ ঘষছেন, বার্নিশ লাগাচ্ছেন। রণজিৎ সিং মানুষটি ছিলেন আমাদের পরম বিস্ময়ের, ততোধিক বিস্ময়ের ছিল তাঁর হাতুড়ি বাটালি র‍্যাদা নিয়ে যন্ত্র বানাবার পদ্ধতি।

রণজিৎ সিং-এর ঘরে ছিল আমাদের অবাধ গতি। কখনও আপন মনে এস্রাজ বাজাচ্ছেন, কখনও যন্ত্রপাতি নিয়ে সেতার বানাচ্ছেন আবার কখনও আমাদের সঙ্গে গল্প করছেন বহরমপুরের, কখনও রাজস্থানের। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দীমিশ্রিত বাংলা বলতেন বিকৃত উচ্চারণে, তাতে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ থাকত প্রয়োজনাতিরিক্ত।

জ্ঞান গোস্বামীর তখন খুব নাম ডাক। ওঁর গানের রেকর্ড তখন প্রতি ঘরে-ঘরে। তিনিও বহরমপুরের লোক। একদিন জ্ঞান গোস্বামীর কথা তাঁর কাছে পাড়তেই বললেন—

'গেন্থর কথা বলছ? ওতো আমাদের বাড়ির ছেলে'র মত ছিল। ওর যখন তেরো-চৌদ্দ বছর বয়েস তখন আমার বাবার কাছে তালিম নিয়েছে, আমার কাছেও নিয়েছে।'

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি—'সে কি! আপনার কাছেও গান শিখেছেন?'

'হাঁ হাঁ, শিখেছে বই কি। কত খাতির করত আমাকে। পায়ের জুতো নিজের হাতে কতবার খুলে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, মাথা ছিল ওর। একটা তান একবার দেখিয়ে দিলে চট করে তুলে ফেলত।'

জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনার সঙ্গে আজকাল দেখা হয়?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বেদনা মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—'গেন্থ আজকাল কি রকম বদলে গিয়েছে। নাম যশ টাকা হলে মানুষ বদলে যায়। মাঝে-মাঝে বহরমপুর আসে, খবরও পাই, দেখা হয় না।'

একদিন বললাম—'রণজিৎ সিংজী, হিন্দুস্থানী গান ভাল করে শিখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার তো সে-রকম জ্ঞান নেই, শুনেছি দশ বারো বছর সময় লাগে। তাই আর সাহস করে এগোই নি।'

রণজিৎ সিং বললেন—'ঝুট্, বিলকুল ঝুট্ বাত। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সরগম্ সাধনা কর, যেমন করে মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম করে। মনমে সুর এসে গেলে কণ্ঠে আসতে কতক্ষণ। আর কণ্ঠে সুর এসে গেল তো ভগবানকে মিলে গেল। তখন প্রেমসে যত গান করবে, ভগবানের আশীর্বাদ ভি তত মিলবে।'

১৯৩২ সালের কথা। শান্তিনিকেতন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি দল গিয়েছিল লক্ষ্ণৌ রবীন্দ্রনাথের একটি গীতিনাট্য অনুষ্ঠানের জন্য। সেই দলে রণজিৎ সিং ছিলেন, আমিও কি এক অছিলায় ভিড়ে গিয়েছিলাম। উপলক্ষটা ছিল লক্ষ্ণৌ ম্যারিস কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠান। ম্যারিস কলেজের প্রশস্ত হল-এ তিনদিন ধরে হিন্দুস্থানী সংগীত সম্মেলনও চলছে, উত্তর ভারতের বহু গুণী ও বিখ্যাত ওস্তাদ এসেছেন। সুতরাং আমার কাছে লক্ষ্ণৌ আসাটা তীর্থক্ষেত্রে আসার সামিল। দলের অন্যান্যরা লক্ষ্ণৌ শহর ঘুরে দেখতে ব্যস্ত, আমি ও রণজিৎ সিংজী কনফারেন্সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছি। সময় কী ভাবে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে টেরও পাচ্ছি না।

দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালীন অধিবেশনের সর্বশেষ প্রোগ্রাম ছিল ভারত

বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া ওস্তাদ নসীরুদ্দিন খাঁ সাহেবের ধ্রুপদ গান। আমি আর রণজিৎ সিংজী তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা টাঙ্গা নিয়ে বেলা ১১টার মধ্যে হলে-এ এসে হাজির। তখন সাখাওয়াৎ হুসেন-এর সরোদ বাজনা চলছে। ঠিক বেলা বারোটার সময় আসরে এসে বসলেন ওস্তাদ নসীরুদ্দিন খাঁ। যেমন বিশাল বপু তেমনি রাজকীয় তাঁর সাজপোশাক। খাঁ সাহেবের মত অতবড় ধ্রুপদীয়া তখন ভারতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। ইন্দোরের বিখ্যাত ঘরানার বংশধর তিনি। পিতা আল্লাবন্দে খাঁ, প্রপিতা বৈরাম খাঁ, যাঁদের নাম উচ্চারণ করবার সময় আজও ওস্তাদেরা নাকে কানে হাত দিয়ে প্রণাম জানায়।

খাঁ সাহেব চোখদুটি মুদ্রিত রেখে সুর ছাড়লেন। মনে হল জোয়ারিদার কণ্ঠনিঃসৃত সুরের অনুরণন প্রেক্ষাগৃহের দেওয়ালে যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে। কখনও বাঘের মত আওয়াজ পরমুহূর্তে বীণাধ্বনি। দীর্ঘ আলাপের পর যখন লয়ের কাজ শুরু হয়ে গেল তখন গমগম করছে আসর, যেন মেঘের গুরুগুরু আওয়াজ। কণ্ঠে কত রকম ছন্দে কত রকম ধ্বনি। নাদব্রহ্ম কথাটা শুধু শুনেই এসেছি, সেদিন প্রত্যক্ষ করলাম।

মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি রণজিৎ সিং-এর দিকে। যেন আফিং-এর নেশায় বুঁদ হয়ে বৃদ্ধ ঝিমোচ্ছে। দুই পায়ের মাঝখানে রাখা লাঠিটার ঘোড়া-মুখো বাঁটে দুই হাত রেখে তার উপর থুতনিটা ঠেকিয়ে চোখ বুঁজে বসে আছেন রণজিৎ সিংজী। কোন সাড়াশব্দ নেই।

গান ধীরে মন্থরে শুরু হয়ে পরতে পরতে বিস্ময় সৃষ্টি করে এক উত্তেজনার শিখর থেকে আরেক শিখরে ছুটে চলেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমঝদার শ্রোতারা 'হায় হায়' শব্দে ফেটে পড়ছেন। কিন্তু রণজিৎ সিংজী সেই যে চোখ বুঁজে পাথরের মত স্থির হয়ে বসে আছেন তো আছেনই। ডানদিকের ঠোঁটটা যেন অনেকখানি ঝুলে পড়েছে, সেই সঙ্গে গোঁফও। সন্দেহ জাগল, বুড়ো গান শুনছে না ঘুমচ্ছে। গানের আসরে শ্রোতারূপে যে-রস আমি উপভোগ করছি তা আমার পাশের পরিচিত লোকটিও সমান উপভোগ করছে জানতে পারলে আনন্দ হয়। সেইজন্যে এই ধরনের আসরে কখনও কোন রকম সাড়া না পেয়ে মনটা দমে গেল। আমার আনন্দের ভাগ দেব তা হলে কাকে?

বেলা চারটের সময় আসর ভাঙল। পুরো চারঘণ্টা একজনের গান এক

নাগাড়ে শোনার অভিজ্ঞতা আমার সেই প্রথম। কিন্তু গায়কের চোখেমুখে ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই। পরম তৃপ্তির আনন্দ নিয়ে শ্রোতারা প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে—রণজিৎ সিং-এর কিন্তু উঠবার নাম নেই, ঠিক সেই-ভাবেই বসে আছেন। আর সন্দেহ রইল না, বুড়ো নির্ঘাত ঘুমুচ্ছে। ডেকে তুলব কি না ভাবছি, হঠাৎ লাঠির মাথায় রাখা দুই হাতের চেটোতে ভর দিয়ে থুতনি নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট ধ্বনি, একটা চাপা ক্রন্দনের শব্দ।

—'কি হল রণজিৎ সিংজী, কি হল?' ওঁর গায়ে হাত দিলাম, শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। শুধু বললেন—'হাঁড় গুঁড়িয়ে দিলে।' এই কথা বলেই আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন, চোখে নেশাগ্রস্ত মানুষের ঘোলাটে দৃষ্টি। চোখের জলে বৃদ্ধের দুই গাল ভেসে গেছে। বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় শুধু বললেন—'মুঝে ভগবানকো পা মিলা। যব গানা খতম হুয়ী ওহ্ চলে গয়ে।'

হল ছেড়ে আবার টাঙ্গায় চড়ে নিজেদের ডেরায় ফিরলাম—সারা রাস্তা রণজিৎ সিং-এর মুখে ঘুরে ফিরে শুধু একটি মাত্র কাতর বিলাপ 'ওহ্ চলে গয়ে।'

এ-কাহিনী বলার পর বৈঠকের বন্ধুদের মুখে আর কথা নেই, সবাই চুপ। আমি বললাম—'তাহলে বুঝতে পারছেন সংগীতের আবেদন মানুষের অন্তরে কত গভীর।'

বিশুদা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। আমার কথার পাল্টা জবাবে বললেন—'আপনাদের রণজিৎ সিং ছিলেন সংগীতপ্রেমী লোক। শুধু তাই নয়, সংগীত সাধকও। কিন্তু আমাদের কাছে ওস্তাদি গান শুধু কসরত বলে মনে হয়।'

আসরের গাল্পিক সাহিত্যিক বললেন—'ওস্তাদী গানের সমঝদার হতে হলে নিজের মধ্যে খানিকটা প্রস্তুতি থাকা চাই। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ গায়ক ও শ্রোতার সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেছেন—একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে। গায়কের সঙ্গে শ্রোতার অন্তরের তন্ত্রী একসুরে বাঁধা থাকা চাই।'

সব্যসাচী লেখক বললেন—'রণজিৎ সিং-এর আরও কিছু ঘটনা আমাদের বলুন।'

না-লিখে-সাহিত্যিক বিশুদা বললেন—'ও, গল্প লেখার খোরাক বুঝি জোগাড় করছেন।'

আমি বললাম—'সে দিনের ঘটনায় মানুষটির চরিত্রের আরেকটা দিক আমার কাছে খুলে গেল। এবার আমি ওঁর পুরোপুরি চ্যালা বনে গেলাম। কিন্তু তাঁর শাগরেদি করার সৌভাগ্য আমার বেশিদিন হয় নি।

ওঁর শরীর ক্রমশই খারাপ হয়ে পড়েছিল। একা মানুষ, তার উপর সাত্বিক ব্রাহ্মণ। স্বপাক খেতেন। শরীর ভেঙ্গে পড়ায় কিছুদিনের ছুটি নিয়ে বিশ্রামের জন্য বহরমপুর গেলেন আর ফিরলেন না। শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার মাস দেড়েক বাদেই খবর এল তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

কথায় কথায় কখন যে আটটা বেজে গেছে টের পাই নি। ওদিকে রঙমহলে কন্‌ফারেন্স বোধ হয় শুরু হয়ে গেল। পথে কোন একটা পাঞ্জাবীর দোকানে ঢুকে রুটি আর মাংস-তড়কা খেয়ে সারা রাত জাগতে হবে। বৈঠকের বন্ধুরা উঠি-উঠি করেও উঠছেন না, আড্ডার এমনই মৌতাত। আমার তাড়াতাড়ি উঠবার প্রয়োজন থাকা সত্বেও গতরাত্রে সংগীত সম্মেলনে যে-কাণ্ডটা হয়েছিল তা না বলে থাকতে পারলাম না। আমি বললাম—'আপনারাই বলুন, আমার চেহারার সঙ্গে বিখ্যাত গায়ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কি খুব বেশী মিল আছে?'

বিশুদা ভ্রূজোড়া কুঁচকে চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা এনে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। আমি যেন চিত্র প্রদর্শনীর দেয়ালের ঝোলানো পোর্ট্রেট আর জবরদস্ত আর্ট-ক্রিটিক বিশুদা কখনও সামনে ঝুঁকে, কখনও চেয়ারের গায়ে শরীরটা টান করে পিছিয়ে নিয়ে, কখনও ডান দিকে হেলে, কখনও বাঁদিকে ঝুঁকে, আমাকে দেখে নিয়ে বললেন—'হুঁ, তা কিছুটা মিল আছে বলেই তো মনে হয়।'

আসরের গাল্পিক সাহিত্যিক বললেন—'গ্রামোফোন রেকর্ডের খামের উপর ভীষ্মদেব চাটুজ্যের যে ফোটো ছাপা হয় তার সঙ্গে চেহারার বেশ আদল আছে।'

আমি বললাম—'এ-কথা আরও অনেকেই আমাকে আগেও বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি নি। কিন্তু বিশ্বাস করতে হল গতকাল রাত্রের এক অভাবনীয় ঘটনায়।'

সব্যসাচী লেখক বললেন—'কি ব্যাপার, একটা কিছু কমেডি অফ এররস ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম—'ঠিক তার উল্টো। ট্রাজেডি অফ এররস বলতে পারেন।'

গতকাল রাত বারোটার সময় মুস্তাক হুসেন খাঁ আসর থেকে গান গেয়ে বিদায় নিলেন, তার পরে ছিল সরোদ বাজনা। এই অবসরে পান-জর্দা খেয়ে ঘুম তাড়াবার মতলবে অডিটরিয়ম থেকে বেরিয়ে বারান্দা ধরে এগোচ্ছি কোণার পানের দোকানের দিকে। হঠাৎ নজরে পড়ল সামনে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করছেন। কাঁচা-পাকা গোঁফ, পরনে গিলে হাতা আদ্দির পাঞ্জাবি, কাঁধে পাট করা গরম শাল, বাঁ-হাতে কোঁচানো ধুতির খুঁট ধরা, ডান হাতে হাতির দাঁতের বাঁট লাগানো ছড়ি। ভদ্রলোকের কাছে যখন এসে পড়েছি হঠাৎ ঢিপ করে আমাকে এক প্রণাম; একেবারে পা ছুঁয়ে প্রণাম। খুড়োর বয়েসী ভদ্রলোকের এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এক লাফে বেশ খানিক পিছনে হটে গেলাম। মুখে বিগলিত হাসি এনে গদগদ ভাষায় বললেন—'ওস্তাদ, ঠিক চিনতে পেরেছি। শুনেছি আপনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এখন আপনার শরীর সুস্থ তো?'

ভদ্রলোকের দুই হাত ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললাম—'দেখুন, আমি আপনার ওস্তাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় নই। আপনি কেন, অনেকেই এই ভুল করে থাকেন।'

আমি পানের দোকানে জর্দা-পানের অর্ডার দিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি বারান্দার সেই ভদ্রলোক, সেই জায়গাতেই, বিমূঢ়ের মত আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। বোধ হয় তখনও তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে আমি ভীষ্মদেব নই।

এই ঘটনা বলার পরই দেখি বিশুদা পকেট থেকে একটা আধ খাওয়া সিগারেট বার করে ঠোঁটে গুঁজে হাতটা টেবিলের উপর মেলে ধরে বললেন—

'দেশলাই।'

সিগারেট ধরালেন, ধোঁয়াটা এড়াবার জন্যে চোখ-দুটো আধবোঁজা অবস্থায় রেখে বললেন—'চা'।

এই রে! রাত প্রায় নটা বাজে, এখন আবার চা! বুঝলাম বিশুদার পেটের ভিতর একটা গল্প ভুড়ভুড়ি কাটছে, শুধু এক কাপ চায়ের অপেক্ষা।

আমার তখন একমাত্র ভাবনা, এতক্ষণে বুঝি আলাউদ্দিন খা সাহেবের বাজনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

বিশুদা চা-এর জন্য আবার তাগাদা দিয়ে বললেন—'আপনাকে দেখে লোকটা ভীষ্মদেব চাটুজ্যে বলে ভুল করেছিল। কিন্তু আমি আর একটা ঘটনা জানি। শরৎ চাটুজ্যেকে দেখে একটা লোক শরৎ চাটুজ্যে বলে ভুল করেছিল। কই, চা আসুক।'

হাতজোড় করে বিশুদাকে অনুরোধ জানালাম—'বিশুদা, আপনার গল্প শুনতে গেলে আমার বাজনা শোনা হবে না। ওটা আসছে শনিবারের জন্য তোলা থাক।'

॥ ১৭ ॥

শরৎ চট্টোপাধ্যায়কে শরৎ চট্টোপাধ্যায় বলে ভুল করেছিল, এমন লোকও বাংলা দেশে আছে! কথাটাই যেন আমাদের কাছে কি রকম গোলমেলে বলে মনে হল। বিশুদার কথা তো, উদ্ভট কিছু একটা গল্পের আভাস দিয়ে আমাদের উৎকণ্ঠায় রাখা ওঁর চিরকালের স্বভাব। পরের শনিবার দপ্তরে বেলা পাঁচটার মধ্যে সবাই হাজির, বিশুদার দেখা নেই।

সব্যসাচী লেখক সুযোগ পেয়ে বললেন—'বিশুবাবুর যখন আসতে দেরিই হচ্ছে তখন আসুন সময় কাটাবার জন্যে আমরা পরচর্চা শুরু করে দিই।'

বৈঠকের বন্ধুদের ধারণা পরনিন্দা বা পরচর্চা হচ্ছে খই ভাজার উৎকৃষ্ট সাবসটিট্যুট। সময় কাটাতে হলে কর পরচর্চা—এটাই হল বৈঠকী-বন্ধুদের স্লোগান। আর পরচর্চা হবে তাকে নিয়েই, যে বৈঠকে অকারণে অনুপস্থিত। পরচর্চার এমনই গুণ যে মারণ উচাটন বাণ-মারার মতই এ ফলপ্রসূ। যে অনুপস্থিত থাকে তার মানসিক অবস্থাটা অনুমান করুন। সব সময় তার মনের মধ্যে এক যন্ত্রণা, তাকে নিয়ে কি শ্রাদ্ধটাই না করা হচ্ছে। যেখানেই সে থাকুক, হন্তদন্ত হয়ে পড়ি-কি-মরি অবস্থায় ছটফট করতে করতে তাকে ছুটে আসতেই হয়।

সব্যসাচী সাহিত্যিকের উৎসাহ পেয়ে তরুণ কবি শুরু করলেন—'বিশুদা কবে একদিন রসচক্রের আসরের এক কোণায় বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন সেই সুবাদে শরৎ চাটুজ্যেকে নিয়ে যতরাজ্যের গল্প আমাদের কাছে বলবেন।'

গাল্পিক সাহিত্যিক বললেন—'ওঁর ভাবখানা এমন যে, আমাদের সে-আসরে বসবার সুযোগ না-পাওয়াটা যেন মস্ত দুর্ভাগ্য।'

সব্যসাচী লেখক মুখটা যতখানি সম্ভব বিকৃত করে বললেন—'কে জানে ওঁর কথার কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে।'

আমি বললুম—'আপনারা যাই বলুন-না-কেন শরৎবাবুর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমাদের মধ্যে একমাত্র বিশুদারই হয়েছে। উনি ভাল করেই জানেন শরৎবাবু সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। সুতরাং বিশুদা সে-সুযোগ ছাড়বেন কেন।'

সব্যসাচী লেখক বললেন—'তাই বলে উনি বেমালুম সব গাঁজাখুরী গল্প বলে যাবেন আর আমাদের তা সুবোধ বালকের মত শুনে যেতে হবে?'

তরুণ কবি বললেন—'বলতে দিন, পার্সেন্টেজ বাদ দিলেই হল।'

—'কে কার পার্সেন্টেজ বাদ দেয়।' বিশুদার কণ্ঠস্বর শুনে চম্‌কে উঠলাম।

তাকিয়ে দেখি দরজার কাছে বিশুদা গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে—ঘরে ঢুকছেন না।

'আসুন, আসুন বিশুদা—আসুন'—সবাই সমস্বরে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম।

বিশুদা গম্ভীর গলায় বললেন—'বলি, হচ্ছে কতক্ষণ।'

—'কি হচ্ছে?'

—'কি আবার, আমার ছেরাদ্দ।'

সব্যসাচী লেখক বললেন—'সবে শুরু করেছিলাম, হতে আর দিলেন কোথায়।'

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন—'আপনারা এমন জায়গায় অফিস করেছেন যে, আসতে গেলে রাস্তায় হাজার বাধা। ট্রামে করে বড়বাজারের মোড়ে এসেই দেখি হ্যারিসন রোডের উপর লোকে লোকারণ্য। ট্রাম থেকে নেমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে দেখি রাস্তার উপরেই দুটো পুরুষ্টু ষাঁড় সিং-এ সিং লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটার রং কালো

আরেকটার সাদা। একবার কালোটা সাদাটাকে ঠেলে চার-পাঁচ গজ পিছনে হটিয়ে দিয়ে সিং-এ সিং লাগানো অবস্থায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, আরেকবার সাদাটা কালোটাকে। ভিড়ের মধ্যে আমার পাশেই মশাই দুই মারোয়াড়ী দুই ষাঁড়ের উপর লাগাই শুরু করে দিলে।'

কে একজন প্রশ্ন করল—'লাগাই আবার কি!'

বিশুদা বললে—'জুয়া মশাই জুয়া। প্রথম মারোয়াড়ী যেই বললে—ধলা দশ, দ্বিতীয় ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে বললে—কালো দশ। তারপর শুরু হয়ে গেল—

—ধলা বিশ।

—কালো বিশ।

—ধলা ত্রিশ।

—কালো ত্রিশ।

এদিকে দুই ষাঁড়ের কিন্তু ওই এক অবস্থা। ন যযৌ ন তস্থৌ।

লাগাই যখন একশ টাকায় উঠেছে তখন হঠাৎ আমার খেয়াল হল—এই রে, বৈঠকে তো আমার বারোটা না বাজিয়ে ছাড়বে না। ষাঁড়ের লড়াইয়ের ফলাফল ফেলেই ছুটে আসতে হল।'

চায়ের দোকানের ছোকরাটা এসে কয়েক কাপ চা টেবিলে রেখে গেল। বিশুদার দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে বললাম—'চটপট চা-টা খেয়ে নিন। শরৎবাবুকে নিয়ে সেই ঘটনাটা শুনবার জন্যে আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি।'

'দাঁড়ান মশাই। অত তাগাদা দিলে কি গল্প বেরোয়? যে-রকম উত্তেজনা থেকে এসেছি তাতে স্নায়ুগুলোকে একটু জিরোতে দিতে হবে তো।'

আমরা আর প্রতিবাদ করলাম না। কারোর দিকে না তাকিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আস্তে আস্তে চায়ের কাপে শেষ চুমুক মেরেই দুটো আঙুল ঈষৎ ফাঁক করে বাড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ ফাঁকের ভিতরে যে-কেউ একজন সিগারেট গুঁজে দিক। দেওয়া হল। বাঁ হাতটা এবার টেবিলের উপর মেলে ধরলেন অর্থাৎ দেশলাই চাই। দেওয়া হল। সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা টেবিলের উপর ধরাস করে ফেলে দিলেন। যার দেশলাই সে নিজে কুড়িয়ে নিক। জলন্ত সিগারেটটা তর্জনী আর মধ্যমার গোড়ায় গুঁজে হাতটা মুঠো করে ফেললেন। বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনীর মাঝে যে ফোকর সৃষ্টি হল সেইখানে মুখ দিয়ে একটা টান দিলেন যেন গাঁজার কল্কেতে দম দেওয়া হল। এক টানেই

ছাইটা অর্ধেক নেমে এসেছে। ধোঁয়া নাক-মুখ দিয়ে আর আমরা বোরোতে দেখলাম না।

সব্যসাচী লেখক আর থাকতে না পেরে বলে ফেলল—'পকেটে দেশলাই-সিগারেট নেই কিন্তু নেশাটি ঠিক আছে।'

গাল্পিক সাহিত্যিক আধ্যাত্মিকতার গন্ধ পেলেই চাগিয়ে ওঠেন। তিনি বললেন—'মূলকে ধরে রাখাই তো সাধনার সারকথা। ঈশ্বরকে যে পেয়েছে সে তাতেই বুঁদ হয়ে থাকে। তার কাছে তখন আর সব কিছুই অবান্তর।'

এতক্ষণে বিশুদা চোখ খুললেন। ডাইনে-বাঁয়ে দুই সাহিত্যিকের দিকে চোখটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে মুখটা উপরের দিকে তুলে পেটের মধ্যে এক রাজ্যের জমিয়ে-রাখা ধোঁয়া ঘরের চালা লক্ষ্য করে ছাড়লেন, যেন ভিসুভিয়াসের পেট থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। অনুমান করলাম, পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। বিশুদা রেগেছেন, ফেটে পড়লেন বলে। গল্পের মাথায় ডাণ্ডা পড়ার আগেই বিশুদাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললাম—'বিশুদা, ওঁদের কথায় কান দেবেন না। আপনি যে-ঘটনাটা বলবেন বলেছিলেন সেটা শুরু করুন।'

বিশুদা বললেন—'আমার অবর্তমানে যা হচ্ছিল, হচ্ছিল। সাক্ষাতে আর কেন। তবে হ্যাঁ। যে-ঘটনাটা আপনাদের বলতে যাচ্ছি সেটা আমার নিজের চোখে দেখা, এক বিন্দু বানানো নয়।

১৯৩৬ সাল, শরৎবাবুর মৃত্যুর দুই বছর আগের ঘটনা। আমার বাবার খুব অসুখ। এদিকে ব্লাড্‌প্রেশার, ওদিকে ডায়াবেটিস। তার উপর কদিন ধরে পেটের গোলমালে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। একদিন দুপুরে বাড়াবাড়ি, ডায়রিয়ার লক্ষণ। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে আনলাম। ভাল করে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু একটা মিক্সচারের প্রেসক্রিপশন লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন—ওষুধটা তাড়াতাড়ি আনিয়ে দু-ঘণ্টা পরপর এক দাগ করে খাইয়ে যান।

তখন বৈশাখ মাস, প্রচণ্ড গরম। রাস্তার পিচ গলে চট্‌চটে হয়ে আছে। কালীঘাট অঞ্চলের সব কটা ডিসপেন্সারি ঘুরলাম, সবাই বললে এ-ওষুধ ওদের কাছে নেই। এদিকে রোদে মাথার চাঁদি ফাটার উপক্রম, আমারও রোখ চেপে গেল ওষুধ না নিয়ে বাড়ি ফিরব না। রসা রোডের মোড়ের কাছে একটা ওষুধের দোকানে প্রেসক্রিপশনটা দেখিয়ে কম্পাউণ্ডারকে বললাম—

কি ব্যাপার বলুন তো, কালীঘাটে সব দোকান ঘুরেছি, সবাই বললে এ-ওষুধ নেই। আপনিও কি তাই বলবেন ?

—তা না বলা ছাড়া আর উপায় কি। এই যে হিউলেটস্ মিক্সচার লিখে দিয়েছেন—ওটা তো বিলিতী ওষুধ, আজকাল পাওয়াই যায় না। ওটার বদলে একটা দেশী ওষুধ বেরিয়েছে—বিসমার্ক পেপসিন কম্পাউণ্ড। বলেন তো ওটা দিতে পারি। তবে প্রেসক্রিপশানে ওটা লিখিয়ে আনতে হবে।

আমি বললুম—তা হবে না মশাই। যা লেখা আছে তাই নিয়ে যেতে হবে। এই দুপুর রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে হয়রান। আবার ডাক্তারের বাড়ি ছুটব ?

কম্পাউণ্ডার একটু রেগেই বললেন—তাহলে সাহেব পাড়ায় ছুটুন। পেলে সেখানেই পাবেন, এখানে নয়।

—কেন, আপনারাও বিলিতী বর্জন করেছেন বুঝি। কিম্বা দেশী কোম্পানীর মাল কাটাবার জন্যে মোটা কমিশন খাচ্ছেন।

কম্পাউণ্ডার মশাই এবার খেঁকিয়ে উঠলেন—যান যান, আপনার সঙ্গে তর্ক করলে আমার চলবে না, হাতে অনেক কাজ।

—আপনার সঙ্গেও আমার তর্ক করবার প্রবৃত্তি নেই।

এই কথা বলেই তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে আবার আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ দিয়ে হেঁটে চলেছি, দুপাশে ওষুধের দোকান দেখলে ঢুকি আবার বেরিয়ে আসি।

হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েছি দেশপ্রিয় পার্কের কাছে। পার্কের পুব দিকে একটা জনবিরল রাস্তা। সেই রাস্তার উপরে কিছু দূরেই একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে—পার্ক ফার্মেসি। ভাবলাম, বড় রাস্তার দোকান তো অনেক দেখলাম। এবার অলি-গলির দোকানগুলিতে ঢুঁ মারা যাক। গলির দোকানে খদ্দেরের ভিড় সাধারণত কমই হয়। সেখানে বিলিতী ওষুধের পুরনো স্টক পড়ে থাকা অসম্ভব নয়। রোদে পুড়ে তেতে গলদ্ঘর্ম অবস্থায় দোকানের সামনের লাল ফুলে-ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়ালাম একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে।

ছোট্ট দোকান। কাঠের কাউণ্টারের ওপাশে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক গম্ভীর মনোনিবেশের সঙ্গে একটা বই পড়ছেন। পিছনে সার সার তিনটি আলমারিতে নানা লেবেলের পেটেণ্ট ওষুধ সাজানো, ঘরের দেয়ালে দরজার

পাল্লায় দেশী ও বিলিতী ওষুধের প্রচার-চিত্র ঝুলছে। দোকানে আর কেউ নেই।

ফুটপাথ থেকে দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে একেবারে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভ্রূক্ষেপ নেই। এক মনে এবং একাগ্র মনে বই পড়ে চলেছেন। কৌতূহল হল। কী এমন বই যে খদ্দেরের দিকে মুখ তুলে তাকাবার ফুরসত নেই। গলাটা একটু বাড়িয়ে প্রথমে বইটা দেখে নিলাম। বিপ্রদাস। শরৎ চাটুজ্যের সাম্প্রতিক প্রকাশিত উপন্যাস। আমার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাবার জন্য গলা খাঁকারি দিলাম, কা কস্য। ভদ্রলোক এক ঝটকায় পাতাটা উল্টে বাঁদিকের পাতার উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। বই-এর পাতা থেকে ওঁর চোখ ফেরানো অসম্ভব জেনেই প্রেসক্রিপশনটা এগিয়ে ধরে বললাম—ও মশাই, শুনছেন ?

কে কার কথা শোনে। সন্দেহ জাগল ভদ্রলোক নিশ্চয় কানে কালা। আরেক ধাপ গলা চড়িয়ে বললাম—ও মশাই, বলি শুনতে পাচ্ছেন ?

বই-এর পাতা থেকে চোখ না তুলে শুধু বললেন—অত চেঁচাচ্ছেন কেন। কি চাই বললেই তো হয়।

ষা-চ্চলে। যা ভেবেছিলুম তা নয়। কি রকম দোকানদারি বাবা। খদ্দেরকেই ধমকানি ! আমার মেজাজ তখন আসমানে চড়বার কথা। কিন্তু বই-পাগলা লোক, তার উপর শরৎ চাটুজ্যের। সুতরাং যতটা সম্ভব গলাটা মোলায়েম করে বললাম—একটা ওষুধ নিতে এসেছি। পাওয়া যাবে ?

বইয়ের পাতায় চোখ নিবদ্ধ রেখেই বাঁ-হাত দিয়ে ফস্ করে কাগজটা আমার হাত থেকে নিয়ে বাঁদিকের কাউন্টারের উপর প্রসারিত করে হাঁক দিলেন—প্রাণকেষ্ট।

বাঁদিকের কোণটায় একটা কাঠের পার্টিশন দেওয়া খুপরি। এক পাশে একটা কালো পর্দা ঝুলছে। পর্দার উপরের দিকে একটা পেস্ট-বোর্ড পেরেক দিয়ে মারা, তাতে ইংরিজী হরপে লাল কালিতে লেখা—নো অ্যাডমিশন।

কালো পর্দাটা একটু ফাঁক করে প্রথমে একটা মুণ্ডু দেখা দিল। মুণ্ডু দেখেই অনুমান করলাম চেহারা দেশলাইয়ের কাঠি। বয়েস চল্লিশ পার হয়েছে, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। প্রাণকেষ্ট পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলেন। রোগা লিকলিকে শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে গেছে। গায়ের গেঞ্জিটা ঘামে

ভিজে এমন ভাবে লেপটে আছে যে পাঁজরার হাড় গোনা যায়। প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে দেখে বললেন—পাওয়া যাবে, তবে তৈরি করতে একটু সময় নেবে।

'পাওয়া যাবে' কথাটা শুনলাম এক ঘণ্টা ঘোরাঘুরির পরে। পরম তৃপ্তিতে মন ভরে গেল। হোক না দেরি। পেয়েছি এটাই অনেকখানি। জিজ্ঞাসা করলাম—কত দেরি হবে?

—এই আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ইচ্ছে করলে ঘুরেও আসতে পারেন।

এই রোদে আর গরমে কোথায় ঘুরব। দোকানের একটা টুল টেনে নিয়ে পার্কের দিকে মুখ করে বসে পড়ে বললাম—আমি এখানেই অপেক্ষা করি, আপনি ওষুধটা তৈরি করুন।

পর্দানশীন প্রাণকেষ্ট আবার পর্দার আড়ালে অন্তর্ধান করলেন।

তাহলে বই-পাগলা ভদ্রলোক হচ্ছেন দোকানের মালিক, প্রাণকেষ্ট হচ্ছে তাঁর কম্পাউণ্ডার। বেলা তখন হবে প্রায় দুটো। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ, বাইরে তাকানো যায় না। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। জনশূন্য পার্কের সোনাঝুরি গাছটার ছায়ায় একটি ভিখারিনী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কোলের কাছে দুটি কঙ্কালসার উলঙ্গ শিশু বসে বসে ধুঁকছে। দুপুরের স্তব্ধতা ভেদ করে মাঝে মাঝে দু-একটা ট্রাম সশব্দে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। আশপাশের বাড়ির আলসের ছায়ায় বসে কয়েকটা কাক মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে।

দোকানের মালিকের দিকে এবার তাকালাম। আবার বইয়ের পাতা উল্টোলেন। কালো পর্দাটার দিকে তাকালাম। প্রাণকেষ্ট কি আবার ঘুমিয়ে পড়ল? কাউণ্টারের গায়ে পিঠটা হেলান দিয়ে ক্লান্ত পা-দুটো টান করে ছড়িয়ে দিয়ে বসে রইলাম। ওষুধ যখন তৈরি হয় হোক, আমি ততক্ষণ জিরিয়ে নিই।

হঠাৎ চমকে উঠে খাড়া হয়ে বসলাম। এই কাঠফাটা রোদ্দুরে নিতান্ত পাগল আর আমার মত বিপদগ্রস্ত লোক ছাড়া কে রাস্তায় বেরোয়। কাকে দেখছি দোকানের সামনে! স্বয়ং শরৎবাবু এসে উপস্থিত। গায়ে হাফ-হাতা পাঞ্জাবি, হাতে লাঠি। শুভ্র কাশের মত মাথার চুল অবিন্যস্ত। দোকানের

সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে একবার সাইন বোর্ডটা দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

দোকানের মালিকের দিকে তাকিয়ে আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম। যাঁর লেখা বই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে পড়ছেন সেই লেখক সশরীরে তাঁর সামনে উপস্থিত তাঁরই দোকানের খদ্দের হয়ে অথচ ভদ্রলোকের সেদিকে কোনও নজরই নেই। যেমন পড়ছিলেন তেমনিই পড়ে চলেছেন।

শরৎবাবু একটু ইতস্তত করে ভদ্রলোকের সামনে একটা কাগজ এগিয়ে ধরে বললেন—এই ওষুধটা আমাকে দিন।

বই থেকে মুখ না তুলে ভদ্রলোক হাঁক দিলেন—প্রাণকেষ্ট, দেখ তো কি চায়।

কালো পর্দার ভিতর থেকে প্রাণকেষ্টর পুনরাবির্ভাব হল। শরৎবাবুর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে একটা আলমারির ডালা সরিয়ে যা বার করল, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'ইউকোডোল'। অনুমান করলাম কোনও বিলিতী কোম্পানীর ওষুধ।

প্রাণকেষ্ট কাউণ্টারের উপর কাগজ আর ওষুধটা রেখে বললে—মেমো করে দিন। আর কোনও বাক্য ব্যয় না করে প্রাণকেষ্ট আবার কালো পর্দার ভিতরে ঢুকে পড়ল। শরৎবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রাণকেষ্টর আসা ও যাওয়া নিরীক্ষণ করলেন।

ভদ্রলোক বইটার পাতার উপর একটা কাচের পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে ড্রয়ার খুলে একটা ক্যাশমেমো বার করলেন। মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ছাপ। খসখস করে ওষুধের নাম আর দাম লিখে কাগজটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন—দু টাকা।

শরৎবাবু পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে কাউণ্টারের উপর রাখলেন। নোটটা ড্রয়ারের ভিতর রেখে তিনটা খুচরো টাকা বার করে শরৎবাবুর হাতে দেবার সময় ভদ্রলোকের কী যে করুণা হল হঠাৎ মুখ তুলে তাকালেন। টাকাটা শরৎবাবুর হাতে দেবেন বলে হাতটা সবে বাড়িয়েছিলেন, মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। চোখেমুখে ভদ্রলোকের বিস্ময় বিমূঢ় ভাব। দু-এক সেকেণ্ডের মধ্যেই সামলে নিলেন। মেমো আর টাকা শরৎবাবুর হাতে দিতেই তিনি তা হাফ-হাতা পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দোকান থেকে বেরোবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় দোকানের মালিক মুখে বদান্যতার হাসি এনে বললেন— একটা কথা বলব স্যার?

বলুন কি বলবেন। শরৎবাবু ভদ্রলোকের দিকে মুখ ফেরালেন।

—কিছু মনে করবেন না তো?

—কিছুমাত্র না। আজীবন প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আসছি। প্রশ্নের কি আর শেষ আছে? বলুন কি বলতে চান।

ভদ্রলোক সংকোচের সঙ্গে বললেন—দেখুন, আপনাকে ঠিক শরৎ চাটুজ্যের মত দেখতে।

কথাটা শুনেই শরৎবাবু একটু থমকে গেলেন। পরমুহূর্তেই চোখে মুখে এমন একটা ভান করলেন যেন প্রশ্নটা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। বললেন—কোন শরৎ চাটুজ্যে?

—নবেলিস্ট শরৎ চাটুজ্যে, যিনি শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেবদাস, বিপ্রদাস লিখেছেন।

গম্ভীর গলায় শরৎবাবু বললেন—ও, অনেকে তাই বলে বটে।

শরৎবাবু আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাস লিখলে কি হবে। মানুষের প্রশ্নের তো আর শেষ নেই। আবার কি জিজ্ঞাসা করে বসে সেই ভয়ে একটু তাড়াতাড়ি দোকান থেকে ফুটপাথে নেমে মনোহর পুকুর রোডের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

আমার মাথায় তখন দুষ্টবুদ্ধি চেপে গেল। ভাবলুম একটু রগড় করা যাক। শরৎবাবু যখন বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়েছেন তখন আস্তে আস্তে পুস্তক-পাঠ-নিমগ্ন ভদ্রলোকের কানের কাছে ঝুঁকে গলাটা একটু খাটো করেই বললাম—ও মশাই, চিনতে পারলেন না? উনিই তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ছুঁচ ফুটিয়ে দিলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে তেমনি কথাটা কানে যাওয়া মাত্র আচমকা চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন—অ্যাঁ, উনিই শরৎচন্দ্র? নবেলিস্ট শরৎ চাটুজ্যে? তা এতক্ষণ বলেন নি কেন? তাছাড়া আমার দোকানে উনি কেন আসবেন।

কাউণ্টারের সুইং-ডোরটা এক ঝটকায় খুলে বিদ্যুৎগতিতে ফুটপাথে ছুটে নেমে গেলেন। যাবার সময় হাতের ধাক্কা খেয়ে কাচের পেপার-ওয়েটটা ছিটকে মাটিতে পড়তেই দেখলাম নো-অ্যাডমিশন লেখা কালো পর্দাটা নড়ে উঠল, একটুখানি ফাঁক দিয়ে প্রাণকেষ্টর দুই উদ্বিগ্ন চোখ আমার দিকে জ্বল-জ্বল করে তাকিয়ে আছে।

ওদিকে দোকানের মালিক তখন ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছেন সেই পথের দিকে, গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের যে-নির্জন পথ দিয়ে শরৎচন্দ্রের দীর্ঘ দেহ ধীরপদক্ষেপে মনোহরপুকুর রোডের মোড়ে এসে মিলিয়ে গেল।'

বিশুদা এবার থামলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন সিগারেট এগিয়ে দিল, আরেকজন পকেট থেকে দেশলাই বার করে ধরিয়ে দিল। বেয়ারা অমর ছুটে চলে গেল চা আনবার জন্যে।

আমি বললুম—'বিশুদা আপনার অনুপস্থিতিতে আমরা আপনার সম্বন্ধে বৈঠকে যে-সব কটুকাটব্য করেছি তা প্রত্যাহার করছি।'

বৈঠকের সবাই আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন শুধু একজন ছাড়া। সব্যসাচী লেখক বললেন—'তা না হয় হল। কিন্তু আমার মনে একটা খটকা থেকে গিয়েছে। বিশুদা আমাদের বৈঠকে বরাবরই গর্বের সঙ্গে জাহির করে এসেছেন যে শরৎবাবুর সঙ্গে ওঁর পরিচয় সাধারণ পরিচয় নয়, এক গেলাসের ইয়ার বললেই হয়। তাই যদি হবে তাহলে বিশুদার সঙ্গে শরৎবাবু একটিও কথা বললেন না কেন?'

সব্যসাচী লেখক এবার একটা অকাট্য যুক্তি ছেড়েছেন। আমাদেরও তো এতক্ষণ এটা খেয়াল হয় নি। পাঁচ জোড়া জিজ্ঞাসু চোখ বিশুদার মুখের উপর ফোকাস ফেলল, উনি কিন্তু নির্বিকার। ঠোঁটের কোণায় কৌতুকপূর্ণ হাসির ঝিলিক তুলে আপন মনে পা দোলাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ বিরতির পর বিশুদাই মুখ খুললেন। বললেন—'ঘটনাটা হচ্ছিল ওষুধের দোকানদার আর শরৎবাবুকে নিয়ে। তার মধ্যে আমার কথা আসবে কেন? আর এলেও, যেহেতু ঘটনাটা আমিই বলছি, সেই হেতু নিজের কথা বলাটা আমি ভালগারিটি বলেই মনে করি। শরৎবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল বইকি। ওষুধ নিয়ে দোকান থেকে যাবার সময় আমার দিকে হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে।'

আমি বললুম—'রসচক্রর আসরে নিয়মিতই যাই, সেখানেই আমাকে দেখেছেন।'

—'ও, তাহলে তুমিও একজন রসচক্রী। তা এই দুপুরে এখানে কোন রসের সন্ধানে।'

আমি বললাম—'এসেছিলাম ওষুধের সন্ধানে, কিছু রসের সন্ধানও তো পেয়ে গেলাম। কিন্তু আপনি এই রোদে ছাতা না নিয়ে বেরোলেন কেন?'

শরৎবাবু বললেন—'ছাতা নিয়েই বেরনো উচিত ছিল। বেরোবার সময় ভুলে লাঠিটা নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। লাঠিটাই সব সময় হাতে রাখা আমার অভ্যেস।'

'—আপনি নিজে না এসে চাকরকে পাঠিয়ে দিলেই তো পারতেন।'

শরৎবাবু বললেন—'দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার ঘণ্টা খানিক বাদেই পেটে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়। নতুন একটা ওষুধ বেরিয়েছে, এইটা খেলে একটু আরাম বোধ করি। ভেবেছিলাম ওষুধটা আনতে চাকরকেই পাঠাব। ব্যাটা কাল সারারাত কোথায় কাটিয়েছে কে জানে, দুপুরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। তাই নিজেই বেরিয়ে পড়লাম।' এ কথা বলেই শরৎবাবু বাড়ির দিকে রওনা হলেন, আমিও দোকানে ফিরে এলাম।

বিশুদার কথা থামতেই আসরের গাল্পিক লেখক বললেন—'বাংলা দেশে জীবদ্দশায় পাঠক-ভাগ্য শরৎবাবুর মত আর কারোর হয় নি। অথচ শরৎবাবুর পাঠকভীতি সর্বজনবিদিত। এই কারণে কোন সভাসমিতিতে ওঁকে নিয়ে যাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর বক্তৃতা? নৈব নৈব চ।'

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল বার্নার্ড শ-র সম্বন্ধে একটা বিখ্যাত গল্প। বার্নার্ড শ'র তখন খুব নাম-ডাক। একদিন লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, এক ভদ্রমহিলা হাইহিল জুতোর খুট-খুট খুট-খুট দ্রুত শব্দ তুলে বার্নার্ড শ'র পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়েই বার বার ঘুরে ঘুরে শ-কে দেখছেন। বার্নার্ড শ' লম্বা লম্বা পা ফেলে ভদ্রমহিলার কাছে এসে বললেন—'ম্যাডাম, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমিই জর্জ বার্নার্ড শ'।'

পার্ক ফার্মেসির সেই দোকানদারের কথা ঘুরে ফিরে বার বার মনে পড়ছিল। এমন একনিষ্ঠ পাঠক সচরাচর দেখা যায় না। বিশুদাকে তাই বললাম—'আপনার মুখে ঘটনাটা শুনে সেই দোকানের মালিকের উপর কিন্তু আমার অসীম শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। চলুন, সেই নমস্য ব্যক্তিটিকে একবার দেখে আসি। বিশেষ করে সেই কম্পাউণ্ডার প্রাণকেষ্টকে।'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিশুদা বললেন—'দুঃখের কথা আর বলেন কেন। কয়েক বছর পরের কথা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেছে। আমার স্ত্রীর মরণাপন্ন অসুখ, তাঁকে ল্যান্সডাউন রোডের রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালে

রেখেছি। একদিন ডাক্তার একটা ইন্‌জেকশন কিনে আনতে বললেন, যা লিণ্ডসে স্ট্রীট ছাড়া আর কোন অঞ্চলের ওষুধের দোকানে পাওয়া সম্ভব নয়। পার্ক ফার্মেসির কথা মনে পড়ে গেল। লিণ্ডসে স্ট্রীট ছুটব? তার চাইতে কাছের এই দোকানটা একবার দেখাই যাক। গেলাম দেশপ্রিয় পার্কের পূর্বদিকের রাস্তায়। সেখানে গিয়ে দেখি পার্ক ফার্মেসির কোন চিহ্নই নেই। সে তল্লাটটা ভেঙ্গেচুরে সেখানে এক বিরাট ইমারত গড়ে উঠছে, শুনলাম কোন এক ব্যাঙ্কের বাড়ি তৈরী হচ্ছে।'

সব্যসাচী লেখক মন্তব্য করলেন—'উপন্যাস পড়েই বোধ হয় ভদ্রলোক ব্যবসাটা লাটে তুলে দিলেন এবং এর জন্যে শরৎবাবুই দায়ী।'

॥ ১৮ ॥

একই নামে দুই লেখকের আবির্ভাবের পরিণাম যে কী তার উদাহরণ স্বরূপ দুই শরৎচন্দ্রের কাহিনী বলতেই বৈঠকের সবাই নকল শরৎ চাটুজ্যে সম্বন্ধে আরও কিছু জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন। গল্পলহরীতে আমার লেখা গল্প প্রকাশিত হয়েছিল বটে কিন্তু তাঁকে চাক্ষুস দেখার সৌভাগ্য আমার কোন দিন হয় নি। মফস্বল থেকে কলকাতায় এসে যখন স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেছি, তখন তিনি জীবিত কিন্তু লেখকরূপে প্রায় বিস্মৃত। সুতরাং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হবার সম্ভাবনাও ছিল না, সুযোগও কখনও ঘটে নি।

বৈঠকের গাল্পিক সাহিত্যিক বহুকাল বাদে মুখ খুললেন। তিনি বললেন—'এই নকল শরৎ চাটুজ্যের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ একবার মাত্র হয়েছিল।'

আমরা সবাই উৎসুক চিত্তে নড়েচড়ে বসলাম, একটা কিছু নতুন কাহিনী শোনার আশায়।

কিন্তু আমাদের বৈঠকের গাল্পিক সাহিত্যিকের ওই এক কৌশল। তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসে পাঠকদের যেমন আগাগোড়া সাসপেনস্‌-এ রেখে লেখার শেষ পরিচ্ছেদে এনে চমকে দেন, আমাদের বৈঠকে গল্প বলতে বসেও সেই একই টেকনিক প্রয়োগ করে থাকেন। 'চাক্ষুষ পরিচয়ের একবার মাত্র

সুযোগ হয়েছিল'—এইটুকু বলেই একটা রসাল কাহিনীর আভাস দিয়ে নীরব। আমরা জানি, এরপর পকেট থেকে নস্যির কৌটো বেরোবে, সন্তর্পণে দু-আঙুলে নস্যির টিপ ধরা হবে, তারপর বাঁ-হাতের আড়াল দিয়ে সড়াৎ করে নস্যিটা নাকে টেনে নিয়েই কিছুক্ষণ ভোম হয়ে বসে থাকবেন। ভাবখানা হচ্ছে, যেটুকু বলেছি সেইটুকু নিয়েই হাঁকুপাঁকু কর। ততক্ষণে গল্পর আরম্ভটা কি ভাবে হবে এবং কিভাবে শেষ করব ভেবে নিই। গল্প লেখার আর্ট আমাদের সকলেরই কিছু-কিছু জানা বিভিন্ন লেখকের বই পড়ে, কিন্তু গল্প বলারও যে একটা আর্ট আছে তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম প্রথমত পরলোকগত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন-এর মুখে গল্প শুনে, দ্বিতীয়ত সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে দিনের পর দিন আড্ডা দিয়ে, তৃতীয়ত আমাদের গাল্পিক-সাহিত্যিকের সঙ্গে বৈঠকী আলাপচারিতে।

বৈঠকের সব্যসাচী লেখক আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন—'আপনি তো প্রবাসী-ভারতবর্ষে গল্প নিয়ে যাতায়াত করতেন শুনেছি। গল্পলহরীতেও গল্পের উমেদারী করতেন বুঝি?'

নীরবতা ভঙ্গ করে গাল্পিক-সাহিত্যিক বললেন—'পাড়ার হাতে-লেখা পত্রিকা বাদ দিলে কলেজ-ম্যাগাজিন-এর পর গল্পলহরীতেই আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। একটা নয়, একাধিক গল্প আমার প্রকাশিত হয়েছিল। ডাকেই লেখা পাঠাতাম এবং দু-এক মাসের ব্যবধানে তা ছাপাও হত। কোন লেখারই দক্ষিণা তখন পাই নি, প্রত্যাশাও করি নি। গল্প প্রকাশিত হচ্ছে সেইটিই ছিল একমাত্র দক্ষিণা। সুতরাং সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনই তখন ছিল না। কিন্তু একবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল।'

গাল্পিক-সাহিত্যিক থামলেন, অন্তত আবার দু মিনিট বিরতি। বিরক্ত হয়ে বৈঠকের মধ্যমণি বিশুদা একটু খোঁচা দেবার উদ্দেশ্যেই বললেন—'লেখা ফেরত এসেছিল বুঝি?'

গাল্পিক-সাহিত্যিক বললেন—'লেখা ফেরত এলে সম্পাদকের কাছে কৈফিয়ত চাইতে যাওয়া আমার স্বভাব নয়, কোনদিনও আমি তা করি নি। সম্পাদক মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

এবার বিশুদা চোখে-মুখে খানিকটা নিশ্চিন্তির ভাব এনে বললেন—'তাই বলুন। আমি ভেবেছিলাম অশ্লীল গল্প লিখেছিলেন বলেই বোধ হয় লেখাটা ফেরত এসেছিল।'

বৈঠকের সব্যসাচী লেখক বললেন—'নিশ্চয় অসাধারণ গল্পই লিখেছিলেন যার জন্য সম্পাদক লেখককে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

গাল্পিক-সাহিত্যিক এবার বিশুদার দিকে তাকিয়ে বললেন—'আপনার অনুমানটাই আংশিক সত্যি। আমি যে গল্পটা পাঠিয়েছিলাম তা চিরাচরিত ধাঁচের গল্প ছিল না, অর্থাৎ একেবারে নিরামিষ গল্প নয়। সে-সময় কল্লোল দলের লেখকেরা যে-সব বিষয়বস্তু নিয়ে লিখেছিলেন তাতে সুনাম ও দুর্নাম দুইই সমান জুটেছিল। লেখক-জীবনের শুরুতে সে-সব গল্প পড়ে যে তেতে উঠি নি তা নয়। ইচ্ছে হল এবার এমন একটা গল্প লিখতে হবে যাকে আপনাদের সমালোচকদের ভাষায় বলা হয়ে থাকে 'বোল্ড স্টোরী'। গল্পটা ছিল ইট সুরকির কারবারী এক হঠাৎ-বড়লোকের সুন্দরী বউকে নিয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে দিন কাটানোই স্বামীর একমাত্র আকর্ষণ, স্ত্রীর ভালবাসার মর্যাদা দেয় নি বলেই স্ত্রীর ভালবাসা থেকে সে বঞ্চিত ছিল। প্রথমে সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ, পরে শুরু হল অকথ্য অত্যাচার। নিরুপায় হয়ে সে কুলত্যাগ করল, আত্মহত্যা সে করে নি। স্বামী আরও বেশি ডুবে রইল মদ আর মেয়েমানুষে, নিত্য নতুন মেয়েমানুষ তার চাই। একদিন তার ইয়ার-বন্ধুদের একজন সন্ধান দিল বেশ্যাপল্লীতে সদ্য আগতা এক নতুন পাখির। সেদিন সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মত্ত অবস্থায় বেশ্যাপাড়ার এই নতুন পাখির ঘরে গিয়ে দেখে তারই স্ত্রী মোহিনীমূর্তি ধরে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। গল্পের শেষে দু'জনের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, সমাজকে পরিত্যাগ করলেও মন থেকে সংস্কারকে মুছে ফেলতে তারা পারে নি।'

গল্পলহরীর সম্পাদকের চিঠি পেয়েই সেদিন দুপুরে কলেজ কামাই করে চলে গেলাম ওঁর দপ্তরে। মাঝ-বয়েসী এক ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছেন, অনুমানে বুঝলাম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। এক বুক দাড়ি, গায়ে ফতুয়ার উপর সাদা চাদর জড়ানো।

পরিচয় দিয়ে ওঁর চিঠির কথা উল্লেখ করতেই আমার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বসতেও বললেন না। অবশেষে কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর এনে বললেন—'সংস্কার' নামে যে-গল্পটা পাঠিয়েছ সেটা তোমার লেখা ?

আমাকে দেখে ওঁর মনে গল্পের লেখক সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

তখন আমার বয়েস কতই বা হবে। কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, ষোলো-সতোরের বেশি নয়। গল্পটা যে আমারই লেখা সে-কথা জানিয়ে দিতে কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন। তারপর চেয়ারে বসার ইঙ্গিত দিয়ে যে খাতায় এতক্ষণ লিখছিলেন সেটা বন্ধ করলেন, কলমটা রাখলেন টেবিলের দেরাজে।

দাড়ি পরিবৃত মুখে থমথমে গাম্ভীর্য। একটা ফাইল থেকে গল্পটা টেনে বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—'তোমার লেখার হাত আছে কিন্তু এ-সব গল্প লিখে ক্ষমতার অপব্যবহার করছ কেন ?'

আমি বললাম—'লেখাটা কি আপনার খারাপ লাগল ?'

—'লেখা খারাপ নয়, বিষয়বস্তুটাই খারাপ। আজকাল দেখছি একটা ফ্যাশান হয়েছে মেসের ঝি আর বিশেষ পাড়ার মেয়েমানুষ নিয়ে গল্প লেখা। তোমরা এত অল্প বয়সেই এ-সব কেন লিখতে যাও।'

গল্পটা যখন ওঁর পছন্দ হয় নি তখন আর বৃথা বাক্যব্যয় করে কি লাভ। আমি তাই বললাম—'তাহলে গল্পটা নিয়েই যাই।'

বাধা দিয়ে বললেন—'নিয়ে যেতে কে তোমায় বলছে। লেখাটা তো খারাপ নয়, একটু বদলে দিলেই গল্পের দোষটা কেটে যাবে।'

—'গল্পের দোষটা কোথায় সেটা যদি আমাকে বুঝিয়ে দেন—'

—'দোষ ওই একটি জায়গায়। বাড়ির বউকে কুলত্যাগিণী করে বেশ্যাপল্লীতে আনা চলবে না। ওকে কোন দূর সম্পর্কের মাসীর বাড়ি পাঠিয়ে দাও, সেখানে বছরখানেক থাকুক। এদিকে অত্যধিক মদ্যপান করে স্বামী লিভারের রোগে শয্যাশায়ী। খবর পেয়ে স্ত্রীর প্রত্যাবর্তন এবং অমানুষিক সেবা করে স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলা। শেষে স্বামীর ভুল বুঝে অনুশোচনা, মিলন।'

আমি বললাম—'এ তো মামুলী গল্প।'

—'মামুলী হতে পারে তবু নীতি-বিরোধী নয়।'

—'আপনার ফরমুলা অনুসারে গল্প বদলাতে গেলে আমার গল্পর মূল বক্তব্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাছাড়া গল্পের চরিত্র একরকম ভেবে খাড়া করেছি তাকে এখন এক কথায় উল্টে দিই কি করে। আর তা করতে গেলে চরিত্রগুলিকে আবার নূতন করে ঢেলে সাজতে হয়, সে তো পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার।'

—'কেন? এতে পরিশ্রমের কি আছে। সহজ ব্যাপার। কলম যখন তোমার হাতে তখন সেই কলমের খোঁচায় কুলটাকে কুলবধূ করতে কতক্ষণ।'

গাল্পিক-সাহিত্যিক আবার থামলেন। পকেট থেকে কৌটো বার করে আরেক টিপ নস্যি নিয়ে চুপ করে করে বসে রইলেন। আমাদের মধ্যে থেকে একজন কেউ প্রশ্ন না করলে আর মুখ খুলবেন না। অগত্যা আমাকেই প্রশ্ন করতে হল।

—'গল্পটা কি শেষ পর্যন্ত সম্পাদকের কথামতই বদলে দিয়েছিলেন?'

গাল্পিক-সাহিত্যিক নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—'না। সে-গল্প আর বদলানও হয় নি, কোন পত্রিকাতেই আর ছাপা হয় নি। তবে গল্পটা হারায় নি, মাথার মধ্যে আজও রয়েছে। গল্পের প্লটটা নিয়ে এক বিরাট উপন্যাসের পরিকল্পনা ফেঁদে বসেছি, এখন লিখে ফেলতে পারলেই হয়।'

বিশুদা বললেন—'গল্পটা কি তাহলে গল্পলহরী সম্পাদকের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে চলে এলেন?'

—'তাছাড়া আর উপায় কি। সাহিত্য সম্বন্ধে ওঁর রক্ষণশীল ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার আসমান জমিন ফারাক। এক্ষেত্রে তর্ক করার কোনই অর্থ হয় না। তাই ওঁর কথার প্রতিবাদ না করে পাণ্ডুলিপি বগলদাবা করে সেই যে চলে এসেছি আর ও-মুখো যাই নি, গল্পও আর পাঠাই নি। নকল শরৎচন্দ্রর সঙ্গে সেই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ।'

সব্যসাচী লেখক বললেন—'সম্পাদক মশাই তো ভাল কথাই বলেছিলেন। কলম যখন আপনার তখন কলমের এক খোঁচায় গল্প পালটে দিলেই তো হত।'

—'যা হয় নি তা নিয়ে আর আফসোস করে লাভ নেই। তবে কলমের এক খোঁচায় কি হয় আর কি না হয়, তা নিয়ে আসল শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে সেটাই আপনাদের বলি।'

এ-কথা বলেই গাল্পিক-সাহিত্যিক পকেট থেকে আবার নস্যির কৌটো বার করলেন।

একটা রসাল গল্প, তাও আবার আসল শরৎচন্দ্রকে নিয়ে। বৈঠকের বিশুদাকে আর পায় কে। হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল—'চা কোথায়, সিগ্রেট আসুক, পান চাই' ইত্যাদি।

নস্যির কৌটোর ঢাকনাটায় টকাস টকাস করে আঙুলের টোকা মারতে

মারতে গাল্পিক সাহিত্যিক ফরমাশ করলেন—'নস্যি ফুরিয়ে গেছে। দু-পয়সার 'র' নস্যি আনিয়ে দিন তো।'

ছোকরা অমরের তৎপরতায় একে-একে সবই ঝটপট এসে গেল।

মোড়ক থেকে 'র' নস্যি কৌটোয় ভরবার সময় গাল্পিক-সাহিত্যিক বললেন —'দোকানের খুচরো নস্যি নেওয়া বিপজ্জনক। Saw dust আর লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে দেয়।'

আমি বললাম—'তাহলে আনালেন কেন?'

—'ওটা অভ্যেস। পকেটে নস্যির কৌটা না থাকলে আর তাতে নস্যি ভরা না থাকলে সে যে কী মানসিক যন্ত্রণা আপনারা বুঝবেন না। কোন কাজেই মন বসে না। নস্যি নেওয়াটা বড় কথা নয়। নস্যি-ভর্তি কৌটোটা হাতে থাকা চাই।' বাঁ হাতের তালুতে কৌটোটা মুঠো করে ধরে গাল্পিক সাহিত্যিক আসল শরৎচন্দ্রকে নিয়ে আরেকটি কাহিনীর অবতারণা করলেন।

শরৎবাবুর তখন খুব নাম-ডাক। ওঁর বইয়ের পাঠক-সংখ্যা অগণিত এবং লেখক সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহলের শেষ নেই। গ্রাম ছেড়ে কলকাতা শহরে অশ্বিনী দত্ত রোড-এ দোতলা বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন, টাকাও করছেন প্রচুর। বছর না ঘুরতেই বইয়ের নতুন সংস্করণ বেরোচ্ছে, ওদিকে ওঁর গল্প-উপন্যাস নিয়ে তখন থিয়েটারে আর সিনেমায় চলছে কাড়াকাড়ি। ওদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া হয়েছে ডি-লিট্ উপাধি, এদিকে কলকাতায় বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন।

শৈশবে শরৎবাবু যখন ভাগলপুরে থাকতেন তখন ওঁর বন্ধুরা মিলে একটি ক্লাব করেছিলেন, তার নাম ছিল আদমপুর ক্লাব। শরৎচন্দ্র ছিলেন এই ক্লাবের একজন হোল্-টাইম সদস্য। থিয়েটার, খেলাধূলা, গানবাজনা, চড়ুইভাতি এইসব কাজে শরৎবাবু ছিলেন পাণ্ডা আর তাঁর সমবয়সী বন্ধুরা ছিলেন যোগানদার।

শরৎচন্দ্রের এই খ্যাতি ও প্রতিভা যখন সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত তখনও আদমপুর ক্লাবের বাল্যবন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন, যথা বিজয় বাঁড়ুজ্যে, সতীশ বসু, সুকুমার মিত্র, রাজেন মজুমদার, রাজেন গাছি জীবিত। আজ তাঁরাও বৃদ্ধ হয়েছেন কিন্তু তাঁদের শৈশবের বন্ধু শরৎচন্দ্রের এই খ্যাতিতে যুগপৎ গর্বিত ও বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। বন্ধুর গৌরবে গর্বিত হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু

বিস্মিত হয়েছিলেন এই কারণে যে, তাঁদের আদমপুর ক্লাবের সেই বাউণ্ডুলে ডানপিটে ল্যাড়ার আজ দেশজোড়া নাম, বাংলা সাহিত্যে সে আজ একজন কেউ-কেটা। শৈশবে শরৎবাবুর মাথায় একরাশ চুল থাকা সত্ত্বেও ওঁর ডাক নাম ছিল ন্যাড়া, আদমপুর ক্লাবের বন্ধুরা ওঁকে ল্যাড়া বলেই ডাকতেন। শরৎবাবুর তাতে কোন আক্ষেপ ছিল না। এমন একটা কুৎসিত নামকে মর্যাদা দিলেন তার ইংরেজী রূপান্তরে। সেই সময় ওঁর বই ও খাতাপত্তরে সব সময়ে উনি ইংরেজী স্বাক্ষর দিতেন St. C. Lara। যেন বেলজিয়ম বা হল্যাণ্ডের একজন পাদ্রী। ক্লাবের বন্ধুদের মধ্যে যখনই দুঃসাহসিক সুকর্ম অথবা কুকর্মের কোন প্ল্যান হত তখনই শরৎচন্দ্রকে এগিয়ে দিয়ে সবাই বলত—'ল্যাড়া, তুই তো বাবা পাদ্রী আছিস্, লেগে যা।' 'খলিফা' অর্থে 'পাদ্রী' কথাটার ব্যবহার আদমপুর ক্লাবেই শুরু হয়, পরে শরৎবাবুই কথাটা কলকাতায় চালু করেছিলেন।

আদমপুর ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা জীবিত তাঁদের কয়েকজন ভাগলপুরে একজোট হয়ে স্থির করলেন কলকাতায় গিয়ে একবার তাদের বাল্যবন্ধু ল্যাড়ার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। যদিও আজ সে মস্ত নামী লোক তবু ছেলেবেলাকার বন্ধু যখন অনাদর করবে না।

আদমপুর ক্লাবের সভ্যরা আজ বৃদ্ধ হলে কি হবে। মাথায় যখন প্ল্যান এসেছে কার্যে পরিণত করা চাই। ক্লাবের তিনজন সভ্য পরামর্শ করে ভাগলপুর থেকে এক রবিবার সকালে সোজা চলে এলেন কলকাতায় শরৎবাবুর বালীগঞ্জের বাড়িতে।

ছেলেবেলার বন্ধুদের পেয়ে শরৎবাবু বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সারা সকাল ধরে গল্প আর গল্প, ছেলেবেলার দিনগুলির কথা যেন আর ফুরোতে চায় না। অতবড় সাহিত্যিকের কাছে যখন এসেছেন তখন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা তো হবেই। বাল্যবন্ধুদের মধ্যে একজন বললেন—'ত্যাখ ল্যাড়া, তুই তো অনেক লিখেছিস, আর তোর গল্প-উপন্যাস বেরলেই আমরা পড়ি। তোর গোড়ার দিকের লেখা শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব যত ভাল এবং রিয়ালিস্টিক, তোর এখনকার বইগুলো সে-তুলনায় বড় বেশী আন-রিয়াল মনে হয়।'

শরৎবাবু বললেন—'তা মনে হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব তো তোদের কীর্তি-কাহিনী নিয়েই লেখা, ও কি আনরিয়াল হতে পারে?'

আজকাল গল্প-উপন্যাস কে কিরকম লিখছে সে-প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হতেই বাল্যবন্ধুদের মধ্যে একজন বললে—'জানিস ল্যাড়া, সেদিন একজন নতুন

লেখকের লেখা একটা গল্প পড়লাম—ওয়াণ্ডারফুল। যেমন গল্পের প্লট, তেমনি কনক্লুশন। আর স্টাইল যেন হীরকদ্যুতি। আজকাল সমাজ নিয়ে প্রোগ্রেসিভ গল্প লেখার একটা ফ্যাশান হয়েছে, এ সে-জাতের লেখা নয়। যেমন হাই-সিরিয়াস, তেমনি হাই-থিংকিং। তাছাড়া লেখক গল্পের মধ্যে এমন একটা মর‍্যাল তুলে ধরেছেন যা আজকের দিনের ভেঙ্গে-পড়া সমাজে শিক্ষণীয় বস্তু।'

শরৎবাবুর কৌতূহল জেগে উঠল। কি এমন গল্প যে তার এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা! বললেন—'গল্পটা একবার মুখে-মুখে বল্ তো, শুনি।'

উৎসাহের সঙ্গে বাল্যবন্ধু সমস্ত গল্পটা শরৎবাবুকে বলতে শুরু করলেন—

পূর্ববঙ্গের সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। গ্রামের জমিদার কৃষ্ণনয়ন রায়চৌধুরী বিত্তশালী কিন্তু সাত্ত্বিক লোক। প্রজাদের সঙ্গে চিরকালই তিনি সৌহার্দ্যের সম্পর্ক রেখে এসেছেন। তার একমাত্র পুত্র কমলনয়নকে গ্রামের ইস্কুলেই ভর্তি করে দিয়েছেন যাতে প্রজাদের ছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে বড় হয়ে ওঠে, সহপাঠীদের প্রতি মায়া মমতা বন্ধুত্ব কৈশোরকাল থেকেই দেখা দেয়।

স্কুলের সহপাঠী বিষ্ণুচরণ দাস চাষার ছেলে, যেমন ডানপিঠে তেমনি ফুর্তিবাজ। কমলনয়নের সঙ্গে বিষ্ণুচরণের খুব ভাব, একেবারে হরিহর আত্মা। স্কুলের বেঞ্চিতে সব-সময় পাশাপাশি বসে, মাঠে গিয়ে একসঙ্গে ঘুড়ি ওড়ায়, পুকুরে একসঙ্গে ছিপ ফেলে মাছ ধরে, পূজোর সময় যাত্রার আসরে একসঙ্গে বসে রাত জাগে।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা একসঙ্গে পাশ করার পর কমলনয়নকে চলে যেতে হল কলকাতায় কলেজে পড়বার জন্য, বিষ্ণুচরণ থেকে গেল গ্রামেই। চাষীর বংশের ছেলে, বি-এ এম-এ পাস করলে চলবে কেন। বৃদ্ধ বাপ ক-দিনই বা আর আছেন, এখন থেকেই জোত জমি চাষবাসের কাজ বুঝে নিতে হবে। কমলনয়ন যেদিন কলকাতায় চলে গেল—তিন মাইল হেঁটে স্টিমার-ঘাটায় এসেছিল বিষ্ণুচরণ বন্ধুকে বিদায় দেবার জন্যে। দুজনেরই চোখে জল।

মহানগরীতে এসে কমলনয়ন যেন মহাসমুদ্রে পড়ল। কলেজের পড়াশোনায় ডুবে রইল, অবসর সময় মেতে রইল খেলাধুলা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। কমলনয়নের পিতৃ-বিয়োগের পর সে জমিদারীর কাজকর্মের ভার সরকার মহাশয়ের হাতে তুলে দিয়ে বালীগঞ্জে দোতলা বাড়ি করে কলকাতাতেই থাকে। এম-এ পাস

করে বাড়িতে বসেই সে গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকে, ওদিকে নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন নিয়ে অবসর সময় কাটায়। অকৃতদার হলেও কমলনয়ন উচ্ছৃঙ্খল নয়।

একদিন সকালে একতলার লাইব্রেরী ঘরে বসে একরাশ বই নিয়ে কমলনয়ন নোট নিতে ব্যস্ত, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার নৌ-বাণিজ্য নিয়ে তাকে একটা থীসিস্ তৈরী করতে হচ্ছে। এমন সময় চাকর এসে বললে, দেশ থেকে একজন দেখা করতে এসেছে। লাইব্রেরী ঘরেই ডেকে পাঠালেন তাকে।

বলিষ্ঠ চেহারার একটি যুবক এসে ঘরে প্রবেশ করতেই কমলনয়ন বই পত্র ফেলে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—'আরে, বিষ্ণুচরণ, তুমি? এস এস, কতকাল বাদে তোমার সঙ্গে দেখা।' বলতে বলতে এগিয়ে এসে দুই হাত প্রসারিত করে তার বাল্যবন্ধু বিষ্ণুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বিষ্ণু বললে—'তুমি তো আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছ। ভয় ছিল গ্রামকেই যে ভুলে গেছে, আমাকে কি সে আর মনে রাখবে?'

কমলনয়ন বললে—'গ্রামকে ভুললেও তোমাকে কোনদিনও ভুলব না ভাই। শৈশবস্মৃতি কি কেউ কখনও ভুলতে পারে? কিন্তু কোথায় উঠেছ? কি মনে করে কলকাতায় এলে?'

বিষ্ণু বললে—'কোথাও এখনও উঠি নি, সোজা শিয়ালদা থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি। এখন বেশ কিছুকাল কলকাতাতেই আমাকে থাকতে হবে।'

খুশী হয়ে কমলনয়ন বললেন—'খুবই আনন্দের কথা। ভালই হল। এতবড় বাড়িতে আমি একা থাকি, আজ থেকে তুমিও থাকবে। কই, তোমার জিনিসপত্র কোথায়? চল চল ওপরে চল।'

কিন্তু-কিন্তু করে বিষ্ণুচরণ বললে—'আমার সঙ্গে আমার ইয়ে-ও এসেছেন—'

ব্যস্ত হয়ে কমলনয়ন বললেন—'বউকে নিয়ে এসেছ বুঝি। কোথায়, কোথায় তিনি, বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ?'

'না, ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছি। তোমার দেখা পাব কি পাব না আগে তো বুঝতে পারি নি।'

ধমকের সুরে কমলনয়ন বললেন—'আমার কাছে তোমার সংকোচ কি

হে, তা ছাড়া তোমার আক্কেলটাই বা কি রকম। বউকে গাড়িতে বসিয়ে রেখেছ? যাও যাও, তাঁকে ডেকে নিয়ে এস। হরিচরণ, এই হরিচরণ, শিগ্গির গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামা।'

হইচই বাধিয়ে দিলেন কমলনয়ন। হাঁক-ডাকে বাড়িময় চাকরবাকরদের ছুটোছুটি পড়ে গেল। চিবুক পর্যন্ত অবগুণ্ঠনাবৃতা একটি স্বাস্থ্যবতী তরুণী বিষ্ণুচরণের পিছনে পিছনে গাড়ি থেকে নেমে আসতেই কমলনয়ন বললেন—'নমস্কার বউঠান। হতভাগা বিষ্ণুটা বিয়ে করল, অথচ আমাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালোও না। এবার তার শোধ তুলব আপনার হাতের শাক-চচ্চড়ি খেয়ে। কতকাল যে দেশের রান্না খাই নি।'

বিষ্ণুর দিকে আড় চোখে চেয়ে ফিসফিস করে বললেন—'খাসা বউ হয়েছে ভাই। তুমি ভাগ্যবান।' তার পরেই কমলনয়ন বিষ্ণুর হাত ধরে একতলার লাইব্রেরী ঘরটার পাশে যে দুটো ঘর খালি ছিল সে ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন—'এ দুটো ঘর সব সময় খালিই পড়ে থাকে। এখন থেকে স্বচ্ছন্দে তোমার বউ নিয়ে তুমি থাক, আমি খুব খুশী হব।'

বিকেলে গাড়ি করে বিষ্ণুচরণকে নিয়ে নিউ মার্কেট থেকে জানলা-দরজার দামী পর্দা কিনলেন, তাছাড়া ঘর সাজানোর টুকিটাকি আরও অনেক কিছু গাড়ি বোঝাই করে কিনে এনে বিষ্ণুচরণের বউয়ের কাছে দিয়ে বললেন—'বউঠান, আপনার মনের মত করে ঘর-দোর সাজিয়ে নিন। যখন যা-কিছু প্রয়োজন আমাকে জানাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করবেন না।'

বিষ্ণুচরণ বললেন—'দেখ কমলনয়ন, তোমার বউঠানের ইচ্ছে আমাদের দুজনের রান্নাবান্নাটা উনি নিজেই করে নেন। তুমি আমাদের থাকবার জায়গা দিয়েছ, এতেই আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এর পরে আর তোমার উপর বোঝা চাপাতে চাই নে।'

ক্ষুণ্ণ হয়েই কমলনয়ন বললেন—'আমি তোমার বাল্যবন্ধু। আমাকে তুমি পর মনে করছ কেন ভাই। আমার এখানে ডাল-ভাত যা হয় সবাই সমান ভাগ করে খাব। তাছাড়া বউঠানও মাঝে মাঝে রান্না করে আমাদের খাওয়াবেন বই কি। আমার এখানে বামুন ঠাকুর রান্না করে, মুসলমান বাবুর্চি নয়। সুতরাং জাত যাবার ভয় নেই।'

বিষ্ণুচরণ লজ্জায় পড়ে বললে—'ওসব ভেবে তোমাকে ও কথা বলি নি। যাক্, তুমি যখন ক্ষুণ্ণ হচ্ছ তখন তোমার কথায় আর আমরা আপত্তি করব না।'

আনন্দেই দিন কাটতে লাগল। কমলনয়ন রোজই ওদের নিয়ে বেরোয়। বায়োস্কোপ, থিয়েটার, গানের জলসা, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি রোজই একটা না একটা প্রোগ্রাম আছেই। কমলনয়নের নিঃসঙ্গ জীবন ওদের পেয়ে খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠল।

মাস তিনেক কেটে যাবার পর দেশ থেকে সরকার মশাই এসেছেন কমলনয়নের কাছে জমিদারী সংক্রান্ত কাজে পরামর্শ করতে। কলকাতার বাড়িতে এসে হঠাৎ বিষ্ণুচরণকে দেখে সরকার মশাই চমকে উঠলেন। কিছু না বলে সোজা দোতালায় চলে গেলেন কমলনয়নের কাছে। এক ঘণ্টাও পার হয় নি, হঠাৎ বিষ্ণুচরণ শুনতে পেল ওদের ঘরের বাইরে পরদা-দেওয়া দরজার ওপাশে ভারী জুতোর পায়চারির শব্দ। কমলনয়ন কিছু একটা বলবার জন্যে বোধ হয় বাইরে অপেক্ষা করছে মনে করে বিষ্ণুচরণ বললে—'এস কমলনয়ন, ভিতরে এস, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?'

গম্ভীর গলায় কমলনয়ন বললে—'ভিতরে যাবার আর আমার প্রবৃত্তি নেই। তুমি একবার বাইরে এস, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

বিষ্ণুচরণ তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখে কমলনয়ন স্থির দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। মুখে গাম্ভীর্যের ভাব, চোখে বিরক্তির চিহ্ন।

বিষ্ণুচরণের দিক থেকে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে জলদ্‌গম্ভীর কণ্ঠে কমলনয়ন জিজ্ঞাসা করলেন—'কথাটা কি সত্যি? সরকার মশাই যা বলেছেন ?'

—'সরকার মশাই কি বলেছেন সেটা তো আমার জানা দরকার।'

-'তুমি আমাদের গ্রামের হারাণ ভটচায্যের বিধবা মেয়েকে ভাগিয়ে এনেছ ?'

—'ভাগিয়ে আনি নি, আশ্রয় দিয়েছি।'

—'তোমার মুখে ওসব বড় বড় নাটক নভেলের কথা শুনতে চাই না। যাকে তুমি সঙ্গে করে এনেছ সে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, এটা তো সত্যি।'

—'মন্ত্রপড়া স্ত্রী নয়, সে আমার আশ্রিতা।'

এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে কমলনয়ন বললেন—'চোপরাও বদমাশ। আশ্রিতা নয়, রক্ষিতা। একটা রক্ষিতাকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসে উঠেছ, আগে সে-কথা আমাকে বল নি কেন ?'

—'তোমার সংস্কারে বাধতো বলেই বলি নি।'

রাগে ফেটে পড়লেন কমলনয়ন—'তুমি আমার বাল্যবন্ধু হয়ে আমার সঙ্গে শঠতা করেছ, মিথ্যাচার করেছ, আমার ঐতিহ্য মর্যাদা সংস্কৃতির মূলে আঘাত দিয়েছ, আমার বাড়ি অপবিত্র করেছ। এই মুহূর্তে ওই মেয়েমানুষটাকে নিয়ে তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও, আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।'

কমলনয়ন বিষ্ণুচরণের আর কোন কথা শোনবার অপেক্ষা না করেই দ্রুত হনহন করে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেলেন।

পরদিনই দেখা গেল এক ফার্নিচারওয়ালা একতলার ঘরের সব আসবাবপত্র লরী বোঝাই করে নিয়ে গেল। একদল রাজমিস্ত্রী এসে ঘর দুটোর দেয়াল আর ছাতের সব পলেস্তারা খুলে ফেলে চুন-সুরকি দিয়ে নতুন পলেস্তারা লাগাল। মেজের সিমেণ্ট খুঁড়ে ফেলে নতুন সিমেণ্ট এনে আবার মেজে তৈরি হল। কলকাতার সেরা কীর্তনের দল এনে অষ্টপ্রহরব্যাপী নাম-কীর্তনের ব্যবস্থা হল—অপবিত্র ঘর দুটো পবিত্র করে কমলনয়ন নিশ্চিন্ত হলেন।

শরৎবাবুর বাল্যবন্ধু গল্পটা এইখানেই শেষ করে সপ্রশংস দৃষ্টিতে শরৎবাবুর দিকে তাকালেন। শরৎবাবু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নীরবে গল্পটি শুনছিলেন, শোনা শেষ হলেও কোন মন্তব্য করলেন না, চুপ করে বসে আলবোলায় তামাক টানতে লাগলেন।

বন্ধু ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—'কিরে ল্যাড়া, কী রকম মনে হল?'

এবার শরৎবাবু মুখ খুললেন। বললেন—'ভালই তো মনে হল। তবে গল্পের শেষটা আমি হলে অন্যরকম করতাম।'

কৌতূহলের সঙ্গে বাল্যবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন—'কি করতিস শুনি?'

গম্ভীরভাবে শরৎবাবু বললেন—'আমি হলে পলেস্তারা বদলানো নয়, সমস্ত বাড়িটা রাতারাতি ভেঙ্গে ধুলিসাৎ করে দিতাম। শুধু তাই নয়, বহু কুলিমজুর লাগিয়ে বাড়িটার ভিত খুঁড়ে জমির মাটি কেটে একটা মস্ত পুকুর তৈরি করে শ্বেত পাথরের ঘাটলা বাঁধিয়ে দিতাম এবং সেই ঘাটের প্রত্যেক সিঁড়িতে লাল পাথরে লিখিয়ে দিতাম সতীলক্ষ্মীর ঘাট। পাড়ার কুললক্ষ্মীরা সেই ঘাটে স্নান করে পুণ্য অর্জন করত।'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে শরৎবাবুর দিকে তাকিয়ে বাল্যবন্ধু বললে—'অতবড় দোতলা বাড়িটাকে ভেঙ্গেচুরে পুকুর বানিয়ে ফেলতিস? সে কি কখনও হয়?'

শরৎবাবু বললেন—'কেন হবে না বল। আরে, ওই বাড়িও তোর আমার

নয়, জমিও তোর আমার নয়। হাতে যখন কলম আছে তখন সেই কলমের এক খোঁচায় বাড়ি ভাঙতে কতক্ষণ আর পুকুর কেটে ঘাট বাঁধাতে কতক্ষণ।'

॥ ১৯ ॥

একই নামের দুই লেখক মাঝে-মাঝে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে পাঠকদের কিরকম বিভ্রান্ত করে তোলে তার পরিচয় সকলেরই কিছু-কিছু জানা আছে। বিশেষ করে যিনি অগ্রজ-সাহিত্যিক, বয়সের হিসাবে নয়, সাহিত্যরচনায় যিনি আগে আবির্ভূত হয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছেন, তাঁর দুর্ভাগ্যটা একবার অনুমান করে দেখুন। তাঁর উপন্যাসের যখন বাজারে প্রচুর কাটতি তখন সেই একই নামে আরেক নকল লেখক একখানি উপন্যাস নিয়ে দেখা দিলেন। নকল লেখকের লেখার সুখ্যতি এবং কুখ্যাতি দুই-ই আসল লেখকের উপর গিয়ে বর্তায়। অকারণে অন্যের বোঝা কে বহন করতে চায়। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই হোক বা পুস্তক বিক্রেতাদের দোকানে-দোকানে ঘুরেই হোক নকল লেখকের, স্বরূপ উদ্ঘাটন করবার আগেই নাম-ভক্ত পাঠকদের বোকা বানিয়ে দু-এক এডিশন বই বিক্রি করে কিছু টাকা নিজের ঘরে তুলে, কিছু অপযশ আসল লেখকের ঘাড়ে চাপিয়ে সাহিত্য থেকে চিরকালের মত বিদায় নেন। সাহিত্যে এ ধরনের অসাধুতা মাঝে-মাঝেই ঘটে থাকে এবং এরও পিছনে কোন-কোন পুস্তক প্রকাশকের প্রচ্ছন্ন হাত নিশ্চয় থাকে। তা না হলে জেনে শুনে তাঁরা একই নামের আরেক অখ্যাত লেখকের বই প্রকাশ বা বিক্রি করবেন কেন। এখানেও সেই অসাধু উপায়ে মুনাফা শিকারের লোভ।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আরোগ্য নিকেতন-এর লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়কে বেশ কিছুকাল এক নকল তারাশঙ্করের অবির্ভাবে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর যাবতীয় নূতন বই আর পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণকালে এক দীর্ঘ ভূমিকা জুড়ে দিয়ে দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করতে হল—'শ্রীময়ী'র লেখক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীময় থাকুন, আমি এখন হইতে শ্রীহীন হইলাম।' সেই থেকে অদ্যাবধি তিনি তাঁর নামের আগে 'শ্রী' ব্যবহার করেন না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী বর্জন করে এই সমস্যার একটা সমাধান করেছিলেন বটে কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এত সহজে রেহাই পান নি, তাঁকে দাড়ি বর্জন করতে হয়েছিল। এই ঘটনা নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে, সেইটিই আজ আপনাদের কাছে বলতে বসেছি।

শরৎবাবুর তখন চরিত্রহীন উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। নিন্দা ও প্রশংসায় বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন দেখা দিয়েছে, পাঠকদের মুখে মুখে শরৎবাবুর নাম। এই সময়ে হঠাৎ আরেক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এসে দেখা দিলেন 'গল্পলহরী' নামে ছোট গল্পের এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক রূপে। তখনকার দিনে নবীন লেখকদের 'গল্পলহরী' ছিল আত্মপ্রকাশের একমাত্র পত্রিকা এবং আজকের দিনের একাধিক খ্যাতিমান লেখক সেদিন 'গল্পলহরী'তে ছোটগল্প লিখে হাত পাকিয়েছিলেন। এই সুযোগে আপনাদের কাছে চুপিচুপি একটা কথা কবুল করে নিচ্ছি—'সম্পাদকের বৈঠকে'র লেখকেরও দুর্মতি হয়েছিল। তার কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকালে মফস্বল থেকে একটি ছোটগল্প লিখে 'গল্পলহরী'তে পাঠিয়েছিলেন এবং তা প্রকাশিতও হয়েছিল। সুখের বিষয় সেইটিই প্রথম ও শেষ। 'গল্পলহরী'র তখন মুমূর্ষু অবস্থা, পরের মাস থেকেই পত্রিকা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

গল্পলহরীর সম্পাদক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু পত্রিকা-সম্পাদনা নিয়েই সন্তুষ্ট রইলেন না, উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন এবং পর পর তিনটি উপন্যাস বাজারে ছাড়লেন, 'চাঁদমুখ', 'হীরক ভুল' ও শুভলগ্ন'।

আসল শরৎবাবু প্রথমে ব্যাপারটা কানেই তুললেন না। প্রকাশক হরিদাস চাটুজ্যে এসে একদিন শরৎবাবুকে বললেন—

'ওহে শরৎ, এর একটা কিছু বিহিত কর। তোমার নাম ভাঁড়িয়ে আরেক শরৎ চাটুজ্যে যে বাজারে বই ভালই কাটিয়ে দিল।'

এ-সব নিয়ে ঝঞ্ঝাট করা শরৎবাবুর প্রকৃতিই নয়। উনি শুধু বললেন— 'আমার পাঠকরা ভাল করেই জানে যে, আমার কলম দিয়ে ওরকম ধোয়া তুলসী পাতা উপন্যাস বেরোবে না। ওরা বই পড়ে বুঝে নেবে কে খাঁটি আর কে ভেজাল।'

শরৎবাবুর এ-যুক্তি হরিদাস বাবুর মনঃপুত হল না। উনি পাকা ব্যবসাদার মানুষ। বললেন—

'সেই খাঁটি আর ভেজাল ধরা পড়বার আগেই যে বাজারে দু-তিন হাজার ভেজাল মাল কেটে যাবে। সেটা তো তোমারই লোকসান।'

লাভ কোকসানের কথাটায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে শরৎবাবু বললেন— 'ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামানো আমার কাজ নয়, ওটা আপনাদের কাজ। আপনারাই করুন।'

মাস খানেক যেতে-না-যেতেই শরৎবাবুকে মাথা ঘামাতেই হল। একদিন সকালে 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশ ঘোষাল শরৎচন্দ্রের বাড়িতে ছুটে গিয়ে বললেন—'দাদা আপনি তো এখানে বেশ নির্বিকার চিত্তে বসে আছেন। ওদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল।'

'বাতায়ন' সম্পাদক অবিনাশদার এখানে একটু পরিচয় দিয়ে রাখতে চাই। অবিনাশদা ছিলেন শরৎচন্দ্রের অনুজপ্রতিম স্নেহের পাত্র। শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্রের নিঃসঙ্গ জীবনে অবিনাশদা ছিলেন অন্যতম বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও সখা। একমাত্র অবিনাশদার কাছেই শরৎবাবু নিজের ব্যাক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা অকপটে বলতেন। অবিনাশদার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই অন্তরঙ্গতা অনেকের কাছে ঈর্ষার কারণও হয়েছিল, অনেকে আবার ঠাট্টা বিদ্রূপও করতেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না, পূর্বাহ্নেই আমি তার জন্য অবিনাশদার কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

শরৎচন্দ্রের একটি অত্যন্ত প্রিয় দেশী কুকুর ছিল, তার নাম দিয়েছিলেন 'ভেলি'। বড় আদরের কুকুর। হাওড়ায় শিবপুরের বাড়িতে একা থাকতেন, ভেলি ছিল ওঁর নিত্য সহচর। ভেলির প্রতি শরৎবাবুর এই সন্তানবৎ স্নেহ ও দুর্বলতার কথা কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে অজানা ছিল না। ভেলিকে তাই অনেকেই শরৎবাবুর পোষ্যপুত্র বলে অভিহিত করতেন।

সেই ভেলি কয়েকদিনে অসুখে ভুগেই হঠাৎ মারা গেল। শরৎবাবু সন্তান বিয়োগসদৃশ ব্যাথায় মুহ্যমান। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে অনেকেই এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য শিবপুর গেলেন, অনেকে চিঠি লিখলেন। শুধু আমাদের বিখ্যাত শিবরাম চক্রবর্তী, যাকে শনিবারের চিঠি তাঁরই অস্ত্রে চিরকাল শিবRAM লিখে আঘাত দিয়ে এসেছে, পানোন্মত্ত হয়ে (মাতাল অর্থে নয়, শব্দের 'pun' পেলে যিনি উন্মত্ত হয়ে ওঠেন) দু-লাইনের এক ছড়ায় শরৎচন্দ্রকে এই সান্ত্বনাবাণী পাঠালেন—

ভেলির বিনাশ নাই,
ভেলি 'অবিনাশ'।

সেই অবিনাশ ঘোষাল শরৎবাবুকে বললেন—'দাদা আপনি করছেন কি। আপনার অনুরাগী পাঠকরা আপনার লেখা বই মনে করেই দোকান থেকে 'চাঁদমুখ' কিনে নিয়ে পড়ছে এবং পড়ার পর চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছে—এরই মধ্যে শরৎ চাটুজ্যে একেবারে গেঁজে গিয়েছে। এ-সব কথা শুনতে কি আমাদের ভালো লাগে?'

শরৎবাবু এবার সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। লোকের মুখে-মুখে এরকম যদি একটা কথা রাষ্ট্র হয়ে যায়, সাহিত্যিকের পক্ষে তার চেয়ে বড় ক্ষতি ও অপমান আর কিছু নেই। শরৎবাবু ভাল করেই জানেন যে, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বহু মানবচরিত্র তিনি দেখেছেন। সমাজ নিপীড়িত সেই-সব মানুষের নীরব চোখের জলে যে অভিশাপ এতকাল বর্ষিত হয়ে এসেছে, তার কতটুকুই বা তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, এখনও যে অনেক বাকি রয়েছে বলবার। সুতরাং অবিনাশদার কথাকে সহজে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। বললেন—'তুমিই বল অবিনাশ, এ ক্ষেত্রে আমার কি করণীয়।'

অবিনাশদা গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাই তো, কী করণীয়। কাগজে একটা বিবৃতি দিলে কেমন হয়। তাতেও বিপদ, বিনা খরচায় নকল শরৎ চাটুজ্যের পাবলিসিটি হয়ে যাবে, ফলে ওর বইয়ের বিক্রি যাবে বেড়ে। পাঠকদের কৌতূহলের তো মাথামুণ্ডু নেই, দেখাই যাক নকল শরৎচন্দ্র আসলের উপর টেক্কা মারতে পেরেছে কি না। অতএব কেনো বই।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর অবিনাশদা বললেন—'দাদা, সব চেয়ে ভাল হয় আপনি নিজে একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করে ওঁকে বুঝিয়ে বলুন একটা ছদ্মনাম নিয়ে বই লিখতে।'

চোখ বড় করে শরৎবাবু অবিনাশদার দিকে তাকিয়ে বললেন—'বল কি হে, আমি যাব ওর কাছে? তাহলে তো ও যা চেয়েছিল তাই হবে। যাওয়া মাত্রই উল্লসিত হয়ে বলবে—পথে আসুন। গল্পলহরীতে লেখা দিলেই নাম পালটে ফেলব। আমার উপর ওর রাগ, আমি 'বাতায়ন' পত্রিকায় মাঝে-সাঝে লিখি অথচ ওর কাগজে একেবারেই লিখি না।'

কথাটা শুনে সরলমতি অবিনাশদা অবাক হয়ে গেলেন। এ-ও কি

কখনও সম্ভব? কোন দায়িত্বসম্পন্ন সম্পাদক এমন কাজ করতে পারে? শরৎবাবুর অবিশ্বাস্য কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে অবিনাশদা বললেন—'এ কি বলছেন দাদা। আপনার এই অনুমান ঠিক নয়। আপনি একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন, আপনার কথা উনি ফেলতে পারবেন না।'

এবার শরৎবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—'গ্যাখো অবিনাশ, মানবচরিত্র আমি তোমার চেয়ে কিছু বেশি দেখেছি জেনেছি চিনেছি। ও যা করেছে তা জেনেশুনে ইচ্ছা করেই করেছে, আমাকে জব্দ করবার জন্যই করেছে।'

অবিনাশদা অনুরোধের সুরে বললেন—'তবু আপনার উচিত একবার দেখা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা। কারণ এতে লোকসানটা তো আপনারই হচ্ছে।'

শরৎবাবুর মুখে এবার যেন কৌতুকের হাসি খেলে গেল। শুধু বললেন—'গ্যাখো অবিনাশ, তুমি তো আমাকে দেখা করতে বলছ। তার পরিণামটা একবার ভেবে দেখেছ কি?'

অবিনাশদা সরল মানুষ, তাই বললেন—'তা একটা লেখা যদি চায় তো লিখে দেবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে শরৎবাবু বললেন—'লেখার কথা হচ্ছে না। কথাটা হচ্ছে, 'চাঁদমুখো' শরৎচন্দ্রের কাছে 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের যাওয়া কি সমীচীন হবে?'

অবিনাশদা এবার বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন—'একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতে এলাম, আপনি ঠাট্টা ইয়ার্কি করে হালকা করে ফেলছেন।'

শরৎবাবু বললেন—'আমরা আমাদের জীবনটাকে বড় বেশি সিরিয়াস করে ফেলেছি। একটু হাল্কা না করতে পারলে এ-বোঝা বেশী দিন বইব কি করে।'

আবিনাশদা বললেন—'ও সব তত্ত্বকথা রেখে এখন কাজের কথায় আসুন। আপনি তো যাবেন না বুঝতেই পারছি। আমিই না-হয় আপনার দূত হয়ে যাই। কিন্তু কি বলব?'

—'মধ্যপদলোপী হয়ে যেতে বল।'

—'মধ্যপদলোপী? সে আবার কি?'

—'কেন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যা হয়েছেন। তুমি গিয়ে ওঁকে বল 'চন্দ্র'টা বর্জন করতে। উনি যখন পরে এসেছেন উনি শরৎ চট্টোপাধ্যায় থাকুন। আমি আদি ও অকৃত্রিম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে গেলাম।'

—'আপনার এই প্রস্তাবে কোন কাজ হবে না। নামের এই সামান্য পার্থক্যে দুই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য পাঠকদের কাছে মোটেই প্রকট হবে না।'

—'তাহলে এক কাজ কর। ওকে মারপিটের ভয় দেখাও।'

অবিনাশদা এবার বেশ খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে বললেন—'সে কি দাদা, শেষকালে গুণ্ডা লাগিয়ে মারপিট করবেন নাকি! ফৌজদারী মামলায় পড়ে যাবেন যে।'

শরৎবাবু এবার হেসে ফেললেন। অবিনাশদাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে বললেন—'না হে না, আমি গুণ্ডা লাগাতে যাব কেন? তুমি শুধু ওকে বলবে যে, "চরিত্রহীন' বই বেরোনোর পর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে বাজারে খুব দুর্নাম, লোকে অকথ্য কুকথ্য গালিগালাজ করছে। এতেই শেষ নয়। সিটি কলেজের ছেলেরা মারমুখো হয়ে বলছে যে, সমাজে সাহিত্যের নামে দুর্নীতি প্রচারকারী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে। আসল শরৎচন্দ্রকে তো ওরা হাতের কাছে পাবে না, তার কোন চালচুলো নেই। কখন কোথায় থাকে তার হদিস পাওয়া ভার। নকল শরৎচন্দ্র খাস কলকাতার পুরনো বাসিন্দা, ওকে পেতে কতক্ষণ। পৈত্রিক নামটার চেয়ে পৈত্রিক প্রাণটার দাম অনেক বেশি—এই কথাটাই ওকে ভাল করে বুঝিয়ে বল।'

অবিনাশদা বুঝে গেলেন শরৎবাবুর কাছে এ-বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসাই ভুল হয়েছে। লেখক শরৎচন্দ্র আর ব্যক্তি শরৎচন্দ্র দুই ভিন্ন সত্তার মানুষ। সাহিত্যকর্মে শরৎবাবুর নিষ্ঠা, সততা ও সংগ্রামী-চিত্ত সদাজাগ্রত কিন্তু ব্যক্তিজীবনে মানুষটি মুখচোরা, লাজুক ও নিস্পৃহ ঔদার্যের প্রতীক। অবিনাশদা হাল ছেড়ে দিলেন। নিজেই দেখা করে এ-বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করার সংকল্প নিয়ে শরৎবাবুর কাছ থেকে সেদিন বিদায় নিলেন।

সাতদিন বাদেই অবিনাশদা আবার শরৎবাবুর কাছে এসে হাজির, মুখে হাসি আর ধরে না।

শরৎবাবু বললেন—'কি হে অবিনাশ, খুব যে খুশি-খুশি ভাব। কিছু একটা সুখবর আছে নিশ্চয়।'

অবিনাশদা বললেন—'তা আছে বইকি। 'চাঁদমুখ' শরৎচন্দ্রকে রাজী করিয়েছি।'

—'কি রাজী করালে? নাম পালটে ফেলবে তো?'

—'পৈত্রিক নাম কি কেউ পালটাতে চায়? ও-প্রস্তাবে একেবারেই

রাজী হল না। শেষকালে আপনার পরামর্শটা প্রকারান্তরে বলতেই কাজ হল।'

অবাক হয়ে শরৎবাবু বললেন—'আমি আবার তোমাকে কোন্ পরামর্শ দিলাম।'

—'ওই যে মারপিটের পরামর্শ। কথাটা ওভাবে না বলে একটু ঘুরিয়ে বললাম। 'চরিত্রহীন' বই লেখার পর লেখকের সম্পর্কে চারিদিকে যে দুর্নাম রটছে তাতে কান পাতা যাচ্ছে না এবং 'চাঁদমুখ' 'বিদূষক'-এর মত ভাল-ভাল উপন্যাস লেখা সত্ত্বেও কেন উনি এই দুর্নামের ভাগী হতে যাবেন।'

শরৎবাবু হাসতে হাসতে বললেন—'মোক্ষম দিয়েছ। দুর্নামের ভয় কার বা নেই। যাক্, তা চাঁদমুখ চাটুজ্যে কি বললেন।'

—'বলবেন আবার কি, একেবারে জল। এতক্ষণ যে-প্রস্তাব দিই, এক উত্তর—না, ওসব হবে না। আর কি মেজাজ, যেন উনি বই লেখার আগে আপনি বই লিখে মস্ত অপরাধ করে ফেলেছেন। অবশেষে, যেই দুর্নামের কথাটি বলা অমনি কেঁচোটি হয়ে গেলেন।'

শরৎবাবু এতক্ষণ আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে আপনমনে গড়গড়া টানছিলেন। নলটা মুখ থেকে সরিয়ে কেদারায় টান হয়ে উঠে বসেই বললেন—'প্রস্তাবটা কি দিলে শুনি?'

—'প্রস্তাব আমাকে আর দিতে হয় নি, নিজেই দিলেন। অনুনয়ের সুরে বললেন—পৈত্রিক নামে কয়েকটা উপন্যাস লিখে ফেলেছি, বিক্রিও মন্দ হচ্ছে না। এখন নাম বদলে নতুন বই লিখলে তো আর লোকে ছোঁবেই না। চাঁদমুখ উপন্যাসটাই আমার বেশী বিক্রি হয়েছে। আমি তাই ভাবছি আমার নামের আগে 'চাঁদমুখ' কথাটা বসিয়ে দিলে পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হবে না।'

শরৎবাবু শুনে বললেন—'বাঃ, বেড়ে উপায় বাতলেছেন। তার মানে আমাকেও আমার নামের আগে 'চরিত্রহীন' বসাতে হবে নাকি?'

অবিনাশদা অভয় দিয়ে বললেন—'সে ভয় আপনার নেই। যেই উনি নামের আগে চাঁদমুখ বসাবার প্রস্তাব করলেন সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম—সেটা কি ভাল দেখাবে?' আমার কথাটা শুনেই একটু থমকে থেমে বললেন—'ঠিকই বলেছেন অবিনাশবাবু। এক গাল দাড়িভর্তি এই মুখকে চাঁদমুখ বললে লোকে পরিহাস করবে। তার চেয়ে আমার সদ্য প্রকাশিত বই 'বিদূষক'

নামটা বরঞ্চ দেওয়া যাক। আমার চেহারার সঙ্গে ও-নামটা মানাবে ভালো।
এ-প্রস্তাবটা তারিফ করে আমি বললাম—তা হলে আরেকটা কাজ করুন।
উপন্যাসের টাইটেল পেজ-এর আগে আর্ট পেপারে আপনার একটা ফটো
ছেপে দিন। তাহলে আর কোনও পাঠকের ভুল বোঝার কোন অবকাশ
থাকবে না।'

শরৎবাবু খুশী হয়ে বললেন—'না হে অবিনাশ, যতটা ভাল মানুষ সেজে
থাক ততটা তুমি নও। শয়তানী বুদ্ধিটা তো সময় বিশেষে ঠিক মাথায়
খেলে যায়।'

অবিনাশদা বললেন—'এতকাল আপনার শাগরেদি করছি, একেবারে
কিছুই কি পাই নি মনে করছেন?'

শরৎবাবু গড়গড়ায় নলটা মুখে তুলে নিয়ে বেশ কয়েকটা টান দিলেন,
কল্কের টিকে গনগনে হয়ে উঠল। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—'তাহলে
তোমার কথাটায় রাজী হয়ে গেলেন, কি বল অবিনাশ।'

অবিনাশদা বললেন—'বইয়ের গোড়ায় ফটো ছাপার প্রস্তাবটা ওঁর খুবই
মনঃপূত কিন্তু একটা সর্তে। আপনারও ফটো ছাপতে হবে। ওঁর বক্তব্য
হচ্ছে চাঁদমুখের লেখক শরৎচন্দ্র ও চরিত্রহীনের লেখক শরৎচন্দ্র যে দুই ভিন্ন
ব্যক্তি তা পাঠকদের ভাল করেই জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।'

কথাটা শুনেই শরৎবাবুর মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা খসে পড়ল।
বিস্ফারিত চোখে শরৎবাবু বললেন—'বল কি অবিনাশ! ওঁর কথায় আমার
ফটোগ্রাফ ছাপতে হবে? আর তুমি এ-কথায় সায় দিয়ে এলে?'

অবিনাশদা বললেন—'না, বইয়ে ছাপার কথায় আমি রাজী হই নি।
তবে বলেছি, বাতায়ন পত্রিকায় আর্ট পেপারে আপনার ছবি ছেপে জানিয়ে
দেব যে, আপনি চরিত্রহীন উপন্যাসের লেখক শরৎচন্দ্র।'

কথাটা শুনে শরৎবাবু খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু তার পরেই
অবিনাশদা যে-কথা বললেন তা শুনে শরৎবাবু স্তম্ভিত।

অবিনাশদা বললেন—'আপনার এই ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি বর্জন করতে হবে।'

গুম হয়ে বসে রইলেন শরৎবাবু। চিন্তিত মুখে গড়গড়ার নলটা তুলে নিয়ে
দুটো টান দিলেন, ধোঁয়া বেরলো না। কল্কের আগুন নিবে কখন ছাই হয়ে
গেছে। শরৎবাবু তখন ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি রাখতেন, তার একটা কারণও ছিল।
শরৎবাবু ছিলেন মনেপ্রাণে ফরাসী মেজাজের মানুষ। ওঁর জীবনচর্যায় ফরাসী

বোহেমিয়নিজম্-এর মিল ছিল। ফরাসী লেখক এমিল জোলা ছিলেন ওঁর গুরু। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' যতবার উনি পড়েছেন, ততবারই পড়েছেন জোলার বিখ্যাত উপন্যাস 'মাদাম রাকঁ'। শোনা যায়, এমিল জোলা ওঁর সাহিত্যিক-জীবনে এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, জোলার অনুকরণে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি পর্যন্ত রেখেছিলেন। বহুদিনের সযত্ন সেই শখের দাড়ি আজ বর্জন করতে হবে? শরৎবাবু সেই যে মুখ বুজলেন আর খুললেন না। দূর আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে চুপচাপ বসে রইলেন। কোন প্রতিবাদ যখন নেই তখন অবিনাশদা বুঝে গেলেন যে, এতে ওঁর সম্মতি একেবারে নেই তা নয়। বেদনাসিঞ্চিত নীরবতাই সম্মতি জানাচ্ছে। আর কোন কথার অবতারণা না করেই অবিনাশদা নিঃশব্দে চলে এলেন।

এই ঘটনার মাসখানেক বাদেই চাঁদমুখের লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস প্রকাশিত হল 'কণকাঞ্জলি'। টাইটেল-পেজ-এর সামনে আর্ট পেপারে পূর্ণ পৃষ্ঠা ফটোগ্রাফ ছাপা হয়েছে, তলায় লেখা আছে—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (জুনিয়র)

সেই সপ্তাহেই বাতায়ন পত্রিকায় আর্ট পেপারে শরৎচন্দ্রের ছবি ছাপা হল, তলায় লেখা ছিল 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বলাই বাহুল্য, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি বর্জিত ছবিই ছাপা হয়েছিল।

চাঁদমুখ উপন্যাসের লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম আজ বাংলা সাহিত্য থেকে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ওঁর নাম উচ্চারিত হয় 'গল্পলহরী' পত্রিকার সম্পাদকরূপে, আর একই নামে দুই সাহিত্যিকের প্রসঙ্গ উঠলে। আজকের বৈঠকের আলোচনায় আমাকে যা করতে হল। কিন্তু আমি জানি, চাঁদমুখ উপন্যাস রচয়িতা শরৎচন্দ্র জাত-লেখক ছিলেন। উপন্যাস রচনায় তিনি পাকা হাতের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, পাঠকদের কাছে আজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জুনিয়র) সম্পূর্ণ বিস্মৃত লেখক। কোন দোকানে ওঁর বই পাওয়া যায় না, লাইব্রেরীতেও নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকরা তাদের কোন গ্রন্থের এক কোণায় এতটুকু ঠাঁই ওঁকে দেন নি। জাতীয় গ্রন্থাগারে চাঁদমুখ বইখানি বহুবার ইস্যু হয়েছে দেখা যায়। তার কারণ বইটি বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে,

পাঠকরা আসল শরৎচন্দ্রের বই মনে করেই ইস্যু করান। চাঁদ মুখের লেখকের উপন্যাস রচনার শক্তি ছিল, শক্তির পরিচয়ও দিয়েছিলেন। কিন্তু এক আকাশে দুই চন্দ্র কখনও ওঠে না। চরিত্রহীনের লেখক যখন বাংলা সাহিত্যের আকাশে পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে উদ্ভাসিত, তখন সেই আকাশেরই এক প্রান্তে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়েই চাঁদমুখের লেখক শরৎচন্দ্র ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেলেন। এ ট্র্যাজেডী লেখনীর অক্ষমতার জন্য নয়। এক নামের যশ খ্যাতি ক্ষমতা আরেক নামকে ম্লান নিষ্প্রভ করে দেবার এ-এক নির্মম দৃষ্টান্ত। ট্র্যাজেডী এই খানেই।

২০

শনিবার বিকেলে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছি আড্ডাবাজরা কে-কখন আসবেন তারই অপেক্ষায়। দিল্লি অনেক দূর। সেখান থেকে 'পঞ্চতন্ত্রের' লেখা ঠিক সময়ে হাতে এসে না পৌঁছলেই চিত্তির। চোখে সর্ষে ফুল, এ-সপ্তাহে লেখা বুঝি বাদ গেল। বসে গেলাম চিঠি লিখতে, জোর তাগিদের চিঠি। সৈয়দদার ওই এক দোষ। নিত্যনিয়মিত তাগাদার তাওয়া গরম না রাখলে ওঁর হাতের আঙ্গুল চলে না, কলমের কালি বরফ। অগত্যা চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে বসে গেলাম লিখতে। উপরোধ, অনুরোধ, উষ্মা, অভিমান সব কিছুর মসলা ঢেলে চিঠিটা যখন প্রায় বাগিয়ে এনেছি, এমন সময় গাল্পিক সাহিত্যিকের প্রবেশ।

'সে কি! আর কেউ আসে নি?'

চিঠির প্যাড থেকে মুখ না তুলেই বললাম—

'না আসুক। তাই বলে এক্ষুনি পরচর্চা শুরু করতে পারব না। আগে চিঠিটা শেষ করে নিই।'

টেবিলে কয়েকটা সদ্য প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ছিল। সেগুলি এগিয়ে দিয়ে আবার চিঠির কাগজে মনোনিবেশ করলাম। চিঠিটা প্রায় যখন শেষ করে এনেছি, এমন সময় একটি যুবক খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। অচেনা ব্যক্তিকে অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যুবকের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন—'আপনি কি—ইয়ে—'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম—'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, আমিই ইয়ে। আপনার কিছু বলবার আছে ?'

'না।'

'তাহলে—'

'দেখতে এসেছি।'

'কী দেখতে এসেছেন ?'

'আপনাকে।'

চমকে উঠলাম। আমাকে দেখতে এসেছে! আর কোনও প্রয়োজন নেই শুধু দেখতে আসা। এ-রকম আগন্তুকের সঙ্গে এর আগে কখনও মুখোমুখি হবার সুযোগ আমার হয় নি। দেখে তৃপ্ত হবে এমন কোন রূপ বা গুণ আমার চেহারায় নেই। তবু যুবকটি মুখে একটা পরিতৃপ্তির গদগদ হাসি এনে আমার দিকে এক ভাবে তাকিয়ে আছে, মুখে কোন কথা নেই। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, অপরিসীম অস্বস্তি।

গাল্পিক-সাহিত্যিক এতক্ষণ একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে মগ্ন ছিলেন, যুবকটির দিকে একবার তাকিয়েই বললেন—'আমি একটু ঘুরে আসছি। নস্যি ফুরিয়ে গিয়েছে, কিনতে হবে।'

ছোকরা অমর হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও ওঁর নিজে নস্যি কিনতে যাওয়ার গুরুত্ব বুঝতে বিলম্ব হয় নি। পাছে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন, তাই পলায়ন। একাকী যুবকটি সামনে দাঁড়িয়ে, ঠোঁটের কোণায় সলজ্জ মৃদু হাসি। ওঁর কোন বক্তব্য নেই, সে-তো আগেই জানিয়েছেন। তাই কথা কিছু বলছেন না, শুধু চেয়ে আছেন। যেন আমার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া ওঁর আর কোন কিছু করবার নেই। এমন অসহায় অবস্থায় আর কতক্ষণ থাকা যায়। অগত্যা বসতে বলে প্রশ্ন করলাম—'আপনি কি কলকাতায় থাকেন ?'

'না, আমি থাকি অনেক দূরে, চিরিমিরিতে। ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছি।'

'চিরিমিরি, সে তো মধ্য প্রদেশে। সেখানে কি করা হয় ?'

'রেলওয়েতে চাকরি করি। ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসার অন্যতম উদ্দেশ্য আপনাকে একবার দেখা।'

আবার সেই অস্বস্তিকর উক্তি। কথা অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যে বললাম—

'চিরিমিরিতে শুনেছি অনেক বাঙালী আছে।'

'তা আছে। প্রায় দু'শ ঘর বাঙালী। তারা সবাই আপনাদের পত্রিকা আগ্রহের সঙ্গে পড়েন, আমিও আপনাদের পত্রিকার একজন ভক্ত পাঠক। তাই আপনাকে—'

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম—'শুনেছি চিরিমিরির স্বাস্থ্য ভাল। বিশেষ করে ওখানকার জল অজীর্ণ রোগের পক্ষে খুবই উপকারী। আপনার কি মনে হয়?'

'তা স্বাস্থ্য ওখানে ভালই হয়। আগে ছিলাম বিলাসপুরে। সেখান থেকে বদলি হয়ে চিরিমিরিতে এসেছি আজ মাস দেড়েক হল। আমার নিজেরই স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে।'

ইতিমধ্যে গাল্পিক-সাহিত্যিক নস্যি কিনে এনে স্বস্থানে বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। যুবকটির ওঠার নাম নেই, তাকিয়েই আছে। অপর পক্ষের তরফ থেকে যদি কোন প্রশ্নই না থাকে তখন জলবায়ু আর খাওয়া-দাওয়ার আলোচনা ছাড়া আর কি করা যায়। তাঁর প্রয়োজন যদি ফুরিয়ে থাকে—অর্থাৎ আমাকে দেখার প্রয়োজন—তাহলে এখন বিদায় নেওয়াই উচিত। কিন্তু সে কথা তাঁকে জানাই কি প্রকারে। অগত্যা অসমাপ্ত চিঠির কাগজটা টেনে নিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লাম, যেন কত জরুরী চিঠি এই মুহূর্তে শেষ করে ডাকে না দিলেই নয়। গাল্পিক-সাহিত্যিক ততক্ষণে পত্রিকার পৃষ্ঠায় মুখ ঢেকেছেন।

কোন ফল হল না। যুবকটি যেমন বসেছিল বসেই আছে। মিনিট দুই নীরবতার পর মনে হল এ-কী শাস্তি। আর থাকতে পারলাম না। ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলে সোজাসুজি তাঁকে বললাম—'আপনার যদি সত্যই আমার কাছে কিছুই বলবার না থাকে তা হলে—'

কথাটা শেষ করলাম না, ওটুকু উহ্য রেখে আবার চিঠির কাগজে মনোনিবেশ করলাম। বৃথা চেষ্টা। ব্যঞ্জনায় যে যুবকের কিছুমাত্র বুৎপত্তি নেই তার পরিচয় পেলাম ওর উঠে পড়ার কোন লক্ষণ না দেখে। বাধ্য হয়েই তখন অসমাপ্ত চিঠির প্যাডটা দেরাজের ভিতরে রেখে গাল্পিক সাহিত্যিককে বললাম—

'আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। কেউ যখন আজ আর আসছে না তখন উঠে পড়াই ভাল।'

ছোকরা অমরকে টেবিলের কাগজপত্র তুলে রাখতে বলে কলম পেন্সিল দেরাজে ভরছি, এমন সময়ে যুবকটি একটু ইতস্তত করে বললে—

'আপনি কি চলে যাচ্ছেন ?'

হায়রে ! চেয়ে দেখার সাধ কি এখনও মিটলো না ? আরও কিছুকাল নীরবে বসে থাকতে হবে ? ইলাস্টিক রবারের মত ধৈর্যকে টেনে অনেক লম্বা করা গিয়েছে। এবার ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। কোন রকমে উষ্মা চেপে রেখেই বললাম—

'এখনও যদি আপনার বলবার কথা থাকে বলুন, না থাকলে বিদায় নিতে অনুমতি দিন।'

কথাটা বলার মধ্যে বোধ হয় একটু রূঢ়তাই প্রকাশ হয়ে থাকবে, তার জন্যে মনে মনে অনুশোচনাও যে জাগে নি তা নয়। আমার এক সাংবাদিক গুরু আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, সম্পাদকের দপ্তর সব সময় আগন্তুকের কাছে অবারিত-দ্বার থাকবে। পত্রিকার যে গ্রাহক বা পাঠক সে সব সময়েই মনে করে এ কাগজ তার নিজের। পত্রিকার দপ্তরে অবাধ যাওয়া-আসার অধিকার তার আছেই, যেমন নিজের বাড়িতে থাকে। কোন লেখক বা পাঠক দপ্তরে এলে, যত ব্যস্ততার কাজই হাতে থাকুক না কেন, দুই হাতে তা সরিয়ে রেখে এমন ভাবে অভ্যর্থনা করবে যেন তুমি এতক্ষণ ওঁরই শুভাগমনের প্রতীক্ষায় বসে আছ। এতকাল গুরুর উপদেশ যথাসাধ্য পালন করবার চেষ্টা করে এসেছি, আজই প্রথম ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগলাম। এমন একজন ভক্ত সামনে উপস্থিত, যে সুদূর মধ্য প্রদেশ থেকে এসেছে শুধু আমাকে দেখবার জন্যই, আর কোন প্রত্যাশা তার নেই। এতে পুলকিত হয়ে ওঠবার কথা। আমার মধ্যেও সে-দুর্বলতা নেই তা নয়। তবু শনিবারের আড্ডার প্রাক্‌কালে এমন একজন অপরিচিত ভক্তের আগমনে উল্লসিত হতে পারি নি। সেই কারণেই বোধ হয় আমার কথায় খানিকটা অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠেছিল।

লক্ষ্য করলাম যুবকটির মুখের সেই দরবিগলিত হাসি ক্রমশ মিলিয়ে গিয়ে বিমর্ষ ভাব দেখা দিল। কম্পিত হস্তে শার্টের বুক-পকেট থেকে একটি ভাঁজ করা কাগজ বার করে বললে—

'আপনাকেই দেখতে এসেছিলাম, কিন্তু খালি হাতে আসি কি করে। তাই একটা কবিতা লিখে এনেছি।'

এবার আমার হাসবার পালা। নিঃস্বার্থ ভক্তির এমন পরাকাষ্ঠা এর আগে কখনও দেখি নি। আগন্তুকের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্য যে গ্লানিতে

এতক্ষণ পীড়িত হচ্ছিলাম, এক নিমেষে তা কেটে গেল। উল্লসিত হয়ে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম—'কবিতা এনেছেন তা এতক্ষণ বলেন নি কেন?'

বিনয়ের সঙ্গে যুবকটি বললে—'ওটা তো উপলক্ষ, তাই বার করতে সংকোচ বোধ করছিলাম। কবিতা আমি অনেকদিন থেকেই লিখছি, অনেক কবিতাই লিখেছি। সে-সব খাতা চিরিমিরিতেই রেখে এসেছি। আজ আপনাকে দেখতে আসবার আগে একটা আইডিয়া মাথায় এল, লিখে নিয়ে এলাম।'

আড়চোখে গাল্পিক-সাহিত্যিকের দিকে তাকিয়ে দেখি মুখ সম্পূর্ণ পত্রিকার খোলা পাতায় আবৃত, শুধু ভুঁড়িটা ঈষৎ দুলছে। একটা উদ্গত হাসি চাপবার কী করুণ প্রয়াস। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন বিশুদা। চোখ বড় করে কি একটা বলতে গিয়েই অপরিচিত যুবককে দেখে থেমে গেলেন। হ্যারিসন রোড ও চিৎপুরের মোড়ে ষাঁড়ের লড়াই বা পকেটমারকে নিয়ে মারপিট, এই ধরনের কিছু একটা গল্প রাস্তায় ফেঁদে এসেছিলেন, বলা হল না। খালি-চেয়ারটায় হতাশ হয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। একটু পরেই এলেন সব্যসাচী লেখক, তরুণ কবি, ইনস্যুরেন্স-এর কেষ্টবিষ্টু অফিসার।

ঘর জমজমাট। যুবকটি এত লোকসমাগমে হকচকিয়ে গেল। এতক্ষণে বোধ হয় বুঝতে পারল এবার উঠে পড়তেই হয়। চেয়ার থেকে উঠে নমস্কার জানিয়ে বললে—

'আপনার হাতে দিয়ে গেলাম, দেখবেন।'

আমি বললাম—'সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার হাতে যখন দিয়েছেন, গতি একটা কিছু হবেই।'

আমার কথায় বিশেষ ভরসা পেল না যুবকটি। তাই আবার বললে—'দেখবেন, ফেরত যেন না আসে।'

কথায় কথা বেড়েই চলবে এই আশঙ্কায় খোলাখুলি বললাম—'না, ওকাজ আমরা কখনই করি না, বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে। এটা ধরেই নিই যে কবিতার নকল রেখে সবাই পাঠায়।'

'তা হলে জানব কি করে?'

'তিন মাস অপেক্ষা করবেন। যদি মনোনীত হয়, ওই সময়ের মধ্যে সেই সংবাদবহনকারী চিঠি যাবে আপনার কাছে। আর যদি চিঠি না পান তা হলে—'

—'তা হলে কী।'

—'আবার আরেকটা পাঠাবেন।'

—'ও বুঝেছি। নমস্কার।'

হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যুবকটি। আগমনীর হাসি বিদায়কালে বিষাদে রূপান্তরিত। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। কি করে এই যুবককে বোঝাই যে, প্রতিদিন দপ্তরে কবিতার সংখ্যা আসে সর্বাধিক। সেইজন্যেই নির্বাচনে নির্মম না হয়ে উপায় নেই।

আমাকে দেখতে আসার নাম করে কবিতা দিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি আদ্যোপান্ত রসিয়ে গাল্পিক সাহিত্যিক বৈঠকের বন্ধুদের কাছে বললেন। বিশুদা শুনে বললেন—'কবিতা ছাপাতে হবে, তা ডাকে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়। হাতে-হাতেই যখন দেবার ইচ্ছে তখন ভণিতা না করে সোজাসুজি দিয়ে চলে যাওয়াই তো উচিত। শনিবারের আড্ডাটাই দিলে মাটি করে।'

বৈঠকের তরুণ কবি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। সমমর্মীর প্রতি বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করে বললে—'আপনারা তো কেউ কবিতা লেখেন না, লিখলে বুঝতেন ওর মানসিক অবস্থাটা। নতুন লেখকমাত্রই সম্পাদকের দপ্তরটাকে মনে করে একটা বাঘের খাঁচা। আমার কথাই বলছি। আমি যখন প্রথম কবিতা নিয়ে এই দপ্তরে পদার্পণ করি, তখন হৃৎপিণ্ডটি ধড়াস ধড়াস করেছে, পেটের ভিতর যেন একেবারে ফাঁকা। কবিতাটি হাতে তুলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকতাম ফাঁসির আসামীর মত। বিচারকের রায়ের উপর জীবনমরণ নির্ভর করছে। তখন বাধ্য হয়ে সম্পাদককে ইম্প্রেস করবার জন্য বলতাম—'নরেনদা কি এসেছিলেন? গল্প-লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র যে আমার অগ্রজপ্রতিম এইটুকু জানান দিয়ে সম্পাদকের নেক নজরে পড়ার ক্ষীণ প্রয়াস। অর্থাৎ সম্পাদকের সবিশেষ পরিচিত বন্ধু গল্পলেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রর সঙ্গে আমারও যে দাদা-ভাই সম্পর্ক, সেটুকু জানান দেওয়া!'

বিশুদা বললেন—'সেই জন্যেই চিরিমিরির যুবক-কবি সম্পাদককে ইম্প্রেস করবার চেষ্টায় ঘরে ঢুকে বলেছিল—আপনাকে দেখতেই এসেছি।'

সব্যসাচী লেখক এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। তরুণ কবির দিকে তাকিয়ে টিপ্পনী কাটলেন—'গ্রেট পোয়েটস অ্যাক্ট অ্যালাইক।'

আবার একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয় দেখে তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাবার জন্যে গাল্পিক-সাহিত্যিককে অভিযোগ জানিয়ে বললাম—'আপনার কাণ্ডটাই বা কি

রকম। পত্রিকার পাতায় মুখ আড়াল করে ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসা কি উচিত হচ্ছিল?'

গাল্পিক-সাহিত্যিক বললেন—'চিরিমিরির কবির কথায় হাসি পেলেও চেপে রেখেছিলাম ঠিকই। কিন্তু হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের একটা বিখ্যাত গল্প মনে পড়ায় হাসিটা ছিপিখোলা সোডার বোতলের মত ভুসভুসিয়ে উপরের দিকে ঠেলে উঠতে চাইছিল বলেই এই বিভ্রাট।'

আর পায় কে বিশুদাকে। একটা রসালো গল্পের আভাস পেয়ে হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল—কোথায় চা, কোথায় পান। সঙ্গে সঙ্গে গাল্পিক-সাহিত্যিককে সাবধান করে দিয়ে বললেন—'নস্যি-টস্যি যদি আনাতে হয় এইবেলা আনিয়ে নিন।'

পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করে গাল্পিক-সাহিত্যিক বললেন—'সে ভয় নেই, কৌটা আজ ভর্তি।'

সব্যসাচী লেখক বললেন—'তাহলে এই বেলা নাক ভর্তি নস্যি নিয়ে নিন। পরে গল্প থামিয়ে নস্যি নেওয়া কিন্তু চলবে না।'

নস্যি নেওয়ার পর্ব সমাধা হল, ইতিমধ্যে ছোকরা অমর চা আর পান যার-যার সামনে রেখে ঘরের কোণের ছোট্ট টেবিলে স্তূপীকৃত গল্প কবিতার পাণ্ডুলিপিগুলি উৎকর্ণ হয়ে ফাইল-বন্দী করতে বসে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক মেরে গাল্পিক-সাহিত্যিক বললেন—'ঘটনাটা ঘটেছিল বঙ্গভাষা' ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক দীনেশচন্দ্র সেনকে নিয়ে। দীনেশ বাবু ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে কুমিল্লাতে ভিক্টোরিয়া স্কুলে চাকরি নিয়েছেন, আর শহরে গ্রামে ঘুরে ঘুরে পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য গুলে খেয়েছেন, চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি ওঁর নখাগ্রে। ওদিকে ইংরেজী ক্লাসিক সাহিত্যের দান্তে, হোমর, শেক্সপীয়র-সৃষ্ট চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ লিখে ফেলেছেন খাতার পর খাতা। লিখে তো চলেছেন, এখন সে-লেখা প্রকাশের কি উপায়। দীনেশবাবু ভালো করেই জানতেন তখনকার বাংলা সাহিত্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর ডেপুটি কালেক্টরের রাজত্ব। সেখানে ওঁর মতন সামান্য বেতনের এক ইস্কুল মাস্টারের লেখা প্রবন্ধ কলকাতার নামকরা পত্রিকাগুলি ছাপবে কেন। সুতরাং সাহিত্য করতে গেলে এবং সাহিত্যিক খ্যাতি পেতে হলে পূর্ববঙ্গের মফস্বল শহরে পড়ে থাকলে চলবে না, কলকাতায় গ্যাঁট হয়ে বসা চাই।

মামাতো ভাই মতিলালকে ডেকে বললে—'ছাখ মতিলাল, আমি ভাবছি সামনের গরমের ছুটিতে এক মাসের জন্য কলকাতায় যাব।'

দীনেশবাবুর যে-কোন প্রস্তাবেই মতিলাল উৎসাহিত। নিজে লেখাপড়া খুব বেশি কিছু করে নি বলে দীনেশবাবুর পাণ্ডিত্যের উপর ওর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। দীনেশবাবুর মুখে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকেই বড় বড় কথা শুনে এসেছে; তাই ওর ধারণা—চান্স পেলে ওর ভাই সাহিত্যে মাইকেল-বঙ্কিমকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, পাণ্ডিত্যে বিদ্যাসাগরকেও। মতিলাল উৎসাহিত হয়ে বললে—'কলকাতায় যাবি, খুব ভাল কথা। কিন্তু হঠাৎ কলকাতায় কেন?'

'কলকাতায় না গেলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। এখান থেকে ভাল ভাল লেখা পাঠাই—ফেরত আসে। কলকাতার সম্পাদকরা বাঙালদের উপর বড় চটা। আমলই দিতে চায় না।'

মতিলাল ক্ষেপে গেল। বললে—'কি বললি? চল, আমিও যাব তোর সঙ্গে।'

দুই ভাই মিলে অনেক পরামর্শের পর স্থির হল, প্রথমে দীনেশবাবু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করবেন কলকাতায় একটা চাকরির জন্যে। কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে না বসতে পারলে লেখক হবেন কি করে। এক মাসের ছুটিতে পদ্মাপার হয়ে সম্পাদকদের সঙ্গে দেখা করে চলে এলেই আউট অব্ সাইট, আউট অব্ মাইণ্ড। লেগে থাকতে হবে ছিনে-জোঁকের মত। কুমিল্লায় চাকরি করে তো আর সে সম্ভব নয়।

১৮৯১ সালের কথা। জ্যৈষ্ঠ মাস। দীনেশবাবু মামাতো ভাই মতিলালকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেই এক শনিবার সকালে প্রথমেই গেলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে। বিদ্যাসাগর তখন থাকতেন বাদুড়বাগানে। সে-বাড়ির দোতলার মাঝের একটা ঘরে চারিদিকে বই-ভর্তি আলমারি। তারই মাঝে একটা টেবিল, তার পাশে খানকতক চেয়ার পাতা। বিদ্যাসাগর একটি চেয়ারে বসে মাথা গুঁজে কি কাগজপত্র দেখছিলেন। দীনেশবাবু নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে বিদ্যাসাগরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতেই সন্ত্রস্ত হয়ে পা সরিয়ে নিলেন। মনে হল পা ছুঁয়ে প্রণাম করাটা ওঁর পছন্দ নয়। দীনেশবাবু তখন যুবক, চেহারার মধ্যে একটা ছেলেমানুষি ভাব। দীনেশবাবুর দিকে তাকিয়েই বিদ্যাসাগর বললেন—'কি চাস?'

'আজ্ঞে আপনার পায়ের ধুলো নিতে এসেছিলাম।'

'উহুঁ, বিশ্বাস হল না। মতলব কিছু-একটা আছে, বলেই ফেল্।'

প্রথম সাক্ষাতেই 'তুই' সম্বোধনে দিনেশবাবু পুলকিত হয়ে উঠেছিলেন। অত বড় বিরাট ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ, অথচ কত সহজেই মানুষকে আপনার করে নিতে পারেন। সুতরাং উদ্দেশ্যটা খোলাখুলি বলতে আর সংকোচ রইল না। ইংরেজী অনার্সসহ পাশ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষকতা, কলকাতা আসার উদ্দেশ্য, একে একে সবিস্তারে জানানোর পর বললেন— 'আপনার স্কুলে আমাকে একটা চাকরি দিতেই হবে।'

'বাড়ি কোথায় ?'

'আজ্ঞে, ঢাকা জেলায়।'

'তাই তো, তুই যে ঢাকার বাঙাল তা তো তোর কথার টানেই বুঝতে পেরেছি। এখানকার ছাত্র তোর টিপ্রা জেলার ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্র নয় যে, তুই অনার পাশ, তা-ও ইংরিজীতে, শুনলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে পড়বে।'

'আপনি একবার পড়াবার চান্স দিয়েই দেখুন না স্যার।'

'এখানে বড় বড় ওস্তাদ শিক্ষকেরা ঘায়েল হয়ে যায়, ক্লাস সামলে উঠতে পারে না। তুই একে বাঙাল, তায় চেহারায় ছেলেমানুষ। তোকে তো একদিনে পাগল করে ছাড়বে।'

দীনেশবাবুর তখন গোঁ চেপে গিয়েছে। বললেন—'আমাকে ক্লাস করতে দিয়েই দেখুন না। আর আমিও দেখতে চাই আপনার স্কুলের ছেলেরা বাঙালকে ঘায়েল করতে পারে কি না।'

উত্তর শুনে বিদ্যাসাগর খুশী হয়েই বললেন—'তোর তো বেশ সাহস আছে দেখছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না তুই পারবি। ও বাঙালের কর্ম নয়। যা হোক্, তুই যখন চাচ্ছিস সোমবার দিন বেলা ১১টার সময় মেট্রপলিটান স্কুলে যাস। আমি সেই সময় যাব এবং তোকে ক্লাসে পড়াতে দেব।'

বিদ্যাসাগরের বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়েই মতিলাল দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললে—'অতবড় লোকের সঙ্গে তুই সমানে পাল্লা দিয়ে কথা বলে গেলি, ভয়ে বুক কাঁপছিল না ?'

দীনেশবাবু বললেন—'আরে আমরা হচ্ছি পদ্মাপারের লোক। ও-সব খাল, নদী, সাগর, মহাসাগর দেখে ভয় পেলে চলবে কেন।'

দীনেশবাবুর প্রতি মতিলালের শ্রদ্ধা চড়চড় করে বেশ কয়েক ডিগ্রী বেড়ে গেল।

সোমবার দিন যথাসময়ে দীনেশবাবু মেট্রপলিটান স্কুলে এসে হাজির। মিনিট পনের পরেই উড়িয়াবাহকরা একটি পালকি এনে স্কুলের গেটের সামনে রাখল। পালকির ভিতর থেকে সাদা উড়ানি গায়ে চটি পায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেরিয়ে এলেন। দীনেশবাবুকে দেখেই বললেন—'চল্ তোকে হেড মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই।'

দীনেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে লাইব্রেরী রুমে গিয়েই হেড মাস্টারকে ডেকে পাঠালেন। গলাবন্ধ কোট, কাঁধে পাটকরা চাদর, প্রৌঢ় বয়সী হেড মাস্টার মশাই আসতেই দীনেশবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—'তুমি একে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী পড়াতে দাও।'

হেড মাস্টার মশাই দীনেশবাবুকে সঙ্গে করে ক্লাস রুমের দিকে নিয়ে যাবার সময় বললেন—'আপনি দেখছি নিতান্তই ছেলেমানুষ। তা কোন সাবজেক্ট পড়াবেন?'

দীনেশবাবু বললেন—'ইংরেজী এবং ইতিহাস দুটোই আমি পড়াতে পারব।'

স্কুলে প্রথম শ্রেণীর ছেলেরাই সাধারণত তুখোড় হয়। হেড মাস্টার মশাই প্রথমেই দীনেশবাবুকে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে হাজির করে দিয়ে চলে এলেন। সৌন্দর্য সম্বন্ধে শেলী ও কীটস্-এর তুলনামূলক আলোচনার পরই বৈষ্ণব কবিদের প্রেমতত্ত্বে এসে গেলেন, সঙ্গে ডাইনে-বাঁয়ে ইংরেজী কবিতা ও বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ধৃতি। ছেলেরা গেল হকচকিয়ে। পড়া শেষ করে দীনেশবাবু ছাত্রদের বললেন—'তোমাদের পড়া দেখছি খুব কমই হয়েছে। পরীক্ষা নিকটবর্তী, কি করে সবটা শেষ করবে? যিনি ইংরেজী পড়ান তিনি তো তোমাদের পড়া কিছুই এগিয়ে দেন নি দেখতে পাচ্ছি।'

দীনেশবাবু হয়ত ভেবেছিলেন পূর্ববর্তী মাস্টারের পাঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে অনাস্থা ঢুকিয়ে দিতে পারলে কাজ হাসিল হবে। পড়ানো শেষ করে ক্লাস-রুম থেকে বার হতে গিয়েই দেখেন দরজার পাশে হেড মাস্টার ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে পড়ানো শুনছিলেন এবং উনি জানতেন না যে, ওই শ্রেণীর ছাত্রদের এতদিন ইংরেজী পড়িয়ে এসেছেন হেডমাস্টার স্বয়ং। পরের ঘণ্টায়

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের ইতিহাস পড়ালেন, নির্বিঘ্নে ফাঁড়া কেটে গেল। ভিতরে ভিতরে অনুসন্ধান করে যখন জানতে পারলেন উভয় শ্রেণীর ছাত্ররা ওঁর পড়ানোতে খুশী, নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি গেলেন।

পরের দিন মঙ্গলবার খুব গর্বের সঙ্গে স্কুলে গিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে যেতেই বিদ্যাসাগর টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বার করে দেখালেন, তাতে হেডমাস্টারের মন্তব্য লেখা আছে—'প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা খুশী হয় নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা ভালই বলিয়াছে।'

দীনেশবাবুর মেজাজ সপ্তমে চড়েছে। একে ঢাকার বাঙাল, তার উপরে অল্প বয়েস। রাগলে রক্ষে নেই। বিদ্যাসাগরের মত সম্মানীয় ব্যক্তির সামনেই বিশুদ্ধ ঢাকার ভাষায় হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে যা-ইচ্ছে তাই বলে গেলেন। শেষে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওঁর মন্তব্য চুরি করে শোনার কথাও সবিস্তারে জানিয়ে বললেন—'হ্যাডমাস্টর আমার উপ্‌রে চেইত্যা গিয়া এই রিপুর্ট দিছে।'

বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে বললেন—'তোর ভিতরে দেখছি তেজ আছে। অন্তত একটা ক্লাসের ছাত্রদের যখন খুশী করেছিস তখন তুই পারবি। বাঙাল মাস্টার পেলে তো ছেলেরা তাকে লাড্ডুর মত ব্যবহার করে। যা হোক আমি তোকে যোগ্য বলেই মনে করছি। তবে কি জানিস, তোর আগে পাঁচ ছয় জন যোগ্যতা দেখিয়েছেন, এই দেখ তাদের নাম। এরা কাজ পেলে তারপর তোর পালা। আর দেড় দুই মাস পরে আমি তোকে নিতে পারব। তুই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করিস।'

দীনেশবাবু এ-কথায় খুশী হলেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বললেন—'আমার যে কুমিল্লার স্কুল খুলে যাবে, দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। আপনি আমায় কাজ খালি হলে চিঠি দেবেন।'

বিদ্যাসাগর ঘাড় নেড়ে বললেন—'সে হবে না। তোর এখানেই থাকতে হবে। কাজ খালি হলে চিঠি লিখে আনাবার মত সবুর সইবে না। কে কোথা দিয়ে ঢুকে পড়বে। এখানে চাকরি প্রার্থীর অভাব নেই! কুমিল্লার চাকরি ইস্তফা দিয়ে যদি কলকাতায় থাকতে পারিস তবে কথা দিচ্ছি দুই মাসের মধ্যেই চাকরি পাবি।'

বিদ্যাসাগর যে এক কথার মানুষ দীনেশবাবুর তা জানা ছিল না বলেই তাঁর কথায় আস্থা রাখতে পারলেন না। অনিশ্চয়তার মধ্যে চাকরি ইস্তফা

দেওয়াটা সমীচীন মনে না হওয়ায় তিনি বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন।

কলকাতায় থেকে সাহিত্যিক হবার প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেও নিরুদ্যম হন নি। এবার দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যাক। অর্থাৎ এবার সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। যে-সে সম্পাদক নয়, একেবারে 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র।

'বঙ্গদর্শন' তখন বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকা। বঙ্কিমবাবুর নিজের লেখা উপন্যাস ও প্রবন্ধাদি প্রতি সংখ্যাতেই প্রকাশিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে তখনকার ইংরেজী শিক্ষিত বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিকে তিনি বাংলা ভাষায় প্রবন্ধাদি লেখায় উৎসাহিত করেন। 'বঙ্গদর্শন'কে ঘিরে তখন একটি সাহিত্যগোষ্ঠী আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। বঙ্গদর্শনে তখন একটি লেখা প্রকাশ করতে পারলেই লেখক রাতারাতি সাহিত্যিক-খ্যাতি লাভ করতেন।

মামাতো ভাই মতিলালকে প্রস্তাবটা দিতেই সে লাফিয়ে উঠল। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরকে দেখেছে, এবার দেখবে বিখ্যাত লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। মতিলাল বললে—'তা হলে কাল সকালে চল।'

দীনেশবাবু বললেন—'দাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে চলবে না, তৈরি হয়ে নিই।'

দেখা করতে যাবে তৈরি হবার কী আছে। কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না মতিলাল। দীনেশবাবু বললেন—'সামনের রবিবার যাব। হাতে চারদিন সময় আছে, এর মধ্যে বই যোগাড় করে ভাল করে পড়ে নিতে হবে। ইম্‌প্রেস করতে হবে তো।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যের আলোচনায় একবার ইম্‌প্রেস করতে পারলেই বঙ্গদর্শন পত্রিকার নিয়মিত লেখক হবেন, এই আশায় চারদিন নাওয়া-খাওয়া ভুলে সাহিত্যের মোটা মোটা বই পড়ে ফেললেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সবগুলি উপন্যাসের উপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, ওদিকে হোমর, দান্তে, শেক্সপীয়র, দার্শনিক কোঁৎ আরেকবার ঝালিয়ে নিলেন। কি কি বিষয় নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করবেন, বঙ্কিম রচিত উপন্যাসের কোন্ কোন্ চরিত্রের কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন তার একটা খসড়া মনে মনে প্রস্তুত করে ফেললেন। শুধু তাই নয়। বঙ্কিমবাবুর বিশেষ পরিচিত বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীপ্রসন্ন সরকারের কাছ থেকে একটি পরিচয়-পত্রও জোগাড় করে

ফেললেন। কালীপ্রসন্নবাবু কুমিল্লায় থাকাকালে গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন। সেই অনুবাদের কাজে দীনেশবাবু তাঁকে সাহায্য করেছিলেন—পরিচয়-পত্রে সে কথারও উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ বঙ্কিমবাবুকে ইম্প্রেস করবার তাবৎ অস্ত্র শানিয়ে রবিবার বেলা দুটোয় মতিলালকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্কিম-সঙ্গমে বেরিয়ে পড়লেন।

বঙ্কিমবাবু তখন থাকতেন কলেজ স্ট্রীট পাড়ার প্রতাপ চাটুজ্যের গলিতে। খোঁজ করতে করতে যখন তাঁরা বাড়িটার সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ ভিতর থেকে প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল—

'পাজি হতভাগা গাধা, রোজ দুপুরে কাজ ফাঁকি দিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমনো? ভেবেছিস আমি কিছু টের পাই নে? বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে নচ্ছার কোথাকার—দূর হয়ে যা।'

স্বর সপ্তমে তুলে গালি-গালাজ চলছে এক নাগাড়ে। যার প্রতি গালি বর্ষিত হচ্ছে, সে পক্ষের তরফ থেকে কোন উচ্চবাচ্য নেই।

খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দীনেশবাবু দেখলেন এক নগ্নদেহ গৌরবর্ণ বৃদ্ধ তাঁর সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা চাকরকে অনর্গল বকুনি দিয়ে চলেছেন। দুটি অপরিচিত যুবক দরজায় উঁকি মারছে দেখে বৃদ্ধ একটু অপ্রস্তত হয়ে চাপা গম্ভীর গলায় গৃহভৃত্যকে বললেন—

'আচ্ছা তুই এখন যা।'

ভৃত্য সামনে থেকে চলে যেতেই আগন্তক যুবকদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'আপনারা কাকে চান?'

সপ্রতিভ হয়েই দীনেশবাবু বললেন—'আমরা বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

বৃদ্ধ বললেন—'কোত্থেকে এসেছেন, কি দরকার?'

দীনেশবাবু বললেন—'আমরা কুমিল্লা থেকে এসেছি, বঙ্কিমবাবুর শুধু একবার দর্শন পেতে চাই।'

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ দিকের একটা সিঁড়ি দেখিয়ে বললেন—'ওই সিঁড়ি দিয়ে উপরের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন, তাঁকে খবর দিচ্ছি।'

যাক্, তাহলে বঙ্কিমবাবুর দেখা পাওয়া যাবে। দুজনে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। মাঝারি মাপের ঘর। এক কোণায় একটি টেবিল আর চার পাশে চারটি চেয়ার। ঘরে আসবাবের বাহুল্য নেই, বৈঠকখানা

ঘর বলেই ওঁদের মনে হল। পাশাপাশি দুটি চেয়ার টেনে দুই ভাই অধীর আগ্রহে বসে আছেন বঙ্কিমবাবুর আগমন প্রতীক্ষায়।

দীনেশবাবু ধ্যানস্থ হয়ে মনে মনে ঝালিয়ে নিচ্ছেন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সাহিত্যের কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি আলোচনা পর পর চালাবেন। মতিলাল অবাক হয়ে আসবাবহীন ঘরটার চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে আর ভাবছে—এতবড় নামজাদা লেখক ও সম্পাদক অথচ ঘরে না আছে আসবাবপত্র, না আছে আলমারিভর্তি মোটামোটা সংস্কৃত আর ইংরেজী বই, এমন কি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার নতুন বা পুরোনো কোন সংখ্যাই ঘরের আনাচে-কানাচে কোথাও দেখতে পেল না। বিদ্যাসাগরের ঘরে ঢুকে চারিদিকের পাণ্ডিত্যের পরিবেশ দেখে ও যেমন বিস্মিত হয়েছিল, এখানে তার কোন পরিচয় না পেয়ে দমে গেল।

মিনিট তিন-চার নীরব প্রতীক্ষার পর হঠাৎ চটি জুতোর খসখস আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকিয়েই দীনেশবাবু ও তার মামাতো ভাই মতিলালের চক্ষুস্থির। ইনিই সেই নগ্নদেহ বৃদ্ধ—রুদ্রমূর্তি ধারণ করে যিনি চাকরকে তারস্বরে বকুনি দিচ্ছিলেন। এখন আর নগ্নদেহ নেই, পরনে নতুন পাটভাঙ্গা শান্তিপুরী ধুতি আর গিলে-হাতা কামিজ। বুঝতে অসুবিধে হল না যে, যাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছেন ইনিই সেই স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঘরে ঢুকেই বঙ্কিমবাবু টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বেশ ভব্যসঁব্য হয়ে বসলেন। মুখে প্রশান্ত গাম্ভীর্য, দৃষ্টিতে অতলান্ত সমুদ্রের গভীরতা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দাড়ি-গোঁফ মসৃণভাবে কামানো, মুখের হাঁ একটু বড়, দীর্ঘাকৃতি।

চেয়ারে বসেই হাত বাড়িয়ে কালীপ্রসন্ন সরকারের চিঠি দীনেশবাবুর হাত থেকে নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়েই প্রশ্ন করলেন—'কালীবাবু কি এখনও কুমিল্লাতেই আছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি যে গীতার অনুবাদ করছিলেন—'

কথা শেষ করতে না দিয়েই বঙ্কিমবাবু বললেন—'ওঁর শরীর এখন সুস্থ আছে তো?'

'হ্যাঁ, শরীর ভালই। তবে গীতার ইংরেজী অনুবাদের কাজে আমরা দুজনে যে পরিশ্রম—'

'ওঁর যে মৈমনসিং-এ বদলি হবার কথা ছিল, তা হন নি দেখছি। কুমিল্লা জায়গাটা কেমন?'

'জায়গাটা মফস্বল শহর হিসেবে ভালই।' তাছাড়া এই জেলার অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে, আমি সংগ্রহ করেছি—'

'ওখানকার জলবাতাস কি রকম। শুনছি খুব বৃষ্টি হয়।'

'তা হয়। তবে সেইসব পুঁথিপত্রে প্রাচীন বাংলা কাব্যের যে সম্পদ—'

'আচ্ছা, ওখানকার আবহাওয়া কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল?' বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে নিবদ্ধ।

'বর্ষাকালটাই যা একটু খারাপ। অন্য সময় তো খুবই ভাল। আপনার কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে আপনি কাপালিকের যে চরিত্র এঁকেছেন—'

কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বঙ্কিমবাবু বলে উঠলেন—'ওখানে ধান চালের অবস্থা এখন কি রকম?'

দীনেশবাবু বেশ একটু দমে গেলেও ওঁকে সাহিত্যের আলোচনায়-নামাবার চেষ্টা ছাড়লেন না। বললেন—'ধান চাল ওখানে প্রচুর। আপনি বিষবৃক্ষ উপন্যাসে আমাদের সমাজে নারীর প্রেম সম্পর্কে যে সমস্যা তুলে ধরেছেন তার একটি সুন্দর সমাধান পাই বৈষ্ণব সাহিত্যে। চণ্ডীদাস এক জায়গায় বলেছেন—'

খুব জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় এতক্ষণ জানা হয় নি অবিলম্বে জেনে নেওয়া দরকার—এমনি একটা ব্যস্ততা চোখে মুখে এনে দীনেশবাবুর কথা থামিয়ে বলে উঠলেন—'দর কত বললেন না তো।'

বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়ে দীনেশবাবু বললেন—'কিসের দর?'

'কেন, ওই ধানচালের?'

এবার দীনেশবাবু সত্যি সত্যিই একেবারে কুঁকড়ে গেলেন। যতবার উনি সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করতে চেষ্টা করেন, ততবারই বঙ্কিমবাবু সে-কথা এড়িয়ে গিয়ে শুধু ধানচাল, লোকসংখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে যে সব লাইন আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি দিয়ে ইম্প্রেস করবেন বলে কণ্ঠস্থ করে এসেছিলেন সেগুলি একে একে মনে পড়তে লাগল। —'ধীরে, রজনী ধীরে, অন্ধ অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ, বিকলা অথচ শীর্ণা, দূরাগত রাগিণীর ন্যায়, অর্ধবিকশিত কুসুম সুরভির ন্যায় রজনী ধীরে ধীরে জলে নামিতেছে।' আবার মনে পড়ল সেই বিখ্যাত উক্তি—'শোনো ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।' কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে কাপালিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—'অগ্নিদেব যাহার পা দুখানিকে

কাষ্ঠভ্রমে চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছেন।' আবার মনে পড়ল—*নির্জন সমুদ্রতীরে* কপালকুণ্ডলার বীণাকণ্ঠ ধ্বনি—'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?'

শুধু কি তাই ? গয়টের ফাউস্ট আর শিলারের এপিসাইকিডন থেকে যে-সব কবিতার অনর্গল উদ্ধৃতি দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিজের বিক্রম দেখাবেন বলে গত চারদিন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে এত পরিশ্রম করলেন, সে সবই কি ব্যর্থ হবে ? হতাশায় ক্ষোভে দুঃখে দীনেশবাবুর চোখ ছলছল করে উঠল। মুখে একটা বজ্রকঠিন গাম্ভীর্য এনে বঙ্কিমবাবু তখনও জানালার বাইরে নিম গাছটার কচি পাতার দিকে চেয়ে আছেন।

শেষ চেষ্টার সঙ্কল্প নিয়ে দীনেশবাবু প্রশ্ন করলেন—'চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাসের মধ্যে আপনি কাকে গীতি-কবিতার শ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করেন ?'

বঙ্কিমবাবু জানালার বাইরে দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখেই বললেন—'দুধ ?'

দীনেশবাবু এবার হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। গীতি-কবিতার সঙ্গে দুধের কি সম্পর্ক।

প্রশ্নটা ধরতে পারছেন না মনে করেই বঙ্কিমবাবু খোলসা করে বললেন—'ওখানকার দুধের দর এখন কত তা তো বললেন না।'

বাঙালের রাগ কতক্ষণ আর দমিয়ে রাখা যায়। ফোঁস করে উঠলেন দীনেশবাবু। বললেন—'দেখুন, আপনি বোধ হয় আমার পদ্মাপারের কথার টানে এবং চেহারা দেখে মনে করেছেন আমি একটি কৃষক যুবক; সুতরাং লাঙ্গল গরু চাষাবাদ ছাড়া আর কোন বিষয়ে আলোচনার আমি যোগ্য নই। আপনার ধারণা ভুল।'

গম্ভীর হয়ে বঙ্কিমবাবু বললেন—'আমার ধারণার কথা ছেড়ে দিন। আপনার ধারণা যাতে ভুল না হয় সেইজন্য আমি সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় পারতপক্ষে নাবি নি।'

অবাক হয়ে দীনেশবাবু বললেন—'তার মানে ?'

'মানে অতি সরল। বাইরে থেকে আপনাদের ধারণা আমি একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। ধারণাটা যাতে মিথ্যে না হয় সেইজন্যই পণ্ডিতি আলোচনায় মুখ খুলি না। তাছাড়া আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে দেখবার, আমার সঙ্গে বসে সাহিত্য আলোচনার নয়।'

—'যদি সাহিত্য আলোচনার উদ্দেশ্যই জানতাম?'

'তাহলে বলে দিতাম বঙ্কিমবাবু বাড়ি নেই।'

কী সাংঘাতিক কথা! দীনেশবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন বঙ্কিমবাবুর দিকে, আর বঙ্কিমবাবু জানলার বাইরে দূর আকাশের দিকে নির্বিকার দৃষ্টি মেলে স্থির হয়ে বসে আছেন। আর মতিলাল? তার অবস্থা না বলাই ভাল।

মিনিট খানেক অস্বস্তিকর নীরবতার পর দীনেশবাবু চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললেন—'আমরা এখন চললাম। অযথা আপনার খানিকটা সময় নষ্ট করেছি, মার্জনা করবেন।'

বিদায় নেবার সময় পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে বাধা দিয়ে বঙ্কিমবাবু বললেন—'এসে ছিলেন শ্রদ্ধা জানাতে, ফিরে যাচ্ছেন অশ্রদ্ধা নিয়ে। সুতরাং পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আর আমার অপরাধ বাড়াবেন না।'

এমন বিফল সাক্ষাৎকার দীনেশবাবুর জীবনে আর কখনও ঘটে নি এবং কল্পনাও করতে পারেন নি। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নের পিচ্‌গলা রাস্তায় নেমে দীনেশবাবু হনহন করে হেঁটে চলেছেন, পিছনে রয়েছে মুষড়ে-পড়া মতিলাল।

॥ ২১ ॥

আজ আমি আপনাদের কাছে এমন একজন লেখকের কথা বলতে বসেছি যিনি একদিকে রবীন্দ্র-প্রভাত-শরৎচন্দ্র ও অপর দিকে শৈলজা-প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্যকুমারের মাঝখানে সেতু স্বরূপ বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়ে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছেন। আমি 'অসাধু সিদ্ধার্থ', 'রোমন্থন' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক জগদীশ গুপ্তর কথাই বলছি। এঁর রচনার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় অল্পবিস্তর থাকলেও থাকতে পারে, লেখকের সঙ্গে পরিচয় বোধ হয় নেই। থাকবার কথাও নয়। সাহিত্যের পীঠস্থান কলকাতা মহানগরী থেকে শত মাইল দূরে ক্ষুদ্র এক মফস্বল শহরে সাহিত্যের নিভৃত সাধনাই তিনি করে এসেছেন। নির্লজ্জ আত্মপ্রচারের যুগে সাহিত্যের সাধনায় এমন নিষ্কাম নিষ্ঠা সচরাচর দেখা যায় না। বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে এই যে, লেখক হওয়ার

কোন প্রবল তাড়না ওঁর মধ্যে ছিল না, সাহিত্যিক খ্যাতি লাভের বাসনা তো নয়-ই। তবু তাঁকে লেখক হতে হয়েছিল আকস্মিক কারণে। লেখক-হওয়াটা ওঁর জীবনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কিছুই নয়, সেই কাহিনীই আজ আপনাদের বলতে বসেছি।

রামপ্রসাদের কথা আপনাদের নিশ্চয় অজানা নয়। জমিদারী সেরেস্তায় খাতা লিখতেন। হাতে কাজ নেই, অথচ নায়েব মশাইকে দেখাতে হবে বড় কাজে ব্যস্ত। অনন্যমনা হয়ে ঘাড় গুঁজে খাতা লিখে চলেছেন।

একদিন নায়েবের কৌতূহল হল। লোকটা এত কি হিসাব লেখে দেখা দরকার। খাতা তলব করলেন, বেরিয়ে পড়ল বিখ্যাত শ্যামা সংগীত—'আমায় দে মা তবিলদারি।'

মপাসাঁ কোন কালেই হয়তো গল্প লিখতেন না। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একটি গল্প লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। এমিল জোলা তখন ফরাসী সাহিত্যের নবীন লেখকদের গুরুস্থানীয়। তাঁর নেতৃত্বে একটি সাহিত্যচক্র গড়ে উঠল, তখনকার নবীন সাহিত্যিকরা একে একে এই চক্রে যোগ দিলেন। মপাসাঁও ছিলেন এই দলের একজন সভ্য। বাস্তববাদী সাহিত্যিক নামে এই দলটি তখন ফ্রান্সে সবে শোরগোল তুলেছে।

তখন ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ চলেছে। মপাসাঁ ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু যুদ্ধের প্রতি খুবই বিরূপ ছিলেন। যুদ্ধের বীভৎসতা মানুষকে অমানুষ করে দেয়, যুদ্ধকে তাই ঘৃণা করতেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলে তো কাজ হবে না, দেশবাসীর সামনেও যুদ্ধের বীভৎসতার দিকটা তুলে ধরা দরকার। স্থির হল বন্ধুরা প্রত্যেকেই একটি গল্প লিখবেন। এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জোলা। তিনি নিজে তো গল্প লিখবেনই, বই আকারে প্রকাশের ভারও তিনি নিলেন। মপাসাঁকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল গল্প লেখার। কিন্তু কি লিখবেন? গল্প তো কখনও লেখেন নি। মনে পড়ে গেল ওঁর কাকার কাছে শোনা একটি ঘটনা, স্থির করলেন সেইটি নিয়েই গল্প লিখবেন। যথা সময়ে লিখলেন গল্প। নাম দিলেন 'বল্ দ্য সুফ্'—বল্ অফ ফ্যাট। এই একটি গল্প লিখেই মপাসাঁ সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেলেন এবং গল্পটি আজও মপাসাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পরূপে সমাদৃত।

অত দূরে যাবার দরকার কি। ঘরের কাছেই তো দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে, লেখক হওয়াটা যাঁদের জীবনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট। মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুবোধ ঘোষের কথাই বলছি। মানিকবাবু তখন কলকাতার কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্সের ছাত্র, থাকেন একটা মেস্-এ। একদিন মেস্-এর বন্ধুদের সঙ্গে জোর তর্ক চলছিল। বিষয়টা ছিল, পত্রিকা-সম্পাদকরা অপরিচিত লেখকের লেখা ছাপে না। মানিকবাবু প্রতিবাদ করলেন। লেখার মধ্যে যদি প্রতিশ্রুতি থাকে সম্পাদকরা নিশ্চয় সে-লেখা ছাপবে। মানিকবাবুর যুক্তি ছিল অপরিচিত লেখকের ভাল লেখা না ছাপাটা পত্রিকার পক্ষে সুইসিড্যাল পলিসি। বন্ধুরা মানিকবাবুর কথা মানতে রাজী নন, প্রমাণ চাই। মানিকবাবু বরাবরই একগুঁয়ে মানুষ। বললেন, প্রমাণ দেবেন। পাঁচ টাকা বাজি হয়ে গেল। সাতদিনের মধ্যে একটা গল্প লিখে তখনকার বিখ্যাত পত্রিকা বিচিত্রায় পাঠিয়ে দিলেন। পরের মাসেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'অতসী মামী' প্রকাশিত হল। তার কিছুদিন পরে বিচিত্রার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঠিকানা খুঁজে বার করে স্বয়ং মানিকবাবুর মেস্-এ এসে হাজির। গল্পের পারিশ্রমিক বাবদ পনেরোটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে আরও গল্প লিখবার অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। মানিকবাবুর সাহিত্য-জীবনের সেই শুরু।

সুবোধবাবুর প্রথম লেখা গল্প 'অযান্ত্রিক'-এর ইতিহাস তো সবারই জানা। কোন দিন লেখক হবেন, স্বপ্নেও ভাবেন নি সুবোধবাবু। হাজারিবাগের রুটির ব্যবসা গুটিয়ে ভাগ্যান্বেষণে এলেন কলকাতায়। আনন্দবাজার পত্রিকায় সাব-এডিটরের চাকরি পেয়ে গেলেন। মন্মথনাথ সান্যাল, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ প্রভৃতি মিলে একটা পাঠচক্র করেছিলেন। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় নিয়মিত তাঁরা একত্রে মিলিত হতেন এবং এক-এক শনিবার এক-একজনকে কিছু একটা লিখে এনে পড়ে শোনাতে হত। সুবোধবাবু শ্রোতারূপেই এই চক্রে যোগ দিয়ে আসছেন। একদিন বন্ধুরা ধরলেন, পরের শনিবার সুবোধবাবুকে কিছু-একটা লিখে এনে পড়ে শোনাতে হবে। সুবোধবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত। জীবনে এক লাইন লেখেন নি, কী লিখবেন। বন্ধুরা নাছোড়বান্দা, লিখতেই হবে। নিরুপায় হয়ে কথা দিলেন। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরে এল, কিছুই লেখা হল না। শুক্রবারেও বন্ধুরা স্মরণ করিয়ে দিলেন লেখার কথা। সারাদিন আপিসের কাজকর্ম সেরে মার্কাস স্কোয়ারের কোণার মার্কাস বোর্ডিং-এ ফিরে গেলেন, লেখার কথাটা বোঝার মত মাথায় চেপে আছে। রাস্তার পাশে এক তলার একটি ঘরে তখন

থাকতেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন, কিছু একটা লিখতেই হবে। লেখা যখন শেষ করলেন তখন ভোর চারটে। লেখাটা পকেটে করে অফিসে এলেন, বন্ধুরা লেখার কথা জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকেন। সন্ধ্যায় যথারীতি আসর বসল, সুবোধবাবু সঙ্কোচের সঙ্গে পকেট থেকে পাণ্ডুলিপি বার করে পড়লেন সেই বিখ্যাত গল্প 'অযান্ত্রিক'। এই একটি গল্প লিখেই সুবোধবাবুর স্থান বাংলা সাহিত্যে পাকা হয়ে গেল। সুতরাং সুবোধবাবুরও লেখক হওয়াটা অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কি। এঁদের তুলনায় জগদীশ গুপ্তর লেখক হওয়ার ঘটনাটা আরও কৌতুকপ্রদ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তার প্রবর্তনে জগদীশ গুপ্ত ছিলেন অন্যতম পুরোধা। শরৎচন্দ্রের পর নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর লেখা প্রবাসী-ভারতবর্ষ প্রমুখ বিশিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল, সে-লেখায় সমাজ-জীবনের বাস্তবরূপ রোষ-কষায়িত ভঙ্গীতে ব্যক্ত। পড়ে চমকে উঠতে হয়। তাঁর লেখায় শ্লেষ আছে, ব্যঙ্গ আছে, হাসি আছে আর আছে জীবন সংগ্রামে জর্জরিত একটি মানুষের দরদী দৃষ্টি। কল্লোল ও কালিকলমের একাধিক লেখক যে জগদীশ গুপ্তর কাছে ঋণী একথা অস্বীকার করবার নয়।

১৯৩০ সালের কথা। আমি তখন শান্তিনিকেতন কলেজে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। যে-সব পিরিয়ডে ক্লাস থাকত না, আমরা এসে জড়ো হতাম লাইব্রেরীর রীডিং রুম-এ, কলকাতা থেকে সদ্য-আসা মাসিক পত্রিকাগুলি ছিল আমাদের প্রধান আকর্ষণ। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, মানসী ও মর্মবাণী, বিচিত্রা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল প্রগতি কল্লোল কালিকলম উত্তরা। যে-বয়েসে সাহিত্যের বাতিক সংক্রামক ব্যাধির মত অল্প-বিস্তর সব মানুষকেই আক্রমণ করে, আমার তখন সেই বয়েস। প্রবীণ ও নবীন পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস পড়ে ফেলা ছিল আমাদের নেশা। বিশেষ করে তরুণ কোন সাহিত্যিকের লেখায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাদ পেলে তো আর কথাই নেই। শুধু নিজে পড়ে তৃপ্তি হত না। আর পাঁচজনকে পড়ানো চাই, তারপর শুরু হত তাই নিয়ে তুমুল আলোচনা।

আরেকটা নেশা আমাদের ছিল, সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হবার নেশা। কলকাতা থেকে মাঝে-মাঝে সাহিত্যিকরা আসতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, কিন্তু

সংখ্যায় নিতান্তই অল্প। যাঁরাই আসতেন, খবর পেলেই আমরা তাঁদের আশেপাশে ঘুর-ঘুর করতাম পরিচয় লাভের আশায়। আমাদের কৌতূহল ছিল লেখকদের কাছ থেকে জানার—কি ভাবে তাঁরা গল্প লেখেন; দিনে কয় ঘণ্টা লেখেন, কতদিন লাগে একটা গল্প লিখে শেষ করতে ইত্যাদি। এই সময়ে হঠাৎ লাইব্রেরি রুম-এ নতুন কি একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে গিয়ে একটা গল্পের নাম পড়ে চমকে উঠলাম। 'কলঙ্কিত সম্পর্ক'। লেখকের নামটা সেকেলে, জগদীশ গুপ্ত। আগে এর কোন লেখা পড়েছি বলে মনে করতে পারলাম না। তবু নামের আকর্ষণে গল্পটা আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলাম এই লেখকের লেখা আর কোন্ পত্রিকায় পাওয়া যায়। এমন নেশা ভদ্রলোক ধরিয়ে দিলেন যে, ওঁর লেখা গল্প উপন্যাস যেখানে পাই পড়ে ফেলি।

একদিন লাইব্রেরির নতুন বইয়ের তালিকায় জগদীশ গুপ্তর 'রোমন্থন' বইয়ের নামটা দেখেই ছুটলাম লাইব্রেরিয়ান প্রভাতদার কাছে, রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

লাইব্রেরিতে তখন একটা নিয়ম ছিল—সব বই সব ছাত্রকে পড়তে দেওয়া হত না। বিশেষ করে অশ্লীলতা দোষে কলঙ্কিত বাংলা বইগুলি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে সযত্নে রক্ষিত হত। নতুন বই এলেই প্রভাতদা সর্বাগ্রে তা পড়ে দেখতেন এবং তিনিই স্থির করতেন সে-বই ছাত্রদের হাতে দেওয়া যাবে কি না। তার ফলে আজকের দিনের একাধিক খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকের সেদিনের লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস-পাঠের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। পরবর্তী জীবনে কলকাতায় এসে সেই সব উপন্যাস সংগ্রহ করে পড়তে গিয়ে পানসে লেগেছে।

প্রভাতদার কাছে 'রোমন্থন' বইটা চাইতেই দেরাজ থেকে বার করে দিয়ে বললেন—'এ বই তুই পড়তে পারিস। বড় ভালো লিখেছে রে। হাসিও যেমন, অশ্রুও তেমনি।'

বইখানা পড়ে লেখককে দেখার প্রবল কৌতূহল দেখা দিল। দু'দিন পরে বইটা ফেরত দিতে গিয়ে প্রভাতদাকে বললাম—'এই লেখক কি কখনও শান্তিনিকেতনে আসেন না?'

প্রভাতদা বললেন—'কেন বল তো?'

—'আলাপ করার বড় ইচ্ছে।'

—'যে কোনদিন গেলেই তো পারিস।'

অবাক হয়ে গেলাম প্রভাতদার কথা শুনে। শান্তিনিকেতনে হেন লোক নেই যাকে আমি চিনি না বা জানি না। আমাদের কোনও মাস্টার মশাই কি তাহলে ছদ্মনামে লিখছেন! পদবীটা যখন গুপ্ত, হলেও হতে পারে।

প্রভাতদাকে অনুনয়ের সঙ্গে বললাম—'আপনি যখন জানেন লেখকটি কে তখন আমাকে বলতেই হবে।'

প্রভাতদা বললেন—'কেন বলব না। বোলপুরে আদালতে কাজ করেন। মুহুরীর কাজ। থাকেনও আদালতের কাছেই। যে-কোন রবিবার সকালে চলে যা। আদালতের কাছে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বাড়িটা দেখিয়ে দেবে।'

শান্তিনিকেতনে রবিবার কখনও ছুটি থাকে না, ছুটি থাকে বুধবারে। অথচ রবিবার দিন না গেলে জগদীশ গুপ্তর দেখা পাওয়া সম্ভব নয়।

এক শীতের রবিবার সকালে একটা সাইকেল যোগাড় করে চলে গেলাম বোলপুরে। স্টেশনের ডান দিকের রাস্তা ধরে আধ মাইল পথ দক্ষিণে এগোলেই আদালত। আদালতের এক চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করতেই বাড়ির হদিস পেয়ে গেলাম। বাড়িটার সামনে একটা প্রশস্ত উঠোন। সেই উঠোনে বোলপুরী মোড়ায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, একমনে একটা বই পড়ছেন। গায়ে ছাই রঙের তুষের আলোয়ান জড়ানো।

সাইকেলটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ভদ্রলোকের কাছে এসে দাঁড়ালাম। কোনদিকে খেয়াল নেই, একমনে একটা মোটা ইংরেজী বই পড়ে চলেছেন। সন্তর্পণে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি, কি বই পড়ছেন দেখার আগ্রহ। আমার ছায়াটা দীর্ঘায়িত হয়ে বইটার উপর পড়তেই চমকে তাকালেন আমার দিকে। অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—'আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আপনিই তো লেখক জগদীশ গুপ্ত?'

আমার কথা শুনেই শিশুর মত সরল হাসি সারা মুখে-চোখে ফুটে উঠল। নিকেলের ফ্রেমের চশমার ভিতরে করুণাঘন দুটি চোখের দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ রেখে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ঝুলে-পড়া গোঁপের ফাঁকে সরল হাসিটি উঁকি-ঝুঁকি মারছে। সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—

'আমিই জগদীশ গুপ্ত। তবে লেখক কি-না, সে বিষয়ে নিজেরই যথেষ্ট সংশয় আছে। তা আমার কাছে কি প্রয়োজন?'

আমি বললাম—'আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যেই এসেছি।'

অবাক হয়ে জগদীশবাবু বললেন—'সে কি কথা। সমুদ্রের স্বাদ তুমি পেয়েছ, হেজে-মজে যাওয়া ডোবায় তুমি কি পাবে। রোসো, আমি এখুনি আসছি।'

ধীর পদক্ষেপে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। দীর্ঘাকার ক্ষীণদেহটি ঈষৎ নুয়ে পড়েছে। চেহারায় ইস্পাতের কাঠিন্য নেই, আছে জীবনসংগ্রামের ক্লান্তি। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রির অবসানে পরিশ্রান্ত লতাবৃক্ষের মত। একটু পরেই একটা মোড়া হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'শীতের সকালে স্যাঁতসেঁতে ঘরে বসে আলাপ জমবে না, রোদে পিঠ দিয়েই বসা যাক। কি বলো?'

আমি তাড়াতাড়ি ওঁর হাত থেকে মোড়াটা নিয়ে ওঁর পাশে বসেই বললাম—'আপনি এত কাছে থাকেন তবু শান্তিনিকেতনে আপনাকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেক লেখকই তো আসেন, আপনি কেন আসেন না।'

চুপ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললেন—'প্রতিদিন ভোরে উঠে আমি প্রথমে সূর্য-প্রণাম করি। আসলে সে প্রণাম কবিগুরুর উদ্দেশ্যেই। তবে কি জানো, অতবড় একজন মহাপুরুষের কাছে আমার যেতে বড়ই সংকোচ। আমার মুখ দিয়ে তো কোন কথাই বেরোবে না।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম—'আপনার এই সংকোচ কিন্তু অহেতুক। আপনার মত লেখক রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে উনি খুশীই হবেন আপনার সঙ্গে আলাপ করে।'

সলজ্জভাবে জগদীশবাবু বললেন—'আসলে তো আমি লেখকই নই। লেখক হতে হলে যে নিষ্ঠা, যে সাধনা, যে অনুশীলনের প্রয়োজন আমি তার কিছুই করি নি। তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, স্রেফ ফোকটে আমি লেখক হয়ে পড়েছি। আমার এই জোচ্চুরিটা পাছে ধরা পড়ে যায় সেই কারণেই কোথাও যেতে আমার এত ভয়।'

জগদীশবাবুর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট যা আমার চোখে ধরা পড়েছিল তা হচ্ছে সাহিত্যিক সততা। সমাজের নিম্নস্তরের তুচ্ছ মানুষগুলিকে দেখেছেন

অন্তরের গভীর সহানুভূতি দিয়ে। সে-দেখায় কোন ফাঁক বা ফাঁকি নেই এবং সেই সব চরিত্র নিয়ে ওঁর লেখার দৃষ্টিভঙ্গী যেমন তির্যক তেমনি খাঁটি সোনার মত উজ্জ্বল। আমি তাই ওঁর কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম—'আপনার লেখা আমি যতটুকু পড়েছি তাতে কিন্তু আপনার কথায় কোন রকমেই সায় দিতে পারছি না। আপনার লেখায় ব্যঙ্গ আছে, কষাঘাত আছে কিন্তু এ-সব ছাড়িয়ে যেটা বড় হয়ে ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে অন্তর-মথিত দরদ আর সত্যদৃষ্টি।'

মৃদুকণ্ঠে হতাশার স্বর এনে জগদীশবাবু বললেন—'আমার লেখা সাধারণ মানুষের যদি ভাল লেগে থাকে আমি তাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু বিদগ্ধজনের কাছে এ-লেখা অপাংক্তেয়।'

আমি বললাম—'সাহিত্যে যারা মননশীল লেখককে খোঁজেন আমি তাদের দলে নই। সাহিত্যে সত্যদৃষ্টিই আমার কাছে বড় কথা।'

এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে একটি সাঁওতালী বুড়ি ঝি একটা কাঁসার জামবাটি ভর্তি মুড়ি আর ঝোলা-গুড় এনে হাজির। জগদীশবাবু বললেন—'শীতকালে খেজুরের গুড় আর মুড়ি বড় উপাদেয় খাদ্য। গিন্নী তোমার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর সঙ্গে একটু নারকোল কুচি পড়লে আরও উপাদেয় হত। কি বল? বাড়িতে বোধ হয় আজ নারকোল নেই। তা না হলে গিন্নী এ-ভুল করতেন না।'

আমি ততক্ষণে গুড়-মুড়ি ভাল করে মেখে বেশ খানিকটা মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে বললাম—'বীরভূমের ঝোলা-গুড় আর মুচমুচে মুড়ির তুলনা হয় না।'

হাসতে হাসতে জগদীশবাবু বললেন—'তাই তো বলি সুকুমার রায় 'আবোল-তাবোল'-এ পাঁউরুটি আর ঝোলা-গুড়ের প্রশস্তি করেছেন। ঝোলা-গুড় আর মুচমুচে মুড়ি তো খান নি।'

যে প্রসঙ্গ আমাদের চলছিল সেই প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসার আশায় আমি বললাম—'আপনার নিজের লেখা সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসের এই অভাবটা কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগছে না।'

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন জগদীশবাবু। ঝুঁকে পড়ে স্থির দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন। একটা কিছু চিন্তা ওঁর মনকে আলোড়িত করছে তা অনুমান করলাম। একটু পরেই আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখি

শিশুর মত সরল হাসিতে ওঁর মুখ উজ্জ্বল, দুটি চোখে কৌতুক মাখা। বললেন—'আমার সম্বন্ধে তোমার যখন এতই কৌতূহল, তোমার কাছে কথাটা খুলেই বলি। লেখক আমি কোন কালেই হতাম না। লেখক হওয়াটা আমার জীবনে এমন একটা কিছু স্মরণীয় ঘটনা নয়, দুর্ঘটনা।'

এটুকু বলেই বাড়ির দিকে একবার তাকিয়ে গলার স্বরটা কিঞ্চিৎ মৃদু করে বললেন—'আমার গিন্নীই আমাকে লেখক বানিয়ে ছেড়েছেন।'

আমি হেসে বললাম—'এ আর নতুন কথা কি। বহু লেখকের জীবনে শুনেছি স্ত্রীর ইন্‌স্‌পিরেশনই তাঁর লেখক হবার মূল কারণ।'

'—তবে আমার ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্‌স্‌পিরেশন নয়, পারস্‌পিরেশন। এই পারস্‌পিরেশন থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে বাধ্য হয়ে লেখক হতে হয়েছে। বৃত্তান্তটা বলি শোন।'—

'আদালতে সামান্য বেতনের চাকরি, আয় এবং ব্যয়ের দুই প্রান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে গৃহিণী নাজেহাল। শেষে একদিন বিরক্ত হয়েই আমাকে জানালেন—রইল তোমার এ ঘর দুয়ার, তুমি আদালতের চাকরি নিয়েই থাক, আমি চললাম।

প্রমাদ গণলাম। ঝড়ের পূর্বাভাস। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে খুলেই বল না।

গৃহিণী বললেন—বলব আর কি। চোখে দেখতে পাও না? রোজ সকালে কুঁড়েমি না করে নিজে গিয়ে হাটবাজারটা করলেও তো দু-পয়সা সাশ্রয় হয়।

আমার মাথায় বজ্রাঘাত। ওই বাজার করাটা আমি বড় ভয় করি, ওটা আমার ধাতে সয় না। এখান থেকে বোলপুরের বাজারটা প্রায় এক মাইল পথ। ধুলো-ওড়া রাস্তা দিয়ে রোজ সকালে বাজার করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা কি কম। হাঁটুভর্তি ধুলো তো আছেই, তার উপর বাজারে লেপ্‌টা-লেপ্‌টি ভিড়। ওই ভিড় আমি কোন কালেই সহ্য করতে পারি নে বলেই এই মফস্বল শহরের এক প্রান্তে নিরিবিলিতে পড়ে আছি। তার উপর এক পয়সা সাশ্রয়ের জন্য প্রতিদিন দরাদরি করে বাজার করার চেয়ে ডাকাতি করা বোধ হয় অনেক সহজ। তাছাড়া কি জানো? সকাল বেলাটাই হচ্ছে আমার কাছে মৌজ করার উৎকৃষ্ট সময়। সারা দিন তো আদালতে দিনগত পাপক্ষয় করছি কলম পিষে। ও-সময়টা পেটের ভাত যোগাড়ের জন্যে জন্মাবার আগে থেকেই বিধাতা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আর রাত্রিটা—'

এইটুকু বলেই জগদীশবাবু আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। অবশেষে গলার স্বরটা আরও একটু নিচু করে বললেন—'পরের বাড়ির মেয়েকে বিদেশে বিভুঁইয়ে এনে রেখেছি। এখানে আবার সঙ্গীসাথীর বড়ই অভাব। থাকলেও তারা শুধু হাঁড়ির খবর নিতেই ব্যস্ত। গৃহিণী তাই ওদের বেশি পছন্দ করেন না, অগত্যা আমাকেই সঙ্গ দিতে হয়।

একমাত্র সময় এই সকাল বেলা। এ-সময়টা গিন্নী রান্নাবান্না, ঘর-সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, আদালতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সময়টা আমার নিজস্ব। একে আমি আমার ইচ্ছে মত শুয়ে বসে বই পড়ে অথবা সামনের ওই পথ দিয়ে লোকের আনাগোনা দেখে কাটিয়ে দিই। কিন্তু আমাদের এই কেরানী জীবনে সংসারটা এমনই জোয়াল যে একবার কাঁধে চড়লে আর নামতে চায় না, চব্বিশ ঘণ্টাই তোমাকে খাটাতে চায়। তখন রাম প্রসাদী গানে সান্ত্বনা খোঁজা ছাড়া আর উপায় কি।'

জগদীশবাবু এবার থামলেন। বাটিভর্তি মুড়ি আর গুড় ততক্ষণে খাওয়া হয়ে গিয়েছে, দু-পেয়ালা চা এসে হাজির। চায়ে চুমুক দিয়ে জগদীশবাবু আবার শুরু করলেন তাঁর লেখক-হওয়ার কাহিনী।

'কাছারির একটা বেয়ারা রোজ সকালে এসে কুয়ো থেকে জল তুলে দিয়ে যায়। গৃহিণী তাকে দিয়েই এতদিন চাল-ডাল-নুন-তেল বাজার থেকে কিনিয়ে আনেন, সপ্তাহে দুদিন হাটে গিয়ে কাঁচা বাজারটাও ও-ই করে আনে। গৃহিণীর ধারণা, লোকটা নির্ঘাৎ পয়সা চুরি করে। শুধু তাই নয়, হাটের দিন যত রাজ্যের রদ্দি ঝড়তি পড়তি শুঁটকো আনাজ কিনে এনে দাম বলে বেশি। সুতরাং এখন থেকে ও-কাজটা আমাকেই করতে হবে।

আমি চিরকালই একটু আয়েশী লোক কিন্তু গিন্নীর ধারণা আসলে আমি নাকি কুঁড়ের হদ্দ! সুতরাং এই দুর্নাম ঘোচাবার জন্য পরদিন সকাল থেকেই বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে পড়লাম। তার কি পরিণাম হয়েছিল জান? গিন্নীর দু-চার পয়সা সাশ্রয় হয়েছিল ঠিকই, আমার বিড়ি-সিগারেটের পয়সায় টান পড়ে গেল। বাজারের ওই ভিড়ের মধ্যে তরিতরকারির দর নিয়ে দরাদরি করা কি আমার দ্বারা সম্ভব?

বাজার করে আসা মাত্রই গৃহিণী থলি উপুড় করেই বললেন—বেগুন কত করে সের আনলে?

—চার পয়সা করে।

চোখ বড় বড় করে গিন্নী বললেন—'ও মা, কী কাণ্ড বল তো? এতদিন রামচরণ ছয় পয়সা করে বেগুন এনেছে, তা-ও বিচিভর্তি। কী পয়সাটাই না এতদিন ধরে সরিয়েছে।'

জগদীশবাবু হাসতে হাসতে বললেন—'এই ভাবে ঝঞ্ঝাট এড়াতে নিজের পকেট খরচার পয়সায় তো টান পড়লই উপরন্তু কাছারির নির্দোষ বেয়ারাটা মাঝখান থেকে বদনামের ভাগী হল। তার চেয়েও মারাত্মক কাণ্ড কি হল জানো? পাশের বাড়ির মোক্তার গিন্নীর কাছে আমার গিন্নী সগর্বে জানিয়েছেন দরাদরি করে কত সস্তায় আমি বাজার করে আনি। তার ফলে মোক্তার-গিন্নী তাঁর বাড়ির চাকরকে বরখাস্ত করে স্বামীকেই হাটে পাঠাচ্ছেন। তাঁর অবস্থাটা একবার অনুমান করে ছ্যাখ। একদিন মোক্তার বাবুর সঙ্গে বাজারে আমার দেখা। একেবারে গলদ্‌ঘর্ম অবস্থা। আমাকে দেখেই কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন—আমি আপনার কি ক্ষতি করেছি জগদীশবাবু যে আমার এই সর্বনাশটা করলেন।

সান্ত্বনা দিয়ে বললুম—দুঃখটা একা ভোগ করতে বেশি লাগে। ভাগ করে ভোগ করলে কষ্টের অনেকখানি লাঘব হয়।

ভদ্রলোক কি বুঝলেন জানিনা, তবে অনেক দিন বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু আসল বিপদ দেখা দিল কখন জানো? আমার কেনা তরি-তরকারি গৃহিণীর আর পছন্দ হয় না। বাজার করে আনার পর থলিটা উপুড় করে বললেন—তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে। লাউ এনেছ যখন কুচো চিংড়ি কোথায়?

—বাজারে চিংড়ি আজ ওঠেই নি।

—রুই বা কাতলা মাছের একটা মুড়ো আনলেও তো পারতে।

—মাছের মুড়ো সব সময় আলাদা না পাওয়া গেলে কি করব?

—ধনে পাতাও তো আনতে পারতে। বল, সেটাও বাজারে ওঠে নি।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে জগদীশবাবু আমাকে বললেন—'বাজারে গিয়ে ফাঁকা জায়গা দেখে হাতের কাছে যা পাই কিনে আনি, গিন্নীর আর পছন্দ হয় না। এদিকে বিড়ি সিগারেট খাওয়া গেল কমে, ওদিকে রোজ সকালে এই গলদ্‌ঘর্ম পরিশ্রম। উপরন্তু তরিতরকারির পছন্দ অপছন্দ নিয়ে রোজ একটা বচসা। জীবনে যখন প্রায় ঘেন্না ধরিয়ে দেবার উপক্রম হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।'

জগদীশবাবু টিনের একটা চ্যাপটা কৌটো থেকে বিড়ি বার করে ধরিয়ে বললেন—'আরেক কাপ চা হয়ে যাক, কি বলো ?'

আমি তৎক্ষণাৎ সায় দিলাম। একে শীতের সকাল তার উপর জগদীশ বাবুর এমন সরস গল্প। চা-টা জমবে ভালো। আমার সম্মতি পেয়ে জগদীশবাবু ধীর পদক্ষেপে আবার বাড়ির ভিতরে গেলেন। একটু পরে বেরিয়ে এসেই বললেন—'গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন, কার সঙ্গে বসে এত বকর বকর করছ আর বার বার চা খাওয়াচ্ছ। ছেলেটা কে ? যেই বললুম শান্তিনিকেতনের ছেলে, আমার লেখা পড়ে যেচে আলাপ করতে এসেছে, গিন্নীর মুখে একগাল হাসি। সুতরাং চা-টা ভালই তৈরি হবে অনুমান করছি।'

মানুষটির কথা-বার্তায়, আচার আচরণে সরল অংস্তকরণের এমন একটা কোমল স্পর্শ আছে যা আমাকে এতক্ষণে অভিভূত করে ফেলেছে। আমি সংকোচের সঙ্গেই বললাম—'আমি এসে আপনার কাজের কোন রকম ব্যাঘাত করলাম না তো ?'

জগদীশবাবু বললেন—'খুব কাজের মানুষ ঠাওরেছ আমাকে। বৈষয়িক উন্নতির জন্য যারা কাজ করে তৃপ্তি পায়, আমি সে-দলের নই। তার চেয়ে তোমার সঙ্গে দু-দণ্ড বসে গল্প করায় আমি অনেক বেশি তৃপ্তি পাই।'

দু-পেয়ালা চা এসে হাজির। চুমুক দিয়েই বললেন—'অনুমানটা ঠিক কিনা বলো।'

অনুমান যে মিথ্যে হবে না তা আগেই জানা ছিল। প্রথম কাপ চা-খেয়েই বুঝেছিলাম, পাকা হাতের তৈরি। গল্পের সূত্র ধরিয়ে দিয়ে বললাম—'বাজার করার বিড়ম্বনা থেকে কি ভাবে রেহাই পেলেন সেই ঘটনাটা বলুন।'

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন জগদীশবাবু। বললেন—'মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। সে ঘটনার কথা ভাবলে আজও হাসি পায়। একদিন বিকেলে আদালত থেকে এক গাদা নথিপত্র বাণ্ডিল বেঁধে বাড়ি নিয়ে এলাম। গৃহিণী অবাক হয়ে সুধোলেন—এ সব খাতা পত্তর কিসের, উত্তরে বললাম—আদালতের কাজ। মামলা-মোকদ্দমা অনেক জমে গিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কড়া হুকুম তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেওয়া চাই।

গিন্নী জানতেন, রাত্রে আমি এসব কাজ করতে পারি নে, চোখে কম দেখি। একমাত্র সময় সকাল বেলা। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চা-জলখাবার

খেয়ে আদালতের নথি-পত্র নিয়ে বসি মুহুরীর কাজে, বাজারে যায় কাছারির সেই বেয়ারা।

একটা দিক তো রক্ষা হল। সকালে আর এক মাইল ধূলো-কাদা ভেঙ্গে বাজারে যেতে হয় না। কিন্তু রোজ সকালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আদালতের নথিপত্র ঘাঁটা, তারও তো মানসিক যন্ত্রণা কম নয়। শেষে বাধ্য হয়ে লিখতে শুরু করে দিলাম। রোজ সকালে বসে লিখি, গৃহিণী ভাবেন কর্তা আমার আপিসের কাজে কী খাটাই না খাটছেন।

লিখতে লিখতে একদিন নিজেই আবিষ্কার করলাম যে একটা ছোটো গল্প লিখে ফেলেছি। গিন্নীকে না জানিয়ে গোপনে লেখাটা পাঠিয়ে দিলাম পত্রিকার সম্পাদকের নামে এবং তা যথা সময়ে প্রকাশিতও হল।'

জগদীশবাবু এইটুকু বলেই চুপ করলেন, আমিও নির্বাক। বেলা বেড়েছে, শীতের মিঠে রোদ তখন কড়া হয়ে উঠেছে। আমি ভাবছিলাম যে-মানুষ লেখক হবার জন্যে কোন সাধনাই কখনও করেন নি তাঁর হাত দিয়ে এমন লেখা বেরলো কি করে! হয়তো মনে মনে অনেককাল ধরে এ-লেখার প্রস্তুতি চলছিল নিজের অগোচরেই। বিরাট বিস্ময় নিয়ে সেদিন জগদীশবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি। আর কখনও ওঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। পরবর্তী জীবনে যখন কলকাতায় এসে পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হই তখন জগদীশবাবু কলম থামিয়ে দিয়েছেন। পরিমিতি বোধ ছিল তাঁর অপরিসীম। পাঠকদের মন-যোগানো লেখা কোনদিন তিনি লেখেন নি। যে মুহূর্তে জানতে পারলেন যে তাঁর স্পষ্টোক্তি পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারছে না, লেখা দিলেন থামিয়ে। শারদীয়া সংখ্যার জন্য একবার লেখা চেয়ে ওঁকে চিঠি দিয়েছিলাম। উত্তরে কম্পিত হস্তাক্ষরে প্রায় অস্পষ্ট ছোট্ট একটি চিঠি এল—'সাহিত্য কর্ম হইতে অনেক দিন হইল বিদায় লইয়াছি। পুঁজি ফুরাইয়াছে, দৃষ্টিশক্তিও হারাইয়াছি। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ইতি।'

১৯৫০ সালে জগদীশবাবুর ছোটগল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের অনুরোধে সে-গ্রন্থের একটি ভূমিকা তিনি লেখেন। তার এক জায়গায় নিজের রচনা সম্বন্ধে যে কথা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :—

'নিজের সম্বন্ধে আমি যতই ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ফলাইয়া লিখি না কেন

কোন সুরুচি-সম্পন্ন ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিবেন না; হয়তো হাসিবেন এবং হাসাহাসি করিবেন। আর, "অনুপস্থিত" লোকের হঠাৎ আসিয়া গাম্ভীর্যের সঙ্গে বাগাড়ম্বর-পূর্বক সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা, কার্যকারিতা, দায়িত্ব, স্থায়িত্ব উদ্দেশ্য প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হইবে ততোধিক হাস্যের কারণ।

তবে একেবারেই যে খবর নাই কিম্বা সব খবরই যে বলিতে আমি অনিচ্ছুক এমন নয়। একটি খবর দিব।

বোলপুর টাউনে গেলাম। কিছুদিন পরেই মাসিক পত্রের মাধ্যমে ক্রমে জানাজানি হইয়া গেল যে আমি একজন লেখক। দুটি বন্ধু পাইলাম: শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত ও শ্রীশান্তিরাম চক্রবর্তী। তৎপূর্বেই ভোলানাথবাবু তাঁর স্বরচিত "গোরুর গাড়ী" কাব্য ছাপাইয়াছেন। ওই দুটি বন্ধুর মানুষের অন্তরের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া এবং তাঁদের রসাল রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাঁহারাই একদিন প্রস্তাব করিলেন: গল্পের বই করুন একখানা।

জানাইলাম, প্রকাশক পাইব না।

সেখানেই উপস্থিত ছিলেন সেখানকার কানুবাবু—শ্রীব্রজজনবল্লভ বসু। তিনি জানিতে চাহিলেন: ছাপিতে কত টাকা লাগিতে পারে?

বলিলাম—শ-আড়াই।

—আমি দিব। ছাপুন।

কানুবাবু যথাসময়ে টাকাটা দিলেন—'বিনোদিনী' গল্পের বই ছাপা হইল।

২০।২৫ খানা বই এঁকে-ওঁকে দিলাম; অবশিষ্ট হাজারখানেক বই, আমার আর কানুবাবুর "বিনোদিনী", প্যাকিং বাক্সের ভিতর রহিয়া গেল; পরে কীটে খাইল।

লেখক এবং সামাজিক মানুষ হিসাবে আমার আর কোনও অনুশোচনা নাই, কেবল মানসিক এই গ্লানিটা আছে যে, কানুবাবুর শ-আড়াই টাকা নষ্ট করিয়াছি।

আমার নিজের সম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে, আমি যদি এখন মরি তবে যাঁহারা আমাকে চেনেন তাঁহারা বলিবেন—"বয়েস পেয়েই গেছেন।" '

এই ভূমিকা লিখে দেবার কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরই অনুজ-সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র এক জায়গায় বলেছেন:

'সময়ের স্রোতে সব কিছুই হারায়, তবু জীবনকে নির্ভীক নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখবার ও বুঝবার চেষ্টায় অসাধু সিদ্ধার্থের মত বই লেখবার জন্যে সারাজীবন রোগ শোক অভাব দারিদ্র্যের সঙ্গে অম্লান বদনে যিনি যুঝে এসেছেন, প্রত্যক্ষভাবে না হোক, তাঁর সাহিত্যিক সাধুতা পরোক্ষভাবে ভাবী কালের অনুপ্রাণনা হয়ে থাকবেই।'

॥ ২২ ॥

আমরা যে-যুগে জন্মেছি সে যুগকে বলা উচিত রবীন্দ্র-যুগ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কী না দিয়েছেন। মুখে ভাষা দিয়েছেন, কণ্ঠে গান দিয়েছেন, প্রাণে দিয়েছেন আনন্দ, আর দিয়েছেন পৃথিবীর সৌন্দর্যকে মন ভরে দেখার দৃষ্টি। একশ বছর আগে এই বাংলা দেশের আকাশে যাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল একশ বছর পার হয়ে এসে তাঁর আলো আজ সারা পৃথিবীর আকাশকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। আজ তাই পৃথিবীর সব দেশের মানুষ এক প্রাণ এক মন হয়ে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিক জন্মোৎসব পালনের আয়োজন করেছে।

এ-উৎসব ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল ১৮৬১ সালে। ১৯৬১ সালের শুরুতেই বোম্বাই শহরবাসী খুব ঘটা করে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকীর শুভ উদ্বোধন করলেন, সেই থেকে সারা বৎসর-ব্যাপী সারা দেশ জুড়ে উৎসব চলছে।

কলকাতা শহর একদিক দিয়ে ভাগ্যবান। এই শহরের মাটিতে তিনি জন্মেছিলেন, এই শহরের মাটিতেই তাঁর দেহাবসান ঘটেছে। সুতরাং ঘটা করে শতবার্ষিকী উৎসব পালনের অধিকার কলকাতা শহরের নিশ্চয় আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের নামে বড় বড় ইমারত তৈরী হচ্ছে। রবীন্দ্র নাট্যশালা, রবীন্দ্র ভারতী, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, রবীন্দ্র সরোবর ইত্যাদি কত কিছু। শুনছি রবীন্দ্রনাথের নামে শান বাঁধানো রাস্তা হবে, তার মোড়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথের বিরাট মর্মর মূর্তি। অর্থাৎ ইট পাথর দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বন্দী করতে চাই। শহুরে সভ্যতার এইটাই সবচেয়ে বড় অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন বলেই শহর থেকে শত মাইল দূরে শান্তিনিকেতনের নির্জন প্রান্তরে তিনি তাঁর শান্তির নীড় রচনা করেছিলেন।

শহরে শতবার্ষিকী উৎসবের যে পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি উৎসবপতি রবীন্দ্রনাথ পড়ে থাকেন নেপথ্যে। তাঁকে উপলক্ষ করে চলে নাচ-গান-নাটকের হুল্লোড়বাজি। কলকাতা শহরে পাড়ায়-পাড়ায় অলি-গলিতে কম্পিটিশন দিয়ে সরস্বতী পুজো হয়। লাউড স্পীকারে ঘুম তাড়ানো মাসিপিসির আধুনিক গান আর বিসর্জনের দিন রাস্তায় লরীতে 'সরস্বতী মাঈ কী জয়' ধ্বনির সঙ্গে রকবাজদের রক-এন-রোল নাচের মাতামাতি দেখে বড়োদের নিন্দে করে বলতে শুনেছি—'আজকালকার ছোঁড়াগুলো গোল্লায় গেছে। বইয়ের সঙ্গে সারা বছর সম্পর্ক নেই, শুধু পুজোর নামে চাঁদা আদায় আর হই-হল্লা।' কিন্তু সরস্বতীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব নিয়ে বড়রা প্রতি বৎসর কলকাতা শহরে পাড়ায় পাড়ায় যে কাণ্ডটা করেন তার নিন্দা করে কে। সেখানেও সেই চাঁদা আর হই-হল্লা। ছোটরা তো বড়দের দেখেই শেখে।

শহরে উৎসবের নামে যে ভিড়, কোলাহল আর উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় তাতে শ্রদ্ধার চেয়ে উন্মত্ততাই থাকে বেশী। উৎসব সুন্দর না হয়ে বিকৃত হয়ে পড়ে। শহুরে উৎসবে এই রুচির বিকার রবীন্দ্রনাথের মনকে পীড়া দিত, তিনি এড়িয়ে চলতেন। একটি ছোট্ট ঘটনা বলি।

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের জয়ন্তী উপলক্ষে স্থির হয়েছে কলকাতায় খুব ঘটা করে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। প্রস্তাবটা যখন তাঁকে দেওয়া হল তিনি কিছুতেই সম্মতি দিতে রাজী হলেন না। নাগরিক সম্বর্ধনাকে তাই ঠাট্টা করে বলতেন সং বর্ধনা। অর্থাৎ ওখানে গিয়ে সং সাজতে ওঁর আপত্তি। অবশেষে রবির কাছে আবেদন নিয়ে দুই চন্দ্রের উদয় হল। জগদীশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। প্রথম জন রবীন্দ্রনাথের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, দ্বিতীয়জন সমধর্মী অনুজ-সাহিত্যিক। এঁদের অনুরোধ এড়াতে পারলেন না, মত দিতেই হল। মত দেবার পর থেকেই দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সত্তর বৎসরের জয়ন্তী উৎসবের উদ্যোগ আয়োজনের খবর যত আসছে ততই তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়ছেন।

সেই সময় কবি নিশিকান্তর প্রায়ই ডাক পড়ত। নিশিকান্তকে রবীন্দ্রনাথ স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। নিশিকান্তর দুটি পরিচয়। কাব্যরসিক ও ভোজন-রসিক। দুটির প্রতিই তার সমান আগ্রহ, পাল্লায় এদিক ওদিক হবার জো নেই। নিশিকান্তকে ডেকে এনে দুটি রসেরই যোগান দিতেন রবীন্দ্রনাথ, নিশিকান্ত ধ্যানস্থ হয়ে দুটি রসই সমান উপভোগ করত।

কবিগুরুর সত্তর বছরের জয়ন্তীর সময় নিশিকান্ত শান্তিনিকেতনে ছিল, তখনও পণ্ডিচেরী যায় নি। জয়ন্তীর মাসখানেক আগে—তখনও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেই সময়ে রোজ সকালে নিশিকান্তকে যেতে হত তাঁর কাছে। না গেলে, একান্ত ভৃত্য বনমালীকে দিয়ে পাকড়াও করাতেন, কখনও বা একান্ত সচিব অমিয় চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে দিতেন নিশিকান্তর ঘরে, তাকে উত্তরায়ণে হাজিরা দেবার জন্যে। হাজিরা দিতে হত।

একদিন সকালে নিশিকান্তর ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছি, এমন সময় উত্তরায়ণের সাইকেল-বেয়ারা চতুর এসে নিশিকান্তকে বললে—'শিগগির চলুন, বাবুমশাই আপনাকে ডাকছেন।'

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তলব এসেছে। আমার দিকে তাকিয়ে নিশিকান্ত বললে—'তুই-ও চল্, আজকাল গেলেই গুরুদেব সন্দেশ খাওয়ান, বড় বড় সাইজের।'

এসব ব্যাপারে আমি তো এক পা তুলেই আছি। দুজনে গুটিগুটি উত্তরায়ণে গিয়ে হাজির।

নিশিকান্তকে দেখা মাত্রই উৎফুল্ল হয়ে বললেন—'এই যে কান্তকবি, তোরই প্রতীক্ষায় বসে আছি। এই দ্যাখ, কত কবিতা এসেছে।'

জয়ন্তী উপলক্ষে আসা বহু বাঙালী কবির কবিতা রবীন্দ্রনাথ একে-একে নিজেই পড়ে শোনাতে লাগলেন। ওদিকে বনমালী ততক্ষণে এক প্লেট মেঠাই সামনে ধরে দিয়েছে, কবিতা শুনতে শুনতেই তার সদ্ব্যবহার চলছে।

কবিতা পড়া শেষ হলে পর একটি চিঠি আমাদের পড়ে শোনালেন, কলকাতাবাসী একজন রবীন্দ্র-ভক্ত তাঁকে চিঠিতে দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে জানিয়েছেন যে, কলকাতায় জয়ন্তীর আয়োজন কী ঘটা করেই না হচ্ছে। টাউন হলে বিরাট মিটিং-এর আয়োজন, কলকাতায় শতাধিক বিখ্যাত ব্যক্তির স্বাক্ষর করা মানপত্র, কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান মাল্যদান করবে ইত্যাদি এক বিরাট তালিকা।

চিঠিটা পড়া শেষ করেই রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'আমার জয়ন্তী এই শান্তিনিকেতনে মানাত ভালো। আমি যে নিসর্গ প্রকৃতির শোভা ভালবাসি, স্বভাবসুন্দরীই যে আমার 'মানসসুন্দরী', তা কে না জানে? একটি ছোট মেয়ে আমাকে মালা-চন্দন দেবে, তোরা সকলে পুষ্পার্ঘ্য দিবি, শাস্ত্রীমশাই আর ক্ষিতিবাবু মন্ত্রপাঠ করবেন, গানের দল গান করবে। কেউ

হয়তো একটা কবিতা আবৃত্তি করল। শঙ্খ বাজল, ঘৃত-প্রদীপও আছে। ধূপের গন্ধের সঙ্গে ফুলের গন্ধে মিশে রইল আমার জন্মদিন।'

বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন কবিগুরু। কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন—'ঐ পারুলডাঙার মাঠের পূর্বাকাশে—ঐ দিগন্তে যেমন করে দেখতে পাই আমার জীবনের প্রতীক প্রভাত সূর্য, তা কি কলকাতা শহরের সৌধে বসে দেখতে পাবো? রাজ অট্টালিকার চেয়ে আমার সীমের লতার বেড়ায় ঘেরা শ্যামলী কুটীরই ভালো। মহানগরীকে আমি 'পাষাণগড়া' 'পাষাণকারা' বলেছি আর এখন সেই মহানগরীতেই আমার জন্মজয়ন্তী করার জন্য বিপুল অয়োজন চলছে।'

আপনমনে কথাগুলি বলে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। এ-আক্ষেপ আমাদের বলছিলেন তা নয়। তিনি যেন নিজের মধ্যে নিজেকেই বলছিলেন, খুব তন্ময় হয়েই বলেছিলেন।

এই ঘটনার উল্লেখ করার একটা কারণ আছে। কলকাতা শহরে পল্লীতে-পল্লীতে পাল্লা দিয়ে যখন রবীন্দ্র জন্মোৎসবের নামে নাচ-গান-হল্লার হিড়িক চলে সেই সময় আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালনের একটি সুন্দর দিন। তারই ছবি আজ এখানে তুলে ধরছি।

•

শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের খুব মন খারাপ। সত্তর বছরের জন্মোৎসব হবে কলকাতায়। রাজধানীর জনারণ্যে তাদের স্থান কোথায়? ছেলেমেয়েদের মুখে নীরব প্রতিবাদের ছায়া, চৈত্রের আম্রকুঞ্জে আর শাল বীথিকায় মৌমাছির গুঞ্জন শোনা যায় না। তাদেরও বুঝি অভিমান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন এদের বঞ্চিত করে জয়ন্তী উৎসবের আনন্দই অর্থহীন। ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন—'যে-মাসে আমি জন্মেছি সেই মাসের প্রথম দিনের সূর্যোদয়কে তো তোরা নববর্ষের উৎসবে আহ্বান জানাস, এবার তার সঙ্গে আমার জন্মোৎসবটাও জুড়ে দে।'

আজ নববর্ষ, আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব। রাত্রির অন্ধকার তখনও দূর হয় নি। পূর্ণচন্দ্রের ম্লান আলো ঘুমন্ত আশ্রমের উপর স্বপ্নজাল রচনা করছে। ঘুমভাঙা দু-একটি প্রভাত-পাখির ক্লান্ত কাকলীতে আম্রকুঞ্জ মুখরিত। এমন সময় বালক বালিকাদের সমবেত কণ্ঠের বৈতালিক গান আশ্রমের

একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে নীল আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। বৈতালিকদল আশ্রমের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে গান গাইলে—

"জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়।
পূর্বদিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ময়।

* * *

এস নব জাগ্রত প্রাণ,
চির যৌবন জয়গান।
এস মৃত্যুঞ্জয় আশা,
জড়ত্বনাশা,
ক্রন্দন দূর হোক্ বন্ধন হোক্ ক্ষয়॥"

নিদ্রামগ্ন আশ্রমবাসীকে জাগিয়ে দিয়ে বৈতালিক গান থেমে গেল। অন্ধকার দূর হয়েছে, প্রভাতারুণের কিরণসম্পাতে শাল বীথিকার নবীন কিশলয় হিল্লোলিত, বিহঙ্গম গীতছন্দে আমলকী কানন মুখরিত। আশ্রমের ছাত্রছাত্রী ও শিশুদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছে, আজ নববর্ষ, আজ গুরুদেবের জন্মোৎসব।

মন্দিরে ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং ঢং। আশ্রমের অধিবাসীরা দলে দলে আসছে, গায়ে তাদের বাসন্তী রঙের চাদর, মেয়েদের পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি। আশ্রম বালকরা সার বেঁধে নিঃশব্দে নম্রপদক্ষেপে মন্দিরে প্রবেশ করল, প্রবেশদ্বারে একটি বালিকা ফুল দিয়ে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে দিল সবার কপালে। মন্দিরের ভিতর জনসমাগমে পূর্ণ, রবীন্দ্রনাথের আগমন প্রতীক্ষায় সবাই উদ্‌গ্রীব।

সহসা ঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ। অদূরে শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত রবীন্দ্রনাথের ঋষিসদৃশ সৌম্য শান্তমূর্তি দেখা দিল। বার্ধক্যের ভারে শরীর অনেকখানি ভেঙ্গে পড়েছে, তবু অনেকখানি পথ হেঁটে এসে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন, আশ্রমবাসী নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানাল। চন্দন রেখাঙ্কিত প্রশস্ত ললাট, কণ্ঠে শ্বেতপুষ্পের মালা। উপাসনার বেদীতে উপবেশন করলে কয়েকজন বালক-বালিকা মিলিত কণ্ঠে গান ধরলেন—

"তব অমল পরশ-রস শীতল শান্ত
পুণ্যকর অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি' হৃদয়
মাঝে মম চাও।"

সূর্যের রক্তিম আলোয় ধীরে পূব আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, দিনের প্রথম রশ্মি নববর্ষের আশীর্বাদ বহন করে কবিগুরুর শুভ্রললাট স্পর্শ করল। গান শেষ হলে উৎসবের সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

'মানুষের পক্ষে উৎসবের বিশেষ উপযোগিতা আছে। প্রতিদিনের কাজের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মানুষ যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তখন এই ধরনের উৎসবানুষ্ঠান তাকে জীবনের প্রকৃত সত্তা স্মরণ করিয়ে দেয়।'

রবীন্দ্রনাথ উদাত্ত কণ্ঠে উপাসনার শেষ মন্ত্র উচ্চারণ করে থামলেন, গানের দল গেয়ে উঠল :

'সবাই যারে সব দিতেছে
তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।
কবার আগে চাবার আগে
আপনি আমায় দেব মেলি।'

বাউল সুরের গানটির মধ্যে আত্মনিবেদনের যে-মন্ত্র মূর্ত হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ নিমীলিত নয়নে তা উপলব্ধি করেছিলেন।

উপাসনার শেষে সাদর সম্ভাষণ ও কোলাকুলির সাড়া পড়ে গেল। ছাত্ররা অধ্যাপক ও গুরুজনদের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, গুরুজন সহাস্যমুখে ছাত্রদের আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। সহকর্মীরা পরস্পরকে অভিবাদন জানিয়ে আলিঙ্গন করছেন।

আশ্রমবাসী ও অতিথি অভ্যাগত বহু নরনারী একে একে আম্রকুঞ্জে এসে সমবেত হল।

আম্রকুঞ্জের খানিকটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ গেরুয়া মাটি দিয়ে লেপন করা, তাতে সুনিপুণ হাতের আলপনা আঁকা। অগুরু ধূপের স্নিগ্ধ গন্ধে প্রভাত সমীরণ আমোদিত। সুসজ্জিত বেদীতলে রবীন্দ্রনাথ এসে উপবেশন করলেন। আশ্রমের সংস্কৃত পণ্ডিতরা স্বস্তিমন্ত্র পাঠ করার পর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের জনকয়েক বালকবালিকা নিজেদের হাতের তৈরী নানা শিল্প-দ্রব্য ও চিত্র অর্ঘ্য সাজিয়ে তাদের প্রিয় গুরুদেবকে উপহার দিল। চীন, তিব্বত ও সিংহল থেকে সাধুরা এসেছেন শান্তিনিকেতনে। একে একে তাঁরা নিজেদের ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করে কবিগুরুর শতায়ু কামনা করলেন।

ভারতের বাইরে থেকে এসেছেন এই সব সন্ন্যাসী, তাঁদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অভিভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

'এমন একদিন ছিল, যখন বহু বাধা অতিক্রম করেও প্রেমের বাণী ভারত থেকে বিশ্বের মানবের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ আবার আপনাদের দেশের অধিবাসীবৃন্দ আমার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশবাসীর কাছে প্রেমের বাণী ও প্রীতি-উপহার বহন করে এনেছেন—এজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।'

জন্মোৎসব অনুষ্ঠান শেষ হলে আশ্রমের অধিবাসীবৃন্দ সম্মিলিতকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

'আমাদের শান্তিনিকেতন,
সে-যে সব হতে আপন।'

সুমধুর কণ্ঠের এই গানের মধ্য দিয়ে আশ্রমবাসীদের প্রাণের আবেগ ও ভক্তি ফুটে উঠেছিল। এই আশ্রম তাদের একান্ত আপনার, এখানকার শ্যামল প্রান্তর, উন্মুক্ত নীলাকাশ, আম্রকুঞ্জে আলোছায়ার খেলা, বসন্তের পুষ্পমঞ্জরী এদের মনকে আকর্ষণ করে। যিনি এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, এই বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ তাদের সেই গুরুদেবকে আশ্রমবাসীরা শুধু শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখে নি, প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে একান্ত আপনার জন বলে মনে করে। সকলের মধ্যে থেকে সবার অন্তরে তিনি আশা, উৎসাহ ও আনন্দরসের যোগান দিয়ে থাকেন। ইনিই সেই শারদোৎসবের ঠাকুরদা, যাঁকে না হলে ছেলেদের খেলা জমে ওঠে না।

শাল বীথিকার মাথার উপর সন্ধ্যার চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ, তার স্নিগ্ধ কোমল রশ্মি নব-অঙ্কুরিত কচি পাতায় নৃত্য করে ফিরছে। আশ্রমের মাঝখানে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আলিম্পন অঙ্কিত একটি স্থান, নৃত্যের আসর। পাশেই গায়ক-গায়িকাদল বাদ্যযন্ত্র নিয়ে উপস্থিত, দর্শকদল নাটমঞ্চের চারদিকে গোল হয়ে বসে গিয়েছে। এমন সময় রবীন্দ্রনাথ আসরের একধারে আপন স্থানে উপবেশন করতেই একটি আশ্রম-কন্যা অপূর্ব সুধাকণ্ঠে গেয়ে উঠল :

'যা পেয়েছি প্রথম দিনে
সেই যেন পাই শেষে,
দু'হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই
শিশুর মত হেসে॥'

মাথার উপর সীমাহীন আকাশ, চন্দ্রালোকে চারিদিক প্লাবিত। গানের সুর দক্ষিণের মাতাল সমীরণের সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে।

গানের পর শুরু হল নৃত্যের পালা। তিনটি ছোট্ট মেয়ে খোলের তালের সঙ্গে আলপনা-আঁকা প্রাঙ্গণে আপন মনে নাচতে লাগল যেন চাঁদের দেশের তিনটি পরী মর্ত্যের মাটিতে নৃত্যরতা।

এরপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু পুরাতন রচনা 'সতী' কবিতা আবৃত্তি করলেন। আবৃত্তি শেষ হলে আরম্ভ হল বড়দের নাচ। নৃত্যের আখ্যানবস্তু দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা। গভীর অরণ্যে রাজা দুষ্মন্ত শিকার করে ফিরছেন, এমন সময় দেখলেন সখী পরিবৃতা শকুন্তলা আলবালে জলসেচন করছেন, পুষ্প চয়ন করে মালা গাঁথছেন, আশ্রম হরিণ-হরিণীকে আদর করছেন। সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে নূপুরনিক্কণে, সাবলীল দেহভঙ্গিমায়, মৃদঙ্গের তালে তালে দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রথম পরিচয় ও প্রেমের পরিণতির আখ্যানবস্তু নৃত্যছন্দে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। একে একে নৃত্যরতা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে নিয়ে বিদায় হল, দুষ্মন্তও চলে গেলেন। শূন্য আসরে তখনও সেতারে বসন্ত-বাহারের সুর ভেসে আসছে।

শান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে একটি জন্মোৎসবের ছবি, যা আমার স্মৃতিপটে আজও অম্লান রয়েছে, আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম।

কোন-কোন ব্যক্তি সখেদে বলেছেন, এ-যুগে এই পৃথিবীতে জন্মে পদাঘাতই শুধু তাঁরা পেয়েছেন। আমি তাঁদের করুণা করি। আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে এই পৃথিবীতে জন্মে তুমি কি পেলে? আমার উত্তর—রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ।

আমি রবীন্দ্র-যুগে জন্মেছি, রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেয়েছি। আমার এই লেখার পাঠকদের মধ্যে যাঁরা এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত তারা হয়তো আমাকে ঈর্ষা করবেন, কিন্তু তার কোন হেতু নেই। সৃষ্টিকর্তা আপন সৃষ্টির মধ্যেই স্বপ্রকাশ। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়।

তবু হয়তো অনুশোচনা নিয়ে প্রশ্ন করবেন—'আপনার মত চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য তো আমাদের হল না।'

নাই বা হল। পঁচিশে বৈশাখ একটি পবিত্র দিন। মহানগরীর কলুষতার

মধ্যে সেদিনটি না কাটিয়ে চলে যান শান্তিনিকেতনে। পূর্বপল্লীর প্রান্তে পারুলডাঙার মাঠে প্রভাত-সূর্যের প্রথম প্রকাশকে ধ্যানসমাহিত চিত্তে দেখুন, আদিত্যবর্ণ এক মহান পুরুষকে দেখতে পাবেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথ।

॥ ২৩

অনেকদিন আগে এই বৈঠকেই কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে শেষ মুহূর্তে শারদীয়া সংখ্যায় একটি গল্প লিখে আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। আর সে কী গল্প! থিরবিজুরী। যে-গল্প সে বছরের শারদ সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প বলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সে-গল্প লেখার পিছনে যে কাহিনী আছে তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি বিস্ময়কর। আর সুবোধবাবুর স্থৈর্য ও সংকল্পের যে পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম তা আজও আমার কাছে অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হয়, অলৌকিকও বলতে পারেন। সেই কাহিনীই আপনাদের কাছে আজ বলতে বসেছি।

ভাদ্র মাস হতে চলেছে, তখনও শেষ বর্ষণের পালা চোকে নি। বর্মণ স্ট্রীটের অফিসের এক প্রান্তে সুবিশাল কদম গাছে প্রস্ফুটিত কদম্বের সমারোহ। সেদিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি যে যেত না তা নয়, কিন্তু পরক্ষণেই সে-দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হত পুঞ্জীভূত প্রুফের গাদায়। পূজা সংখ্যার কাজের তাড়া ও দুশ্চিন্তা যখন ঘাড় ও মগজে বোঝার মত চেপে আছে তখন কলকাতা শহরের বড় বাজারে বসে কদম ফুল আর সজল মেঘের ছায়া দেখাটা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পূজা সংখ্যার কাজ তখন চরমে উঠেছে। প্রায় একমাস ধরে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা কাটে একটা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। অমুক লেখকের লেখা এখনও এসে পৌঁছল না। লেখা এসে পৌঁছল তো কম্পোজ দিতে দেরি করছে। ওদিকে আর্টিস্টের কথা ছিল আজ বিকেল পাঁচটার মধ্যে গল্পের ছবি ও হেডপীস্ দিয়ে যাবার, তারও দেখা নেই। এদিকে গৌরাঙ্গ প্রেসের ম্যানেজার প্রভাতবাবু টেলিফোনে তারস্বরে চিৎকার করে বলছেন—'এখনও ফর্মা পাঠালেন না? মেশিন খালি বসে আছে, ফর্মা ঠিক মতন না পেলে এত ইম্প্রেশন আমি কী করে দেব? পূজা সংখ্যা আর বেরবে না।'

সারাদিনের ধকলের পর আমাদের সকলেরই মেজাজ প্রায় সপ্তমে চড়ে থাকে। তার উপর গৌরাঙ্গ প্রেসের এই ভয় আর আতঙ্ক মিশ্রিত 'গেল গেল' রব শুনলে কার না খারাপ লাগে। অগত্যা প্রভাতবাবু যে পর্দায় গলা চড়িয়ে চিৎকার করছেন প্রায় তার কাছাকাছি আমার গলাটা চড়িয়ে বললাম—

'আমাকেই বারবার ফর্মার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন কেন? আগে তো আপনারা মেল ট্রেনকেই পাস করাবেন, তার পরে তো এক্সপ্রেস। আনন্দ বাজারের কি সব দেওয়া হয়ে গিয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতবাবুর স্বর নেমে গেল। বললেন—

'জানেন তো সব। সুবোধবাবুর গল্প এখনও লেখা হয় নি। আজ রাত্রে বসে গল্প লিখবেন, সারারাত কম্পোজ হবে, মেক-আপ হবে, কাল ভোরে ফর্মা পাঠাবেন। ইতিমধ্যে আপনার একটা ফর্মা পেয়ে গেলে কাজ এগিয়ে রাখতে পারতাম।'

আমি কি আর জানি না? হাড়ে হাড়ে জানি, মজ্জায় মজ্জায় জানি। আজকের মতন পূজা সংখ্যা বা সাপ্তাহিক সংখ্যা সেদিন রোটারি মেশিনে ছাপা হত না। আট পৃষ্ঠার ফর্মা কম্পোজ ও মেক-আপ করে গৌরাঙ্গ প্রেস-এ পাঠাতে হত, তাঁরা ফ্ল্যাটবেড মেশিনে তা ছেপে দিতেন। একালের মত একসঙ্গে বত্রিশ পাতা রোটারি মেশিনে ছাপা হত না বলে ঠিক সময় মত লেখা, কম্পোজ, ইলাস্ট্রেশন ব্লক ও বিজ্ঞাপনের যোগান না পেলে কাজ যেত বানচাল হয়ে এবং প্রেসের সঙ্গে নিত্য ঝগড়া লেগেই থাকত।

তখন রীতি ছিল আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার শেষ ফর্মা প্রেস-এ পাঠাবার চব্বিশ ঘণ্টা পর, অর্থাৎ তার পরের দিন 'দেশ'-এর শেষ ফর্মা প্রেসে পাঠানো হত। এই দুটি পত্রিকারই শেষ ফর্মা ছিল গোড়ার দিকে সুবোধবাবুর গল্পের আট পৃষ্ঠা। সুবোধবাবুর ছিল ওই এক অভ্যেস, শেষ মুহূর্তের চাপ না পড়লে গল্প লিখতেই পারতেন না। কম্পোজিটর, প্রিণ্টার, মেক-আপ ম্যান ছাপাখানা প্রভৃতি সবারই জানা ছিল যে শেষ ফর্মা ধরা আছে সুবোধবাবুর জন্যে এবং শেষ মুহূর্তে সুবোধবাবুর লেখা নিয়ে দুই পত্রিকায় দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে যাবে। প্রতি বছরেই পূজা সংখ্যার হিড়িক শুরু হবার আগেই সুবোধবাবুকে গিয়ে বলি 'এবার কিন্তু আপনাকে আগেই গল্প দিতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে সুবোধবাবু জানিয়ে দেন—'নিশ্চয়,

নিশ্চয়। এবার আগেই লিখব। শেষ মুহূর্তে লিখি বলে আপনাদের অসুবিধা, আর আমিও গল্পটা যে-ভাবে গুছিয়ে লিখব বলে আরম্ভ করি তা আর হয় না, কোন রকমে শেষ করতে হয়।'

আমরা জানি, সুবোধবাবুর সদিচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত আর আগে গল্প লেখা হয়ে ওঠেনা। অন্তত গত বাইশ বছর ধরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম একবারও হয় নি।

সে-সময়ে প্র-না-বি আনন্দবাজার পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের কাজ করতেন। পূজার লেখার কথা স্মরণ করিয়ে যখন তাঁকে বলতাম—'বিশীদা, আপনার লেখাটা কবে দিচ্ছেন ?'

বরাভয়ের মুদ্রায় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে বলতেন—'ভয় নেই, সুবোধের আগে পাবে।'

আজও বিশীদার কাছে যখনই পূজা সংখ্যার লেখা চাই—ওই একই উত্তর দিয়ে থাকেন। পূজা সংখ্যার কাজের শেষ দিনটা সুবোধবাবুকে যেমন উদ্বেগের মধ্যে কাটাতে হয়, তার চেয়ে বেশী উদ্বেগের মধ্যে কাটাতে হয় আমাদের।

পত্রিকার সার্কুলেশন ম্যানেজার সদাব্যস্ত ভূপেনদা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকেই ফেটে পড়লেন। চুল উস্কোখুস্কো, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। বললেন—

'আপনাদের জন্যই পূজার আগে পূজা সংখ্যা বেরোবে না। ফর্মা পাঠান নি, প্রেসের মেশিন খালি বসে আছে, এদিকে দশটা দপ্তরীকে কাজ দিয়েছি, তারাও হাত গুটিয়ে বসে। আমার কেবল ছুটোছুটি করাই সার।'

ওদিকে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী সুরেশচন্দ্র মজুমদার মশাই সাফ জবাব দিয়েছেন, মহালয়ার আগের দিন যদি পূজা সংখ্যা না বেরোয় সে পত্রিকা তিনি আর বাজারে বের করবেন না, অফিসের গেট-এর সামনে ডাঁই করে পেট্রল দিয়ে সব কাগজ পুড়িয়ে ফেলবেন।

সে-যুগে প্রতি বৎসর শারদীয়া সংখ্যা নিয়ে শেষ দিনে এই ধরনের হই-হল্লা, চেঁচামেচি, লম্ফঝম্ফ, শোরগোল বাঁধা বরাদ্দ ছিল। আর এ-সব না হলেও যেন ভাল লাগত না। শারদীয়া সংখ্যার কাজ অথচ চেঁচামেচি নেই, এ-যেন সেদিন আমরা কল্পনাই করতে পারতাম না। বিয়ে বাড়িতে শোরগোল না হলে যেমন তা বিয়ে-বাড়ি বলে মনে হয় না, আমাদের পূজা সংখ্যার কাজ খানিকটা ছিল সেই জাতের। এরও একটা উত্তেজনার দিক ছিল এবং সে

উত্তেজনারও একটা নেশা ছিল। আজকের মত ঘড়ি-ধরা নিয়মবাঁধা নির্বিঘ্ন পূজা সংখ্যার কাজ সেদিন ছিল না বটে, কিন্তু সেদিনের উন্মাদনার যে একটা আনন্দ ছিল আজ আমরা তা থেকে বঞ্চিত।

আবার সুবোধবাবুর কথাতেই ফিরে আসি। সুবোধবাবু আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, (যেমন প্রতি বৎসরই দেন) যে ওঁর গল্পের জন্য আট পৃষ্ঠা অর্থাৎ এক ফর্মা জায়গা রেখে দিতে। কম্পোজ করার পর যদি দেখা যায় গল্প আট পৃষ্ঠার ছোট হয়ে যাচ্ছে, বাড়িয়ে দেবেন, বড় হয়ে গেলে কেটে ছোট করে দেবেন। এদিকে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়ে আছে। গল্পের দেখা নেই কিন্তু আর্টিস্টকে দিয়ে হেডপীসের ছবি ও গল্পের নাম আঁকিয়ে ব্লক পর্যন্ত তৈরী।

গৌরাঙ্গ প্রেসের প্রভাতবাবুর টেলিফোন পাবার পর উদ্বেগ বেড়ে গেল। ওদিকে আনন্দবাজারের গল্প লেখা শেষ না হলে দেশ-এর গল্পে হাত দেবেন না—এটা জানা কথা। তাই আনন্দবাজার পূজা সংখ্যার সম্পাদক মন্মথবাবুকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনার কতদূর ?'

মন্মথবাবু বললেন—'সুবোধবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করছেন তো ? আনন্দ-বাজারের সম্পাদকীয় লেখা শেষ করে সন্ধ্যের পর পূজার গল্পে হাত দেবেন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম—'সে কী, এখনও গল্পে হাত দেন নি ? তা হলে তো আজ সারারাত আপনার দুর্ভোগ আছে।'

মন্মথবাবু হেসে বললেন—'কোন্ বছরই বা না থাকে। কাল ভোর ছ-টার মধ্যে ফর্মা পাঠাতে হলে সারারাত সুবোধবাবুর সঙ্গে জেগে কাটাতে হবেই।'

আমি বললাম—'আপনারই যখন এই অবস্থা তখন আমার কী হবে বলুন তো ?'

মন্মথবাবু হেসে বললেন—'আমি একাই শুধু রাত জাগব আপনি জাগবেন না, তা কি হতে পারে ?'

আমিও মনে মনে ভাবলাম কথাটা ঠিক। শেষ দিনের অহোরাত্র জাগরণ দুজনের ভাগ্যে লেখা যখন আছে—খণ্ডন করবে কে ? সেদিনের মত পূজা সংখ্যার কাজ চুকিয়ে রাত ন-টার সময় উঠে পড়লাম।

বাড়ি ফেরার পথে একবার ভারতী সিনেমায় ঘণ্টা তিনেক কাটাতে হবে। তানসেন সংগীত সম্মেলন চলেছে, বড় বড় ওস্তাদদের গানবাজনার

আসর। সংগীত সম্মেলনের মরসুমে এ-ধরনের আসরে প্রতিরাত্রে একবার ঢুঁ মারা আমার বরাবরের অভ্যাস।

অফিস থেকে বেরোবার সময় তিন তলায় মন্মথবাবুর ঘরে উঁকি মেরে দেখি সুবোধবাবু বসে আছেন, টেবিলের উপর সাদা প্যাড, তাতে একটিও কালির আঁচড় পড়ে নি। কলমটা খোলা অবস্থাতেই পাশে শোয়ানো। একটা সিগারেট ধরিয়ে রাত্রির আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে চুপচাপ বসে। ঠোঁটের কোণায় ধরে রাখা সিগারেটটা আপনিই পুড়ে চলেছে। পাশের টেবিলে মন্মথবাবু ও তাঁর সহকারী কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একমনে কি একটা লেখার পেজ প্রুফ দেখছেন। ঘরের এক কোণে কয়েকটা মাটির ভাঁড় আর শালপাতা দেখেই অনুমান করলাম আমজাদিয়া হোটেল থেকে মাংসর চাঁপ আর রুটি এসেছিল, তিনজনেরই রাত্রের আহার সমাধা হয়েছে। আমার তাগাদা নিয়ে এই সময় সুবোধবাবুর কাছে উপস্থিত হওয়াটা সমীচীন বোধ করলাম না। নিঃশব্দে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

পরদিন একটু তাড়াতাড়িই অফিসে হাজির হয়েছি। বেলা প্রায় দশটা হবে। অফিসে ঢুকেই দেখি গেট-এর কাছে মন্মথবাবু দাঁড়িয়ে। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মুখে চোখে থমথমে গাম্ভীর্য। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রিক্‌শায় ফর্মা তোলাচ্ছেন গৌরাঙ্গ প্রেস-এ পাঠাবার জন্য।

আমাকে দেখেই মন্মথবাবু যত রাগ আর বিরক্তি এতক্ষণ পুষে রেখেছিলেন তা প্রকাশ করে ফেললেন।

'দেখুন মশাই, এই গৌরাঙ্গ প্রেস সকাল থেকে টেলিফোন করে করে আমাকে পাগল করে তুলেছে।'

আমি সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম—'ওদের তো ওই এক কথা, ফর্মা চাই এবং এক্ষুনি চাই।'

মনে মনে আমিও প্রমাদ গণলাম। কাল সকালে ঠিক সময়ে ফর্মা না পাঠাতে পারলে আমাকেও তো একই অবস্থায় পড়তে হবে। রাত্রি জাগরণ, মানসিক উদ্বেগ, সব মিলিয়ে মন্মথবাবুর চেহারা দেখে আগামীকাল সকালের আমার অবস্থাটা কল্পনা করে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। রিক্‌শা করে ফর্মা রওনা করে দিয়ে মন্মথবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মুক্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—

'যাক, কন্যাদায় এ বছরের মত চুকল। এবার গঙ্গাস্নান করে বাড়ি যাওয়া যাক।'

কাতরকণ্ঠে আমি বললাম—'আপনি তো ভালয় ভালয় চুকিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার কি উপায় হবে বলুন তো?'

মন্মথবাবু এখন মুক্তপুরুষ, তাই আমার প্রতি প্রচুর সহানুভূতি আর সান্ত্বনা ঢেলে বললেন—'ও কিচ্ছু ভাববেন না। সুবোধবাবু ভোর ছটায় ওঁর গল্পের ফাইন্যাল প্রুফ দেখে দিয়ে বাড়ি চলে গেছেন। ঘণ্টা তিন চার ঘুমিয়ে চান-খাওয়া করেই আবার অফিসে আসবেন। আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় কিছু লিখবার যদি থাকে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুকিয়ে দিয়েই আপনার গল্প লিখতে বসবেন একথা বলে গেছেন।'

চব্বিশ ঘণ্টা আগে মন্মথবাবুর মানসিক উদ্বেগের অবস্থাটা আমার জানা আছে। সুতরাং ওঁর অভয়বাণীতে খুব বেশী ভরসা করতে পারছিলাম না। প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়েই নিজের ঘরে গিয়ে বসলাম। পূজা সংখ্যার আর যা-কিছু টুকিটাকি কাজ তা চুকিয়ে রেখে শুধু সুবোধবাবুর প্রত্যাশিত গল্পের আট পৃষ্ঠার গোড়ার দিকের ফর্মাটা জগদ্দল পাথরের মত গলায় ঝুলে রইল।

বেলা একটার সময় সুবোধবাবু অফিসে এসে হাজির। তিনতলায় নিজের ঘরে যাবার আগে দোতলার পূর্বপ্রান্তে আমার ঘরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেলেন। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ, সকালে কিছুক্ষণ যে ঘুমোতে পেরেছেন, মনে হল না।

আমি বললাম—'আপনার চেহারা বড়ই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কাল সারারাত পরিশ্রম করেছেন, সকালে ঘুম হয় নি বোধ হয়?'

সুবোধবাবু বললেন—'কি করে হবে। আনন্দবাজারের গল্পটা যে ভাবে ফেঁদে ছিলাম, লিখতে লিখতে বড় হয়ে গেল। ওদিকে হেডপীস্ আর কিছু বিজ্ঞাপন আছে, আটপাতায় ধরে না। শেষকালে অনেক বাদছাদ দিয়ে ধরাতে হল। তাই মনে একটা খুঁত থেকে গেছে, সেই চিন্তাতেই ঘুম আর হয় নি।'

চোরের মন যেমন বোঁচকার দিকে থাকে, আমার চিন্তা কেবল দেশ পত্রিকার গল্পের জন্য। আমি বললাম—'দেশের গল্পটা আজ বিকেলেই লিখতে শুরু করবেন তো? আমি প্রিণ্টারকে বলে কম্পোজের সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি, এখন কপি দিলেই হয়।'

সুবোধবাবু বললেন—'যাই, তেতালায় গিয়ে দেখি দৈনিকের জন্য আমার

কি লেখা আছে। যদি যৎকিঞ্চিৎ লিখতে দেয় তাহলে বেঁচে যাই। তাড়াতাড়ি শেষ করেই আপনার লেখায় হাত দেব।'

এক কাপ চা আর সিগারেট খেয়েই স্থবোধবাবু নিজের ঘরে চলে গেলেন—আমিও খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম যে আজ বিকেল থেকেই প্রেস্-এ কপি ধরাতে পারব। রাত বারোটা একটার মধ্যেও যদি স্থবোধবাবু লেখা শেষ করে দেন তাহলে কাল ভোর ছটার মধ্যে গৌরাঙ্গ প্রেস-এ ফর্মা পাঠাতে বেগ পেতে হবে না।

বিকেল পাঁচটার সময় আমার ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। স্থবোধ বাবুর টেলিফোন। বললেন—'একবার উপরে আসতে পারবেন?'

টেলিফোন রেখেই তিন তলায় ছুটলাম। তা হলে গল্প লেখা শুরু হয়ে গেছে, প্রেস্-এ কপি দেবার জন্যই ডাকছেন। ঘরে ঢুকে দেখি স্থবোধবাবুর মুখ গম্ভীর, থমথমে, চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। বুঝলাম আমার অনুমান সম্পূর্ণ মিথ্যে।

স্থবোধবাবু কাতর কণ্ঠে বললেন—'কি করি বলুন তো?'

—'কেন, কী হল?'

'—আমাদের এখানে আজ অমলেন্দুবাবুর অফ ডে, ব্রজেনবাবু অসুস্থতার জন্য আসতে পারেন নি। চপলাবাবুর আজ আবার কোথায় সভা আছে, সেখানে গেছেন আমার উপর প্রথম সম্পাদকীয় লেখার ভার দিয়ে। কোনও রকমে সেটা এইমাত্র শেষ করেছি, কিন্তু মাথা অত্যন্ত ভার হয়ে আছে, যন্ত্রণাও হচ্ছে। আপনার গল্প শুরু করব বলে এতক্ষণ ভাবছিলাম, কিন্তু মাথার এমন অবস্থা যে কিছুই ভাবতে পারছি না। আপনিই একটা উপায় বলে দিন।'

একথা শোনার পর নিজেই যখন অগাধ জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি তখন আরেকজন হাবুডুবু খাওয়া লোককে উদ্ধার করি কী প্রকারে। কিন্তু স্থবোধ বাবুর চেহারার ওই অবস্থা দেখে ওর উপর জোরজবরদস্তি করতে নিজেরই মায়া হল।

আমার সমস্যা হল স্থবোধবাবুর গল্প আজই যদি কম্পোজ করতে না দিতে পারি তাহলে গল্পই বাদ যায়। তার পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থাই বা শেষ মুহূর্তে করি কি ভাবে। সামনের দিকের ফর্মা, সেখানে একজন অখ্যাত লেখকের লেখা দেওয়াটা দৃষ্টিকটু। তাছাড়া বিজ্ঞাপনে আমরা ঘোষণা করেছি স্থবোধ বাবুর গল্প শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। বিজ্ঞাপিত লেখা না দিতে

পারাটা সম্পাদনা কাজের অমার্জনীয় অপরাধ। পাঠকরা লেখককে ক্ষমা করতে পারেন, সম্পাদককে করবেন না। সে-সময়ে সুবোধবাবু বেশী লেখা লিখতেন না। শারদীয়া সংখ্যায় দুটি মাত্র গল্প লিখতেন। একটি আনন্দ-বাজারে, অপরটি দেশ পত্রিকায়। সুতরাং দেশ পত্রিকায় এবারে সুবোধবাবুর গল্প থাকবে না—এটা আমার কাছে শুধু বেদনাদায়ক নয়, অকল্পনীয়ও বটে। আমার অবস্থাটা সুবোধবাবুর কাছে সবিস্তারে বুঝিয়ে বলার পর সুবোধবাবু বললেন—'তা হলে এক কাজ করি। আমি এখনই বাড়ি চলে যাই। মাথার যে-রকম অবস্থা, এখানে বসে শত চেষ্টা করলেও এক লাইন লেখা হবে না। বাড়ি গিয়ে, স্নানটান করে কয়েক-ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর লিখতে বসব। নির্জন রাত্রে লেখাও হবে ভালই। কী বলেন ?'

কী আর বলব। সুবোধবাবুর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে আমার আর উপায় কি। কিন্তু একটা প্রশ্ন দেখা দিল। বাড়িতে বসে রাত্রে যদি লেখেনও সে-লেখা কম্পোজ হবে কখন ? সুবোধবাবুকে আর আটকে রাখলাম না, বাড়ি চলে গেলেন। দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে নিজের ঘরে এসে বসেছি, যথারীতি দু-চারজন সাহিত্যিক বন্ধুর সমাগম হয়েছে। কোন কাজে মন বসছে না, আড্ডার বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে দু-দণ্ড রসালাপ করব সে মেজাজও আর নেই। আমার মাথায় তখন এক চিন্তা সুবোধবাবু যদি রাত্রে বাড়িতে বসে লেখেনও, সে-লেখা কম্পোজ হবে কখন ?

এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন আরেকজন, তিনি আমাদের প্রিণ্টার সুরেনবাবু। এই প্রিণ্টারই একদিন সুবোধবাবুর হাতের লেখা কপি এনে আমাকে বলেছিলেন—'এই লেখককে বলবেন স্পষ্টাক্ষরে ধরে ধরে লিখতে, কোন কম্পোজিটারই এই লেখা কম্পোজ করতে চায় না। খর্বকায়, শীর্ণদেহ, বয়স ষাট-এর কাছাকাছি। আশুতোষ মুখার্জি প্যাটার্নের একজোড়া পাকা গোঁফ ও পাকা ভুরু হচ্ছে ওঁর চেহারার প্রধান আকর্ষণ। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় এত দ্রুত কথা বলেন যে, এক বর্ণও বোঝা যায় না।' কথা বলার সময় গোঁফ আর ভুরু সমানতালে নাচতে থাকে। এই ভুরু ও গোঁফ-নৃত্যের মুদ্রা যদি আমার জানা থাকত তাহলে কাজটা অনেক সহজ হত। আমি অবশ্য সেই চেষ্টাই করতাম। কথা বলার সময় সুরেনবাবুর গোঁফ ও ভুরুর নাচন দেখে খানিকটা অনুমান করবার চেষ্টা করতাম ওঁর বক্তব্য বিষয়টি কী।

এখন সুরেনবাবুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই জেনে কাজ-কর্ম চাপা দিয়ে চলে গেলাম প্রেস্‌-এ। সুরেনবাবুকে মুশকিলের কথাটা সবিস্তারে বলার পর আসানের ফিকির শুনবার জন্যে সতৃষ্ণ নয়নে ওঁর গোঁফ ও ভুরু জোড়ার দিকে তাকিয়ে আছি। লক্ষ্য করলাম, খুবই দ্রুত গোঁফ ও ভুরু নেচে উঠল, আর সেই সঙ্গে মুখ থেকে ততোধিক দ্রুত একটি শব্দ বেরিয়ে এল :—

'ক্যাচ্ছিরিয়স্‌।'

বিচ্ছিরি একটা উচ্চারণ শুনে প্রথমে আমি হক্‌চকিয়ে গেলাম। সন্ধি-বিচ্ছেদ করতেই অর্থ উদ্ধার হল—কেস সিরিয়স্‌। সুবোধবাবুর গল্পের কপি মধ্যরাত্রে পেলেও উপায় নেই, ভোর ছটার মধ্যে ফর্মা তৈরী করা অসম্ভব। সুতরাং বিষয়টা খুবই সিরিয়স্‌। দ্বিতীয়ত, শারদীয়া সংখ্যায় সুবোধবাবুর গল্প থাকবে না—সেটাও কম সিরিয়স্‌ ব্যাপার নয়।

মিনিট কুড়ি যাবৎ অনেক গোঁফ আর ভুরু নাচানাচির পর সুরেনবাবু আমাকে আশ্বাস দিয়ে জানালেন যে ঘাবড়াবার কিছু নেই। রাত্রি আড়াইটার পর দৈনিকের কাজ শেষ হলেই পাঁচটা মেশিনে পাঁচ হাতে কম্পোজ ধরিয়ে দেবেন, সেই অনুসারে কম্পোজিটরদের বলে কয়ে আটকে রাখবেন। যে-করেই হোক আমাকে শুধু রাত আড়াইটার মধ্যে বেশ কিছু কপি এনে হাজির করতে হবে। আর ওদিকে গৌরাঙ্গ প্রেসকে বলে রাখতে হবে ভোর ছটায় ফর্মা যাবে না, বেলা ১টার আগে ফর্মা পাঠানো সম্ভব নয়।

সুবোধবাবুর গল্প পূজা-সখ্যা থেকে বাদ যাবে—এটা যেন কম্পোজিটর-প্রিণ্টার থেকে শুরু করে গৌরাঙ্গ প্রেসের ম্যানেজার পর্যন্ত কারোরই মনঃপুত নয়। গৌরাঙ্গ প্রেস-এর ম্যানেজার যে-প্রভাতবাবু এতক্ষণ 'ফর্মা চাই, ফর্মা চাই' বলে তারস্বরে চিৎকার করে গলা ভেঙ্গে বসে আছেন সেই প্রভাতবাবুও সহসা সব বৃত্তান্ত শুনে সুর পালটে ফেললেন। বললেন—'কুছ পরোয়া নেই। বেলা একটা কেন, বেলা দুটোর মধ্যেও যদি আপনি ফর্মা পাঠাতে পারেন আমি দিনরাত মেশিন চালিয়ে ঠিক সময়ে কাগজ বার করে দেব।'

যাক, মোক্ষম দুটো ঘাঁটি তো ম্যানেজ করা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তার ভারও নেমে গেল অনেকখানি। কিন্তু আসল সমস্যা থেকে

গেল সুবোধবাবুর লেখা এবং তা রাত দুটোর মধ্যে প্রেস-এ কম্পোজের জন্য ধরিয়ে দেওয়া।

রাত তখন নটা। সাহিত্যিক বন্ধুরা একে একে প্রায় সবাই বিদায় নিয়েছেন, শুধু ধরে রেখেছি কবি ও কথাসাহিত্যিক বন্ধু সুশীল রায়কে। ওদিকে রঙ্গজগতের সমালোচক শৌভিক আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। ভারতী সিনেমায় সংগীত সম্মেলনে একসঙ্গে যাবার কথা। আপৎকালে সুশীলবাবুর পরামর্শ আমার কাছে সর্বদাই গ্রাহ্য। সে সময়ে সুবোধবাবু থাকতেন কাঁকুলিয়া রোডের দক্ষিণপ্রান্তে, সুশীলবাবুর বাড়ির কাছেই। সুশীলবাবুই প্রস্তাব করলেন যে, এখন বেরিয়ে গিয়ে পাঞ্জাবী দোকান থেকে রুটি মাংস খেয়ে সংগীত সম্মিলনীতে বসা যাক। রাত দুটো পর্যন্ত ওখানে সময় কাটিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সুবোধবাবুর বাড়ি গেলেই হবে। ততক্ষণে নিশ্চয় অনেকখানি লেখা এগিয়ে থাকবে।

সুশীলবাবুর প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সুবোধবাবুর কথা অনুসারে যদি রাত দশটা থেকেও লেখা শুরু করে থাকেন তাহলে রাত দুটোর মধ্যে অন্তত অর্ধেক লেখা তৈরী থাকবে, সে-লেখা নিয়ে ওই ট্যাক্সিতেই প্রেস-এ চলে এলেই হবে। বাকীটা আবার ভোর বেলা গিয়ে নিয়ে এলেই হল। সমস্যার কত সহজ সমাধান।

অফিস থেকে বেরিয়ে ভবানীপুরের এক পাঞ্জাবীর দোকানে বসে তিনজনে তড়কা মাংস আর রুটি খেয়ে ভারতী সিনেমায় গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসলাম, তখন রাত দশটা হবে। কার যেন একটা কথক নাচ হয়ে যাবার পর ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ আসরে এসে বসলেন। এমদাদ খাঁ-এনায়েৎ খাঁর ঘরানার বিখ্যাত খাম্বাজ ধরলেন সেতারে। মন্ত্রমুগ্ধের মত বাজনা শুনছি, সুরের মায়াজাল বিস্তার করে আলাপের পর গৎ বাজিয়ে যখন শেষ করলেন তখন রাত দেড়টা। জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহ সমস্বরে আবেদন জানাল 'ঠুংরি, ঠুংরি'। মৃদু হেসে আবার সেতারটি কোলের উপর তুলে নিলেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ। সবাইকে চমকে দিয়ে সুর ধরলেন রবীন্দ্রনাথের গানের—'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।' গানের প্রথম ছত্রের সুরটি নিয়ে কত রকমের কাজ, কত বিচিত্র নকশা তুলে বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করে চললেন যাদুকরের মত।

খাঁ সাহেবের বাজনার সুর ও ছন্দে যখন সবকিছু ভুলে যেতে বসেছি, সুশীল রায় কানের কাছে মুখ এনে বললেন—'দুটো বাজতে আর দশ মিনিট বাকি, এবার উঠতে হয়।'

চমকে উঠেছি। তাই তো! সেতারের তান-কর্তবের সঙ্গে তখন কেরামৎউল্লার তবলার কেরামতি চলেছে, উত্তর প্রত্যুত্তর। তবু উঠে আসতে হল। সুশীলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এসেই ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। গোল পার্ক পার হয়ে ঢাকুরিয়া লেভেল ক্রসিং-এর দিকে কিছুটা এগিয়ে এসেই বাঁদিকের রাস্তাটা শেষ হয়েছে কাঁকুলিয়া রোডের উপর পড়েই। ট্যাক্সিটা ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে দুজনে ডানদিকে এগিয়ে গেলাম। নিস্তব্ধ নিঝুম পাড়া, অস্পষ্ট চাঁদের আলো গাছ পালার ফাঁক দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে।

সুবোধবাবু থাকতেন একটা দোতলা বাড়ির উপর তলায়। পুব দিকের ঘরটা রাস্তা থেকেই দেখা যায়, সেই ঘরে বসেই লেখাপড়া করেন। পুব দিকের জানালা ছুঁয়ে একটা পেয়ারা গাছ, গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়ালেই কচি পাতার স্পর্শ পাওয়া যায়।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই কল্পনায় একটা মধুর ছবি ফুটে উঠল। চারদিকে গভীর রাত্রির স্তব্ধতা, সুবোধবাবু লিখবার টেবিলে শান্ত সমাহিত চিত্তে লিখে চলেছেন। পুব জানালা দিয়ে ইলেকট্রিকের আলোটা এসে পড়েছে পেয়ারা গাছটার কচি পাতার উপর।

সুবোধবাবুর বাড়ির সামনের সরু গলিটার ভিতর মোড় নিয়েই দোতলা বাড়িটার পুব দিকের খোলা জানালাটার দিকে তাকালাম। অন্ধকার জানালা। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির সব অন্ধকার যেন আমার উপর পাথরের মত জমাট বাঁধতে লাগল। বিশ্রী একটা আশঙ্কায় আমার সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে এসেছে। সুশীলবাবুর দিকে তাকালাম, তাঁর চোখে-মুখেও সন্দেহের ছায়া। সন্দেহ আর কিছুই নয়, সুবোধবাবু কি তাহলে কিছুই লেখেন নি?

একতলায় সিঁড়ির দরজার কড়াটা খটখট করে কয়েকবার নাড়লাম, উপর থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। অবশেষে মরিয়া হয়ে ডাক ছাড়লাম—

'সু বো ধ বা বু—'

নাম ধরে ডাক নয়, যেন বুক ঠেলে একটা হাহাকার রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ ঠেলে

বেরিয়ে এল। পাড়ার লোক মনে করল হয়তো কোন সম্ভমৃত আত্মীয় বন্ধুর সংবাদ নিয়ে কেউ ডাকাডাকি করছে।

বার তিন চার ডাকাডাকির পর হঠাৎ দোতলার ভিতর থেকে আলোর রেখা দেখা দিল পেয়ারা গাছটার কচি পাতার উপর। পরমুহূর্তেই দোতলার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে-আসা চটিজুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল। একতলার সিঁড়ির দরজাটা খুলেই সুবোধবাবু আমাদের তুজনকে দেখে চমকে উঠলেন, যেন ভূত দেখছেন। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। সুবোধবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

রাত তুটোর সময় এমন অতর্কিতে ওঁর বাড়িতে হানা দিতে পারি এটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। উভয়ের মুখে কোন কথা নেই, সুশীলবাবুও স্তব্ধ হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে।

সুবোধবাবুই মুখ খুললেন। বললেন—'রাস্তার মোড়ে চলুন সব বলছি।'

মোড়ে ট্যাক্সিটাকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম সেখানে তিনজন নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালাম। সুবোধবাবু বেদনাভরা চাপা গলায় বললেন—'এবার আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পারব না, পারলাম না।'

আমি নিরুত্তর। মনে হচ্ছিল আমার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। কত আশা ভরসা উৎসাহ নিয়ে এসেছিলাম, ফুৎকারে তা নিবে গেল।

ট্যাক্সির শিখ ড্রাইভার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, ছাড়া পাবার জন্য ব্যস্ত। সুবোধবাবুর কথার কোন জবাব না দিয়ে আমি ড্রাইভারের ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। ট্যাক্সি ধরে রেখে আর কী লাভ। ততক্ষণে মনে মনে একটা সংকল্প করে ফেলেছি। কাছেই তো লেক। ঘণ্টা তুই সময় লেকের ধারে কাটিয়ে দিয়ে শেষ রাত্রের প্রথম ট্রাম ধরে অফিসে ফিরে যাব। আগের যা কম্পোজ ম্যাটার তু-একটা আছে তাই দিয়ে পাতা ভরাট করে সকাল বেলায় ফর্মা গৌরাঙ্গ প্রেস-এ পাঠিয়ে দিয়ে এ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেব। সুবোধবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। লজ্জায় ও বেদনায় ওঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কথা না রাখতে পারার যন্ত্রণায় যে ওঁর মন কতখানি ক্লিষ্ট তা বুঝবার অবকাশ পাই নি। পরাজয়ের গ্লানিতে আমার মন আচ্ছন্ন, ওঁর দিকটা ভেবে দেখবার মত বিচারবোধ তখন আমি হারিয়েছি।

লেখা যখন পেলামই না এবং পাবার আর কোন সম্ভাবনাও যখন নেই তখন এই মাঝরাতে সুবোধবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখার

কোন অর্থ হয় না। এই অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে ওঁকে রেহাই দেবার জন্য বললাম—'আপনি যান সুবোধবাবু, অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে অপরাধ করেছি, কিছু মনে করবেন না।'

আমার বলার ধরনটায় বোধ হয় একটু প্রচ্ছন্ন অভিমান ছিল। সুবোধবাবু বেদনাহত কণ্ঠে বললেন—'আমাকে ভুল বুঝবেন না সাগরবাবু। আপনাকে লেখা দিতে না পারার যন্ত্রণা আমার কিছু কম নয়। কিন্তু কী যে হল, কিছুই ভাবতে পারছি না, লিখতে পারছি না। কতবার লিখবার সংকল্প নিয়ে বসেছি, এক লাইনও লিখতে পারি নি। আবার অনুরোধ করছি, আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না।'

এরপরে আর কী বলা যায়। সুবোধবাবুর অসহায় অবস্থাটা এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করলাম। আমরা দুজনে আবার ওকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি, এবার সুশীলবাবুর কাছ থেকে আমার বিদায় নেবার পালা। কিন্তু এই গভীর রাত্রে আমাকে একলা কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না। জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন ওঁর বাড়িতে। বসবার ঘরে আমার জন্য বিছানার বন্দোবস্ত করে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন, যাবার সময় শুধু বলে গেলেন—

'সকালে না জানিয়ে এবং চা না খেয়ে কিন্তু চলে যাবেন না।'

রাত তখন তিনটা। চোখে ঘুম নেই। গত একমাস ধরে শারদীয়া সংখ্যার জন্য যে চিন্তা ভাবনা পরিশ্রম করে এসেছি, শেষ দিনের এই নিষ্ফল হতাশা সব ব্যর্থ করে দিয়েছে। মনের মধ্যে ধিক্কার দেখা দিল। ছি ছি ছি—শেষকালে সামনের দিকের ওই আটটা পৃষ্ঠা কিনা কতকগুলো বাজে ম্যাটার দিয়ে ভরাতে হবে? ওদিকে প্রিণ্টার আমার অনুরোধে পাঁচটা কম্পোজিটরকে বসিয়ে রেখেছেন। আশা করে আছেন এই মুহূর্তেই আমি লেখা নিয়ে হাজির হব। ওদের কাছেই বা সকালে মুখ দেখাব কী করে? আর গৌরাঙ্গ প্রেসের প্রভাতবাবু? টেলিফোনে গলা ফাটিয়ে বলবেন—

'সুবোধবাবুর গল্পই যদি আদায় করতে না পারলেন তাহলে ফর নাথিং ফর্মা আটকে রাখলেন কেন?' অর্থাৎ আমি যে এতবড় একটি পত্রিকার সম্পাদনা কার্যের দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এদের সবার কাছে তা আরেকবার প্রমাণিত হয়ে যাবে।

ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটায় ঢং ঢং করে চারটে বাজল, যেন চার বার হাতুড়ির ঘা পড়ল আমার মাথায়। এক ফোঁটা ঘুম নেই চোখে, ব্যর্থতার জ্বালায় আমার চোখ জ্বলছে! ঘুম আসবে কেন?

আরেকজন? যাকে মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে রাস্তায় টেনে এনে আবার বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেছি তিনিও আমারই মতন আর এক যন্ত্রণায় ঘরময় শুধু পায়চারি করছেন আর ঘুমাতে পারেন নি। ঘরে ফিরেই গৃহিণীকে দিয়ে খবরের কাগজ পুড়িয়ে চা তৈরী করিয়ে ছিলেন, চা খেয়ে যদি লেখায় মন বসে। এ কথা আমি পরদিন শুনেছিলাম সুবোধবাবুর কাছেই।

দেয়াল ঘড়িটা আবার ঢং করে বেজে উঠল। সাড়ে চারটা বেজেছে। এবার আমাকে যেতে হবে। ট্যাক্সি যদি না পাই তবে শেষ রাতের প্রথম ট্রামটা ধরেই রওনা দিতে হবে অফিসের পথে। দুঃখের রাত্রির অবসানই আমি তখন চাইছিলাম।

সুশীলবাবুর বাড়ির বুড়ি ঝি সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে উঠোনে উনুন ধরাবার তোড়জোড় করছে দেখতে পেয়ে নিঃশব্দে কাউকে কিছু না জানিয়ে বৈঠকখানা ঘরের দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়লাম।

গড়িয়াহাট বাজারের সামনে এসে এসপ্ল্যানেডগামী প্রথম ট্রামটাই পেয়ে গেলাম। গঙ্গাস্নানার্থী বৃদ্ধের দল সমস্বরে এবং তারস্বরে চৌতালে শ্যামাসঙ্গীত গাইতে গাইতে চলেছেন। এটা তাদের নিত্যকর্ম।

এসপ্ল্যানেড থেকে ট্রাম বদলি করে যখন বর্মণ স্ট্রীটে এসে পড়েছি তখন সোয়া পাঁচটা বেজেছে। ভোরের আলোয় সবেমাত্র মহানগরী জেগে উঠেছে, রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত শরীরটা কোন রকমে বয়ে নিয়ে এসেছি। চোখে-মুখে জল পর্যন্ত দেওয়া হয় নি, চুল অবিন্যস্ত, জামাকাপড়ের দিকে তাকানো যায় না। গতকাল সকালে মন্মথবাবুকে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের গেট-এর সামনে ঠিক এই অবস্থাতেই দেখেছিলাম। কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল সকল সার্থক শ্রমের আত্মতৃপ্তিতে ভরা। আর আমার? গেট দিয়ে ঢুকেই বাঁ-হাতে প্রেস। না। প্রেস-এ নয়, প্রেস-এ এখন যাব না। রাত দুটো থেকে প্রিণ্টার বোধ হয় পাগলের মত আমার খোঁজ করেছেন। এখন দেখা করলেই ভুরু আর গোঁফের দ্বৈত তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়ে যাবে। তার চেয়ে মেক-আপ ম্যানকে ডেকে পাঠিয়ে যা করণীয় তাকেই বুঝিয়ে দেব। একতলা

থেকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে একটা সাঁকো পার হতে হয়। সেই সাঁকো পার হবার সময় পূর্ব প্রান্তে আমার ঘরের দরজাটা দেখা যায়। বরাবরের অভ্যাস মত সেদিকে চোখ ফেরাতেই চম্‌কে উঠলাম। আমার ঘরের দরজা খোলা। কেন?

সাঁকোর মাঝখানে স্তব্ধ-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চিন্তা করলাম এত ভোরে কে আসতে পারে। আমার ঘরের ছোকরা অমরের সকালে আসবার কথা, কিন্তু এত ভোরে তো নয়! তাহলে প্রিণ্টার স্থরেনবাবু কি আমাকে ধরবার জন্যে গ্যাঁট হয়ে আমার ঘরেই বসে আছেন?

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন আর পরিশ্রান্ত দেহ আমার ক্লান্ত পা দুটোর উপর ভর করে লম্বা করিডর পার হল। এবার আমার ঘরের সামনে এসে হাজির। একটা অপ্রস্তুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করে দরজায় পা দিতেই আমি চম্‌কে উঠলাম। এ কী, এ কাকে দেখছি! এ যে আমার কল্পনার অতীত! স্থবোধবাবু আমার পাশের টেবিলটায় বসে একাগ্রচিত্তে খস্‌খস্‌ করে লিখে চলেছেন, ঘরের এক কোণায় অমর চুপচাপ বসে।

গভীর আবেগে আমার সমস্ত দেহ-মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, একটা পুলক শিহরণ বিদ্যুতের মত আমার শরীরের ভিতর দিয়ে খেলে গেল। স্থবোধবাবুর দিকে আমি তাকিয়ে আছি, স্থবোধবাবুও একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। স্নিগ্ধ মধুর প্রসন্ন হাসিতে সে-মুখ ভোরের আলোর মতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আবার তিনি লেখায় ডুবে গেলেন। কোন বাক্য বিনিময় নয়, সেই প্রশান্ত হাসিতেই জানিয়ে দিলেন—আর ভাবনা নেই, লেখা আপনি পাবেনই।

বিগত রাত্রির যত গ্লানি আর ব্যর্থতা আমার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল এক মুহূর্তে, বিপুল আনন্দের আবেগ আমার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারায় নেমে এল। আনন্দাশ্রু কথাটার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তাকে অন্তর দিয়ে অনুভব এর আগে কখনও করি নি।

এই আবেগোচ্ছ্বাস আমি দমন করতে পারি নি। ঘরে ঢুকেই স্থবোধবাবুকে বুকে জড়িয়ে ধরেছি, আমার দুই চোখে জলধারা।

'এ কি, আপনি যদি এরকম সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়েন তাহলে আমার অবস্থাটা ভাবুন, আমি লিখব কি করে?' একটা আবেগরুদ্ধ চাপা গলায় স্থবোধবাবু বললেন।

পুব দিকের খোলা জানালা দিয়ে শরতের নির্মেঘ নীলাকাশে চোখ পড়ল, সোনার আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত।

অমরকে দুটো টাকা দিয়ে বললাম—'যা, দৌড়ে গিয়ে গরম গরম সিঙ্গাড়া কচুরি আর মিষ্টি কিনে আন, সেই সঙ্গে চা-ও বলে আসবি।'

অমর প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল, যাবার সময় সুবোধবাবুর কাছ থেকে ১৫ নম্বর স্লিপটাও নিয়ে গেল প্রেস-এ দেবার জন্যে।

অমর চলে যেতেই সুবোধবাবু বললেন—'রাত সাড়ে চারটার সময় জামা-কাপড় পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়িতে বসে কিছুই যখন লিখতে পারলাম না, তখন অফিসে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করা যাক। গোলপার্কে এসে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। অফিসে এসে আপনার ঘরে দেখি টেবিলে পত্রিকার ফাইল মাথায় দিয়ে অমর শুয়ে আছে।'

আমি বললাম—'অমরকে সকাল সাতটায় আসতে বলেছিলাম। কিন্তু ও শুনে গিয়েছিল যে রাত দুটোর সময় আপনার বাড়ি থেকে লেখা নিয়ে প্রেস-এ দেব। পাছে আমার কোন অসুবিধা হয় সেই জন্যেই বোধ হয় বাড়ি না গিয়ে এ-ঘরেই শুয়েছিল।'

সুবোধবাবু আবার লেখায় ধ্যানস্থ হলেন। একটা করে স্লিপ লেখা হয়, অমর সেটা তৎক্ষণাৎ প্রেস-এ দিয়ে আসে। প্রিণ্টার সুরেনবাবুর অবস্থা যেন একটা ভূতে পাওয়া মানুষ। পাঁচ হাতে কম্পোজ ধরিয়ে প্রেসময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। দেখতে দেখতে বেলা দশটা বাজল, অফিসে শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। ঘন-ঘন গৌরাঙ্গ প্রেস থেকে টেলিফোন আসছে। প্রভাতবাবুর ওই এক কথা—'দুটোর মধ্যেই ফর্মা কিন্তু চাই।'

ওদিকে ঝড়ের মত হইহই করতে করতে ঘরে ঢুকলেন সার্কুলেশন ম্যানেজার ভূপেনদা।

'এই যে সাগরময়বাবু, তুমি তো দেখছি ভাই ডুবিয়ে দিলে। এখনও ফর্মা ছাড় নি, দপ্তরীরা হাত গুটিয়ে বসে আছে। লেট যদি হয় কাগজ এক কপিও বিক্রি হবে না।'

বেলা যতই বাড়ছে ঘরে জনসমাগমও বেড়ে চলেছে। কেউ সহানুভূতি, কেউ বিস্ময়, কেউ আশঙ্কা জানাচ্ছেন, তারি মধ্যে কাজও চলেছে পুরোদমে। সুবোধবাবু লিখেই চলেছেন। পর্বতের মত ধীর স্থির অচঞ্চল, কলম চলেছে বিদ্যুৎগতিতে।

বেলা বারোটার সময় গল্পের শেষ স্লিপটা প্রেস-এ দিয়ে যখন অমর ফিরে এল তখন আর তার দাঁড়াবার শক্তি নেই। বেচারি নব্বইবার সিঁড়ি ভেঙে প্রেস-এ গিয়েছে আর এসেছে। সুবোধবাবু সেবার নব্বই স্লিপ লিখেছিলেন।

'থির বিজুরী' গল্প লেখার ইতিহাস হচ্ছে এই। যে সময়ের মধ্যে, যে মানসিক অবস্থায় এবং পরিবেশে এ গল্প লেখা হয়েছিল তাকে আমি সুবোধবাবুর পক্ষে অলৌকিক কীর্তি ছাড়া আর কী বলতে পারি।